শহর কলকাতার আদিপর্ব

নতুন সাহিত্য ভবন কলিকাতা-২০

॥ ভূমিকা ॥

এই বইটির বিষয় ইতিহাসের। কিন্তু ভাষা সাহিত্যের। এই ইতিহাসের পরিধি ভারতবর্ষ। মোগল আমলের যে ভারতবর্ষ একটু একটু করে ধ্বংসের দিকে গড়িয়ে চলেছে। কিন্তু কেন্দ্র কলকাতা। ইংরেজ আমলের যে কলকাতা যন্ত্রযুগের প্রতিনিধি হয়ে একটু একটু করে গড়ে উঠছে। এ বইয়ের এক তৃতীয়াংশ ইতিহাস রাজনীতির। বাকী অংশ সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজ জীবনের। বইটিতে স্থান অল্প। কিন্তু কাল এবং পাত্রের তালিকা সুদীর্ঘ।

ইতিহাসের পাণ্ডিত্যে আমার কোন স্পর্ধা নেই। তবু প্রচেষ্টায় কিছুটা দুঃসাহস দেখাতে বাধ্য হয়েছি আমি। তিন শতাব্দী ব্যাপী এক বিরাট উত্থান-পতনের ইতিহাস এ পর্যন্ত কোন একটি বইয়েও সংক্ষিপ্ত বা সুসংবদ্ধভাবে সংগৃহীত হয়নি। অন্য কোন মূল্য না পেলেও, এই একটি কারণে বইটি কিছুটা মূল্য নিশ্চয়ই দাবি করবে।

একেবারে সাধারণ পাঠকের কথা ভেবেই বইটি লেখা। তার ফলে এতে তত্ত্বের ঘর তালা-বন্ধ। কিন্তু তথ্যের তোরণ উন্মুক্ত। অবশ্য বিপদ তাতে কমেনি। তত্ত্বের ভুল ক্ষমার্হ। সেটা মতান্তরের জিনিস। কিন্তু তথ্যের ভুল অমার্জনীয়। সেখানে মনান্তর অনিবার্য। ত্রুটির জন্যে আমি মার্জনা চেয়ে নেব না। ইতিহাসে যাঁরা শ্রদ্ধেয়, তাঁরা যদি এই অপরাধে কানও টানেন, তবু সুখী হব এই ভেবে যে, তার ফলে আমার মাথাটা আসবে।

বইটি কাউকেই উৎসর্গ করিনি। করলে একমাত্র তাঁদেরই করতাম—সময়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে ইতিহাসের বিপুল ঐশ্বর্য আবিষ্কারে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন ও করছেন। কিন্তু করিনি এই ভেবে যে, ইতিহাসের প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা ছাড়া এই সাজানো নৈবেদ্যের যতই ঘটা থাক, মূল্য কানাকড়িও নেই।

—লেখক

"ধন্য ধন্য কলিকাতা শহর।
স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
পশ্চিমে জাহ্নবী দেবী
দক্ষিণে গঙ্গা-সাগর।
পূর্বে বাদা চিংড়িহাটা
পদ্মানদী তদুত্তর॥
হেস্টিংস ব্রীজ বাগবাজার,
এই আয়তন তার
সারকিউলার রোড, পারমিট ধার,
চতুঃসীমা সার।
অতুল্য মর্ত্য-ভুবনে,
বৈকুণ্ঠ যায় হার মেনে,
হেরে টেলিগ্রাপ
বলে বাপ
লাজে লুকায় পুরন্দর॥
... ...
ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত
কলিকাতাতে ফিটন রথ,
পারিজাতকে করে মাত
গোলাব সেঁউতি নাগেশ্বর॥
পরিষ্কার পথ, নাই ময়লা
সারি সারি গ্যাস-লাইট আলা
চন্দ্রদেবের ষোলকলা হইতে উজ্জ্বলা।
... ...
করিয়ে বুদ্ধির কৌশল
পলতা হতে আনলে জল,
জলে শত সিংহের বল
লক্ষ হাত প্রবল।
ধন্য ব্রিটেন-রাজধানী
প্রজার ঘরে বাইরে সুরধনী,
অপঘাতে মলে প্রাণী

তাহার ভূত যোনীর নাইকো ডর।
ইস্টিম ভেসেল, রেলওয়ে
এই সকলের তেজ হেরিয়ে
বেদ ব্রহ্মা ভোম্মা হয়ে গেলেন চাপিয়ে।
অগ্নিজল আর পবনে
যায় এক মাসের পথ একটি দিনে
এক কোটি মন দ্রব্য টানে
নাহি রাত্রি দিবা অবসর।
নিকাশ হচ্ছে ময়লা জল,
করেছে প্রস্তুত ড্রেনেজ কল,
ধুলো থামে দিলে জল—স্বতন্ত্র এক কল।
অগ্নিদেব হলে প্রবল
নির্বাণ করে দমকল,
গোরাদের চেহারা দেখে ভয়ে পালায় বৈশ্বানর।
পাটের কল আর ময়দার কল
রেড়ির কল, কাপড়ের কল, শুরকির কল
জল তোলা কল, খোয়া ভাঙা কল।
কলাকৃতি ঐরাবত
করে এক দিবসে সোজা পথ
কলের খুরে দণ্ডবৎ, জুড়ে গেল গ্রাম-নগর।
... ...
কলিকাতার কি নিছনি
বলিতে অশক্ত বাণী,
আর চলে না লেখনী
সংক্ষেপে ভনি॥
কত রোড কত গলি
সাধ্য কি যে তাহা বলি
ইচ্ছা করে ছবি তুলি,
সে হয়ে ওঠা দুষ্কর।
ধন্য ধন্য কলিকাতা শহর॥"

—রূপচাঁদ পক্ষীর গান

টাউন হল
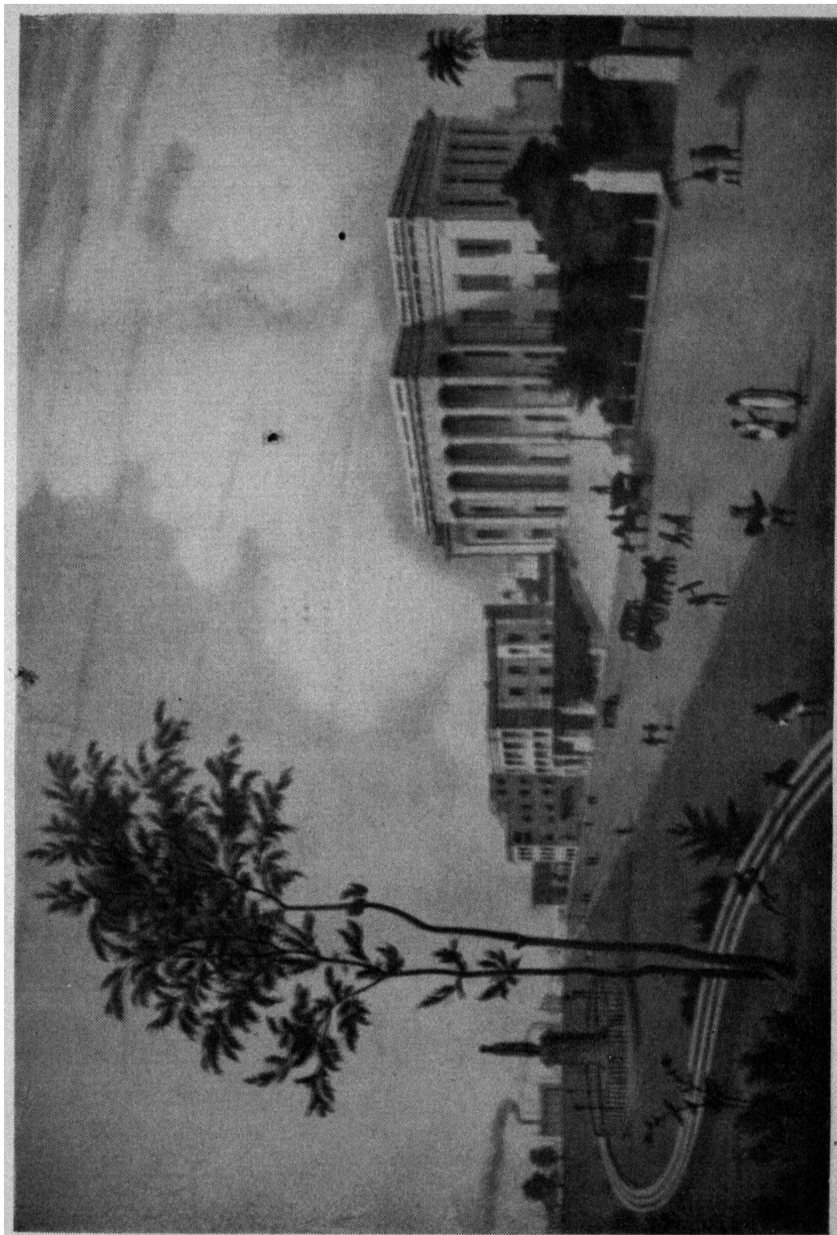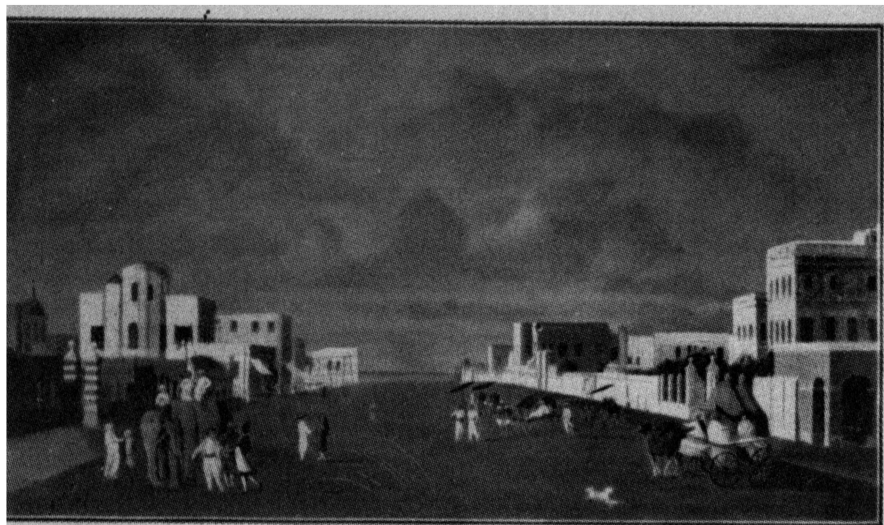
ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট
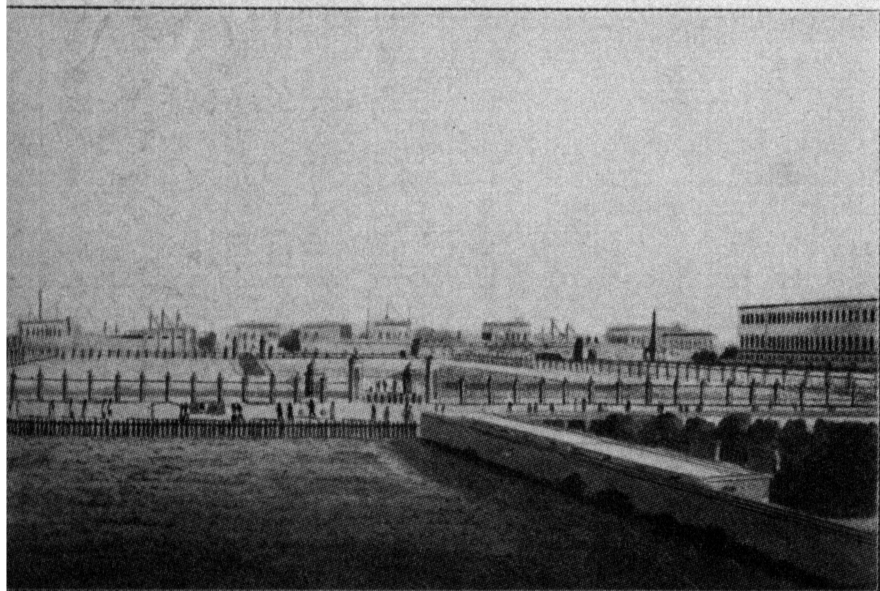
লালদিঘী
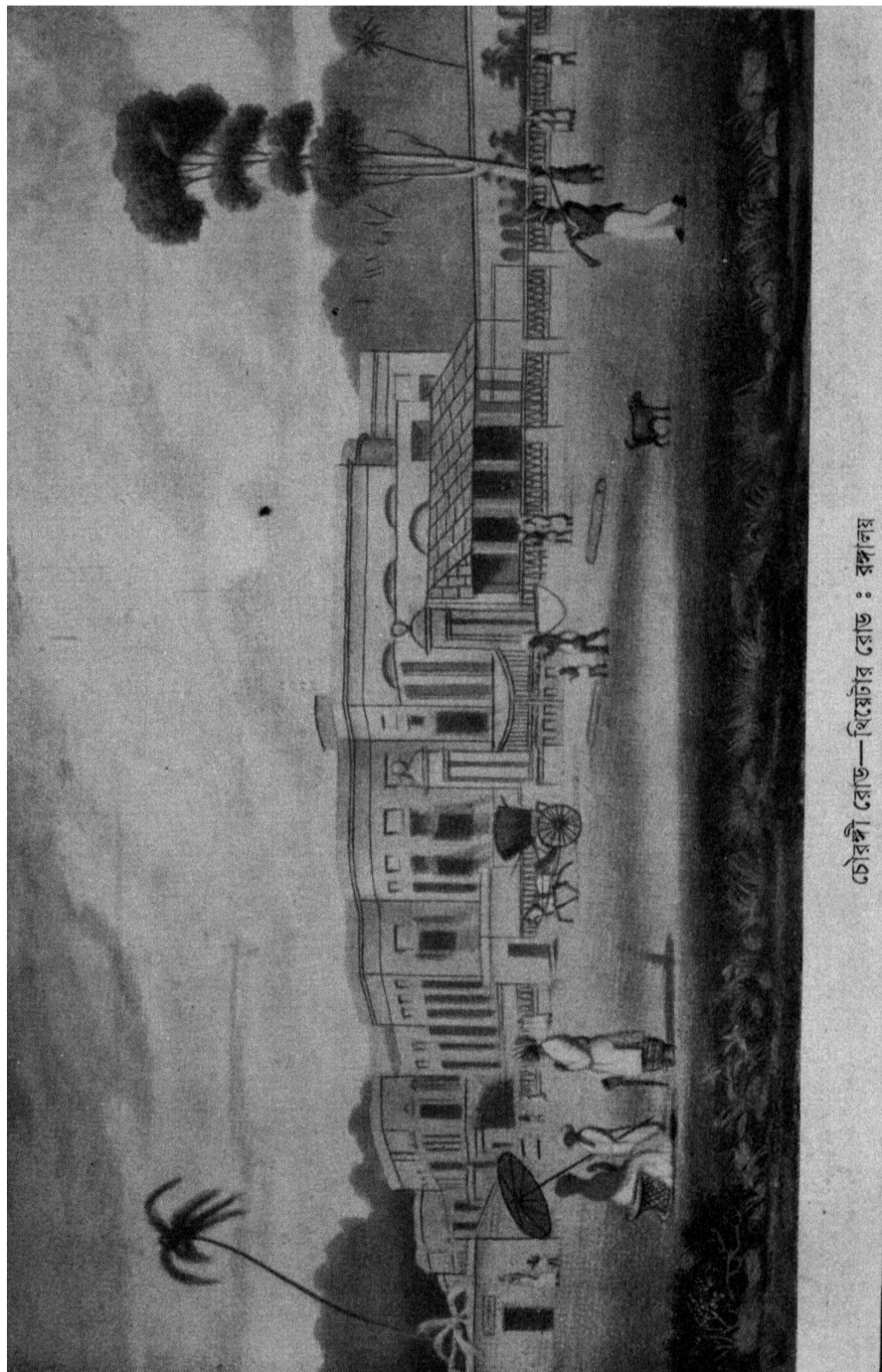
চৌরঙ্গী রোড—থিয়েটার রোড ঃ রঙ্গালয়
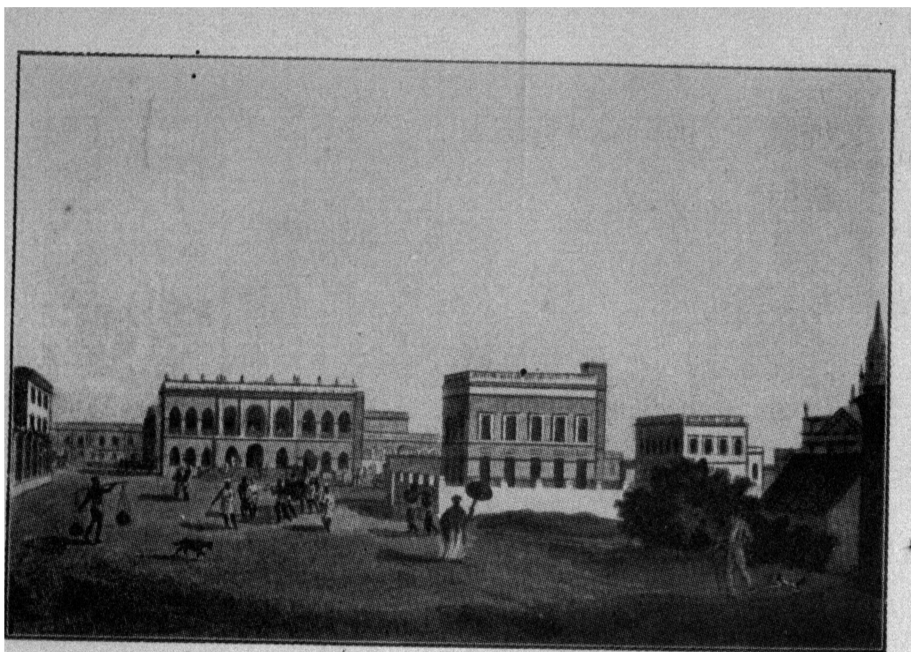
পুরনো আদালত

পুরনো ফোর্ট উইলিয়ম
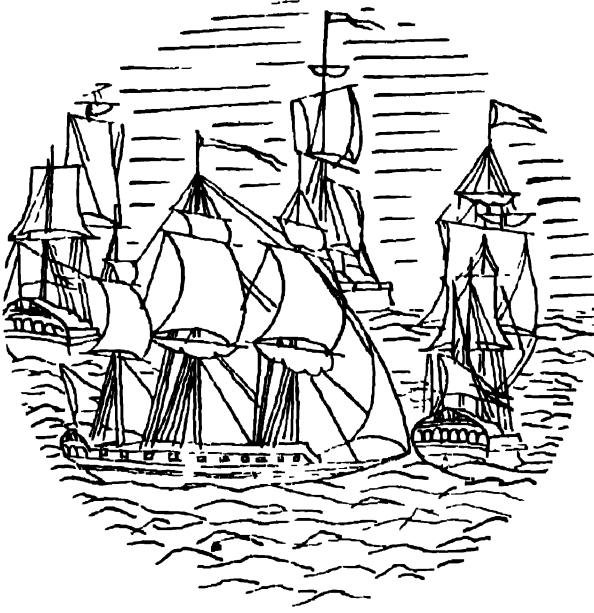
॥ হীরে মানিকের খোঁজে ॥

ভারতবর্ষ সোনার দেশ। রত্ন-প্রসবিনী তার বিশেষণ। তার ধুলোয় মাটিতে সোনার ছড়াছড়ি। মাটির নীচে খনি। খনিতে হীরে পান্না মুক্তো। মাটির ওপরে গাছ। গাছে রূপোর পাতা আর সোনার ফুল। রাজা-বাদশারা রাজ্যপাট চালায় সোনার সিংহাসনে বসে।

একদিন শুধু ইওরোপ নয়, সারা পৃথিবীর লোক এই কথা ভাবতো। তাদের স্বপ্নে-কামনায় ভারতবর্ষ ছিল একটা 'কল্পতরু'। যার একটু ছোঁয়া লাগলেই সব সোনা হয়ে যায়।

ভারতবর্ষের পণ্য কিনলেও লাভ। বেচলেও লাভ। যেন মাটির দরে কেনা আর সোনার দরে বেচা। ব্যাবিলন থেকে মিশর, মিশর থেকে গ্রীস, গ্রীস থেকে রমণীয় রোম—সবাই ভারতবর্ষের লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে সংগ্রহ করেছে তাদের সৌভাগ্য আর সম্পদ। এককালে, খ্রীষ্ট জন্মেরও বহু বছর আগে, ভারতবর্ষের প্রধান পণ্যশালা ছিল মিশর। যে মিশর মৃতদেহকে বাঁচিয়ে রাখার কারুকার্যময় কৌশল আবিষ্কার করে গোটা পৃথিবীর বিস্ময়, প্রথম আদি যুগে তার উপকরণ যুগিয়েছে এই ভারতবর্ষ। খ্রীষ্ট জন্মের

দুশো বছর আগে গ্রীসের হাটে বাজারে বিক্রি হয়েছে ভারতবর্ষের কার্পাস।

প্রাচীন কালের ইহুদী রাজা সলোমন যে অলৌকিক ঐশ্বর্যে ঝলমলানো সাজগোজের জন্যে ইতিহাসের পাতায় ছবি হয়ে ফুটে আছেন—অজস্র মুদ্রার বিনিময়ে সেও এই ভারতবর্ষ থেকে কেনা।

আর বাংলা? সে তো দেশ নয়। সোনার খনি। না, তাও নয়। মর্ত্য-ভূমিতে যেন স্বর্গ। মোগলদের 'জিন্নেত-উল-বেলাৎ'। তার—

"হাজার বাণিজ্য নায়
সাগর বাহিয়া যায়।"

তার নদীর তটভূমিতে প্রতিটি বালির বিন্দুর ফাঁকে সোনা ঝিক্ ঝিক্ করে। সোনা দিয়ে ঘরের মাথা মুড়োনো। সোনায় গাঁয়ের রূপসী বধূর গা-মোড়া। আর সোনার চেয়ে দামে ভারী, ওজনে হালকা, মসলিন তারা হাত দিয়ে বোনে। চীনে যায়, তুরস্কে যায়, আরবে যায়, সিরিয়া, ইথিওপিয়া আর পারস্যে যায় সেই মসলিন। মসলিন নয়, 'হাওয়ার ইন্দ্রজাল'।

রোমের কী নেই? সে তো ঐশ্বর্যের সমারোহে টলমল। তবু রোমের মেয়েরা মসলিনের একটা টুকরো পেলে হাতের চাঁদ ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে ধুলোয়। অনেক ষড়ৈশ্বর্যময়ী সাম্রাজ্ঞীর মনেও ঐ একই আকাঙ্ক্ষার আগুন। একখণ্ড মসলিনের অভাবে তুচ্ছ হয়ে যায় সারা জীবনের রাজসুখ-ভোগ।

শুধু রানীর অন্দরমহলে নয়, প্রকাশ্য রাজ দরবারেও সে মসলিন পেয়েছে তার যোগ্য আসন। বিদেশ থেকে অসংখ্য দূত এসেছে এদেশের রাজার কাছে মসলিনের একখণ্ড নিদর্শন সংগ্রহের জন্যে। বিদেশে বিজিত রাজা বিজয়ী রাজাকে শ্রদ্ধা বা সম্মান জানাবার জন্যে সবচেয়ে মূল্যবান বস্ত্র মনে করতো ভারতের মসলিন।

মধ্য যুগের ইওরোপ তখন অন্ধকারে। ধর্মে সে উন্মাদ। লালসায় সে উৎক্ষিপ্ত। সে চায় সুখ, ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব আর ধর্মের বিস্তার। ভারতবর্ষের কল্পতরু প্রতিদিন হানা দেয় তার স্বপ্নে জাগরণে। সুদূর সমুদ্রপারের জলপথ আবিষ্কারের নেশা ক্ষেপিয়ে তোলে তার রক্ত। ঐশ্বর্য চাই। সুখ চাই। চাই অবারিত প্রভুত্বের অধিকার।

অতলান্তিক মহাসাগরের তীরে ছোট্ট আর স্বতন্ত্র একটা রাজ্য পর্তুগাল। লোকসংখ্যায় সে ক্ষীণ। শিক্ষা-সভ্যতায় হীন। রোম-সাম্রাজ্যের দীন প্রজা তারা। কিন্তু কব্জি আছে হাতের। আছে বুকের পাটা। আর লড়াই করার দাপট। আর দেশ থেকে মুসলমান ধর্মকে উচ্ছেদ করার সময়ে তারা শিখেছে যুদ্ধ-জাহাজ চালানোর কায়দা-কানুন। তবে আর কি? 'এবার জয় মা বলে ভাসা তরী।'

১৪৯৭ সালের ৮ই জুলাই। শনিবার। টেগস নদীর কিনারে শুধু মানুষের ঢেউ। হাসি-খুশিতে উচ্ছল। ঢেউ ছলছল করছে মানুষের মনেও।

প্রথমে রাজার আদেশপত্র পাঠ করে শোনান হল। তারপর বাজল নদী-তীরের মন্দিরের ঘণ্টা। জলের কল্লোল আর মানুষের কোলাহলের সঙ্গে মিশে গিয়ে সেই ঘণ্টার ধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে বাজতে থাকল চারপাশের আলোয় হাওয়ায়। স্বদেশের মাটিকে চুমু দিয়ে, দেশবাসীর শুভেচ্ছায় বুক বেঁধে পর্তুগীজ সেনা নায়ক ভাস্কো-ডা-গামা চাপলেন তাঁর বাণিজ্য-জাহাজে। সঙ্গে ১০৬ জন নাবিক। কিছু অস্ত্র-শস্ত্র। কিছু খাদ্য। আর কিছু সংশয়-অবিশ্বাস। কিছু আশা-উদ্দীপনা।

মধ্য যুগের ইওরোপীয় সমাজে তখন এরকম একটা ধারণা চালু ছিল যে অতলান্তিক মহাসাগরের পশ্চিমে বা দক্ষিণে কেবল জল আর জল। আর জলের যেখানে শেষ সেখানে মরুস্থল। ধু-ধু, শূন্য খরতপ্ত নৈঃশব্দ্যের দেশ। মানুষ নেই। সভ্যতা নেই।

ভাস্কো-ডা-গামার পোতে যে সমস্ত নাবিক ছিল তাদের মন থেকে মধ্য যুগের সে সংস্কার ঘোচেনি। তাই তারা মাঝে মাঝে হাতের হাল ছেড়ে বেঁকে বসতো ঘরে-ফেরার আগ্রহে। ভাস্কো-ডা-গামার এতবড় আবিষ্কারের সাধনা তাদের কাছে মাঝে মাঝে মনে হত নিছক খেয়ালিপনা। জাহাজের বাইরের চেয়ে জাহাজের ভেতরকার বিদ্রোহের ঝড়ে গামার উদ্যম ছিন্নভিন্ন হয়েছে বহুবার।

তবু তরী একদিন সত্যিই পেল তীর। চোখের সামনে তমাল তালীবনরাজী নীলার অপরূপ ছবি। দূরে আকাশ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল পাহাড়। এ কোথায়? এ কাদের দেশ?

এই সেই মালাবার উপকূল। খ্রীষ্ট আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই যেখানে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের জয়-জয়কার। পারস্য, আরব, মিশর যে

যেখানে যাক, যেখান থেকে আসুক, মালাবারে এসে একবার থামতে হবেই তাকে।

এখানে বহু জাতির বসবাস। যে এসে মেলে সেই গিলে যায়। দেয় আর নেয়। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে রাজা-রাজড়া, সম্রাট-শাহজাদার উত্থান-পতনের আলোড়ন থেকে দূরে, দুর্ভেদ্য পাহাড়-প্রাচীরের আড়ালে এই উপকূল। শান্ত, স্নিগ্ধ, নয়নাভিরাম। বিদ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদের লেশমাত্র নেই এখানে। এখানে কেবল বাণিজ্য আর বাণিজ্য। লক্ষ্মী চির-অচঞ্চলা।

আগে এখানে আরও অনেক বাণিজ্য বন্দর ছিল। তাদের আজ আর কোন চিহ্ন নেই। শুধু কালিকট বন্দর তখনো হারিয়ে যায়নি সমুদ্রের তলায়, বিস্মৃতির অতলে।

১৪৯৮ সালের ২০শে মে।

ভারতবর্ষের সোনার ধুলোয় পদার্পণ করলেন পর্তুগীজ-সেনাপতি। দামী ঝলমলে পোশাকে সেজে, মহামূল্য উপঢৌকনের ডালা হাতে তিনি চললেন কালিকটের রাজা জামোরিন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায়ে। রাজপথে রাজ্যসুদ্ধ লোকের ভিড়। এ আবার কোন্ দেশের মানুষ গো! কী যোয়ান চেহারা! কী ছাতি! মাটি কাঁপছে চলার ভারে।

রাজা আর প্রজা সকলের মনেই খুশির আবেশ। এবার দেশের বাণিজ্য বাড়বে। নতুন ক্রেতা এসেছে সমুদ্রপারের নতুন দেশ থেকে। আদর অভ্যর্থনার তাই ত্রুটিটুকু নেই কোথাও।

কেবল খুশি হয়নি আরব দেশের বণিকরা। এত জল ঘেঁটে সাতসমুদ্র পার হয়ে এরা কি এসেছে শুধুই বাণিজ্যের জন্যে? এহ বাহ্য। তবে কি ধর্ম-প্রচারের, মুসলমান উচ্ছেদের অভিপ্রায়ে!

আরব-বণিকদের সেই সামান্য সন্দেহের চারা গাছটা কাণ্ডে শিকড়ে অসংখ্য ডালপালায় আশঙ্কা-উদ্বেগের মহীরুহ হয়ে উঠল সেদিন, যেদিন তারা পর্তুগীজ বাণিজ্য তরীতে নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখতে পেলেন যুদ্ধের অস্ত্র আর বারুদ-বন্দুকের বিপুল আয়োজন। ভাস্কো-ডা-গামা এসেছিলেন মাত্র চারটি বাণিজ্য-জাহাজ নিয়ে। সে জাহাজগুলো কিছুদিনের মধ্যেই নানান পণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আর ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরের রাজ্য-শাসন সংক্রান্ত সমস্ত গোপন তথ্যও তাঁর যোগাড় করা হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের খ্রীষ্টানরাই সেদিন তাঁকে এসব গোপনীয় খবর যুগিয়েছিল। মোটামুটি কাজ হাঁসিল করে

গামা আবার নাবিকদের নির্দেশ দিলেন গৃহ-যাত্রার আয়োজন করতে।
পালে লাগল হাওয়া। দাঁড়ে উঠলো ঝপ্ঝপ্ সমুদ্রে সাঁতার কাটার শব্দ। জাহাজ ঘুরলো ঘরমুখো।
সেদিনও বিপুল জনোচ্ছ্বাস টেগস নদীর পাড়ে। জলোচ্ছ্বাস বাজছে জনতার বুকের ভেতরে। ভারতবর্ষ বিজয় করে ফিরে এসেছে দেশের ছেলে। জাহাজ বোঝাই পণ্য। পণ্য নয়, রত্ন।
এই রত্ন কেনা-বেচার সোর-গোল উঠল পর্তুগালের বাজারে বন্দরে। যে স্বপ্ন এতদিন স্বপ্নের মত ধূসরতা নিয়ে মনের আনাচে কানাচে ছড়িয়েছিল, প্রত্যক্ষ দিবালোকে দিনের আলোর মত তাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরে সারা ইওরোপ অধীর বিস্ময়ে ফেটে পড়ল।
পোপের তখন সর্বময় কর্তৃত্ব। পোপ বললেন 'ওহে, পর্তুগাল অধীশ্বর, এতদিন তুমি ছিলে ইথিওপিয়া, আরেবিয়া আর পারসিয়ার রাজা। আজ থেকে তামাম ভারতবর্ষের মালিকও হলে তুমি। আর এই নবাবিষ্কৃত জল-পথের একমাত্র স্বত্বাধিকারী।' ব্যস! আর যায় কোথায়। গোলা বারুদ, কামানভর্তি জাহাজ নিয়ে দলকে দল গাছ-কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়ল ভারত অধিকারে। মালাবারের উপকূলে বন্দরে বন্দরে উঠল দ্বন্দ্বের আলোড়ন। ফিরিঙ্গী বণিকের বারবার আক্রমণে, অত্যাচারে, ধর্মপ্রচারের নির্মম খড়্গের ঘায়ে তার শান্ত নীড়, স্বচ্ছন্দ জীবন উত্যক্ত, উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল দিনে দিনে। বণিকের নাম হল দস্যু। জলদস্যু।
এল পিক্র। পুরো নাম পিক্র এলভারেজ ক্যাব্রাল। ১৫০০ সালে কালিকটে ফ্যাক্টরী তৈরি করলেন তিনি। আগে কেবল ছিল রপ্তানীর কারবার। এখন আমদানী রপ্তানী দুই ব্যবসাই চালু হল।
পিক্রর তিন বছর পরে পর্তুগীজ সেনানীর অধিনায়ক হলেন অলফান্সো আবু-কার্ক। তিনি দেখলেন ঘুঘু জুটেছে। ঘুঘুর ফাঁদ নেই। ফ্যাক্টরী হয়েছে। তাকে রক্ষা করার দুর্গ নেই। সুতরাং দুর্গ গড়া শুরু হয়ে গেল। কালিকটের দুর্গই ভারতবর্ষে প্রথম ইওরোপীয় দুর্গ।
পিক্র এসে তিন বছর কাটিয়ে চলে গেলেন। আবার এলেন ডা-গামা। এক যায় আরেক আসে। কিন্তু অত্যাচার বাড়ে বৈ কমে না। আজ হাজার জনের নাক কাটা গেল তো কাল কাটা হল হাত। এর দাঁত ভাঙছে কাঠের বাড়ি মেরে। ওর নাক কেটে সেখানে জুড়ে দিচ্ছে কুকুরের কান। শুয়োরের মাংস

বেঁধে দিচ্ছে মানুষের মুখে। আর মুসলমান হল তাদের পরম শত্রু। কালিকট-রাজকে তারা সরাসরি জানিয়ে দিলে মুসলমানরা কালিকটে থাকলে কালিকট ধ্বংস হবে।

এমনি যুদ্ধ, বিগ্রহ, অত্যাচার আর হত্যালীলার মাঝখান দিয়ে পর্তুগীজ আধিপত্য ক্রমশ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এগোতে লাগল। ভারত-উপকূলে তাদের দখলে এল গোয়া, দমন, দিউ। গোয়া হল অধিকৃত রাজ্যের রাজধানী। এই সব রাজ্যলাভের পিছনে তাদের পরম সহায় ছিল ক্রীশ্চান পাদরী। সম্রাট আকবরের দরবারে তাদের হরবখত্ যাওয়া-আসা। কী দারুণ দোস্তালী। বুঝিবা তারাও এক একটা ক্ষুদে সম্রাট।
আকবরের মোহ আর ক্রীশ্চান পাদরীর মুদ্গর এই দুইয়ের যোগফলে পর্তুগীজ-দের রাজত্ব বিস্তারের সীমা বাংলাদেশের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল। চাঁটগা-র মাটিতে তাদের একটা সেরা বাণিজ্যের ঘাঁটি বসে গেল।
এইবার চাঁটগা থেকে সাত গাঁ পর্যন্ত পর্তুগীজদের বাণিজ্য বিস্তারের যে কাহিনী—সে আরেক মহাভারতের মতই অমৃত সমান। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার দুই প্রান্তে দুটি বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র তখন খুব নামজাদা। একটি চট্টগ্রাম। অন্যটি সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের চেয়ে চট্টগ্রামে বাণিজ্য করার সুবিধেটা বেশী। জলপথটা খুব কাছে। জাহাজ চলাচলের মস্ত সুযোগ। পর্তুগীজরা রতন চেনে। বাংলায় এসে তাই সবার আগে দখল করলে এই চট্টগ্রাম। দু-জায়গার নাম রাখলে দুটো। চট্টগ্রাম হচ্ছে 'পোর্ট-গ্রাণ্ডী'। অর্থাৎ বড় স্বর্গ। আর সপ্তগ্রাম হচ্ছে 'পোট-পিকানো'। অর্থাৎ ছোট স্বর্গ।
আকবর সাতগাঁ-কে বলতেন—'বুলখক খানা।' অর্থাৎ বিদ্রোহীদের আড্ডা।
আকবরের সময়ে পর্তুগীজরা বাংলাতেই বাণিজ্য করতো। হুগলীর উপকণ্ঠ ব্যাণ্ডেল-এ তাদের প্রথম আশ্রয় ভূমি। তৎকালীন মোগল সুবাদারের অনুমতিতে হুগলীতেই প্রথম বাণিজ্য কুঠি তৈরি হয়। এখনও ব্যাণ্ডেলের উঁচু মাথা গির্জাটার দিকে তাকালে হয়তো মনে পড়বে সেদিনকার জলদস্যু ফিরিঙ্গী বণিকদের স্মৃতি। পর্তুগীজরা যখন হুগলীতে বন্দর জাঁকিয়ে বসেছে সপ্তগ্রামের তখন একটু একটু করে পতন শুরু হয়ে গেছে। আর এদিকে পর্তুগীজদের দাপট, দম্ভ, দুঃসাহসের মাত্রা ক্রমশ ডিগ্রী পেরিয়ে চলেছে।

মোগল-শাসনকর্তাদের হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলা। উগরোতেও পারে না। গিলতেও পারে না। হাতের মুঠোয় যতই জোর থাক না, মাথার টিকি যে আকবরের মুঠোয়। আর আকবর শাহ যখন এত দেখে শুনেও চোখ বুজিয়ে আছেন—তখন আমাদেরই বা এত হুটো-চাপটা, হুঁশিয়ারীর কি দরকার ?

আকবরের রাজ্য-শাসন খুব বিচিত্র। কোন দেশ তিনি লুণ্ঠন করেন না। জোর জবরদস্তি দেখিয়ে কারো সম্পত্তি গ্রাস করেন না। শত্রুকে উৎকোচ দিয়ে প্রয়োজনমত বাধ্য করান। এমন কি শত্রুর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতেও তিনি গররাজী নন। এমনি কোমল। কিন্তু প্রয়োজন হলে তাঁর কঠোরতার সীমা সমুদ্রের মত অসীম। তখন 'বজ্রাদপি কঠোরাণী'। একদিকে তিনি ধর্মের অনুরাগী। তিলক পরেন। নিরামিষ খান। ব্রাহ্মণরা হাতে রাখি বেঁধে দিয়ে যায়। রাজঅন্দরে 'হোম'-এর আগুন জলে, মন্ত্রপাঠ হয়। আবার খ্রীষ্টান পাদরীদেরও তিনি বিশ্বাস করিয়েছেন, যে তাঁদের ধর্মের প্রতিও তাঁর অনুরাগ যৎকিঞ্চিৎ নয়। এই বিশ্বাসের ফলেই তাঁর দরবারে খ্রীষ্টান পাদরীদের প্রভাব অতিমাত্রায় বেড়ে উঠেছিল। আর সম্রাট যেখানে পাদরীদের অনুরক্ত সেখানে পাদরীদের চেলাচামুণ্ডারা অর্থাৎ পর্তুগীজ জলদস্যুরা যে বেশ কিছুটা বুকের ছাতি ফুলিয়েই দিনে ডাকাতি করবার সাহস পাবে সেটা ভাবা সভ্যতার দিক থেকে খুব বেশী যুক্তিযুক্ত না হোক দস্যুবৃত্তির দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আকবরের রাজত্বকাল থেকে শায়েস্তা খাঁর আমল অর্থাৎ ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত জলে ডাঙায় এদের অবাধ অত্যাচার, লুণ্ঠন সর্বনাশের পর্ব চলেছে। তাদের নাম হয়েছে তখন হার্মাদ। কথাটা এসেছে 'আরমাডা' থেকে। আর হার্মাদ বললেই কথাটা বাংলাদেশের মানুষের মনে, মন থেকে শরীরের ভাঁজে ভাঁজে একটা নিষ্ঠুর আতঙ্ক, ভয় কেঁপে কেঁপে উঠতো। হার্মাদদের যত বিক্রম জলপথে। একটা দুটো নয়, অসংখ্য জাহাজ এক সারে সাজিয়ে তাদের লুণ্ঠনাভিযান শুরু হয়। জাহাজগুলোকে বলা হত 'বহর'। বহরের যিনি ক্যাপ্টেন—তাকে বলা হত 'বহরদার'। বিষাক্ত অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই থাকতো জাহাজ। অস্ত্রশস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক যা—তা হল ঐ বহরের যাত্রীরা। স্নেহ, মায়া, মমতা, মনুষ্যত্বহীনতায় তারা অস্ত্রের চেয়েও ভীষণ।

তাদের আক্রমণের প্রধান প্রধান ঘাঁটি ছিল চট্টগ্রাম, খুলনা, ২৪-পরগণার উপকূল, নোয়াখালি, সন্দীপ, বরিশাল ইত্যাদি। এইসব জায়গায় পর্তুগীজদের

ঘর বাড়িও ছিল। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীবাজার নামই সেটা প্রমাণ করছে। এ ছাড়া কক্সবাজার আর সুন্দরবনের হরিণঘাটার মোহানাও ছিল ফিরিঙ্গী এলাকা।

রাজারাজড়ার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ, যেমন আরাকান রাজের সহায়তা নিয়ে শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে, কিংবা প্রতাপাদিত্যের দলভুক্ত হয়ে মোগলদের সঙ্গে—এসব বড় বড় সংবাদ ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলেই বেরুবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ, গরীব জেলে-জোলা ইত্যাদির সঙ্গেও তাদের যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ হয়েছে তার কিছু প্রমাণ শুধু আক্ষরিক নয়, ছন্দোবদ্ধ হয়ে আছে বিভিন্ন লোক কবিতায়। কোন কবিতায় চাষীদেরও উল্লেখ চোখে পড়ে।

এক পল্লীগীতিতে আছে—সমুদ্রকূলবর্তী জেলেরা একসঙ্গে মিলে হার্মাদ দস্যুদের আক্রমণ করল। সেনাপতির নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তারা পেছন থেকে ছুটে গিয়ে দস্যুদের চোখে ছুঁড়তে লাগল মুঠো মুঠো লঙ্কা আর মরিচের গুঁড়ো।

'কয়েকজন জাইল্যা তথায় সাইগরে মাছ ধরে।
জাইল্যার লুকায় ডাকুরা সব উড়িল দলে বলে॥
কেহ লৈল পালর বাঁশ, কেহ লৈল পই।
কেহ কেহ উজাইল ধামাদাও লই॥
ডাঙার শুরু হৈলরে সেই ধু ধু বালির চরে।
কারো মাথা ফাড়ি গেলগে, কেহ গেল মরে॥
হাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সেই বুড়া।
তড়াতড়ি আইল্ লগই মরিচের গুঁড়া॥
মরিচের গুঁড়া আনি কি কাম করিল।
মুট করি ডাকাইতের চোখে মেলা দিল॥ ইত্যাদি

হার্মাদরা কখনো ছোট ছোট ডিঙিতে তীরের বেগে ছুটে এসে চারপাশ থেকে ঘিরেছে বণিকের জাহাজ। কখনো একশ মাইল হেঁটে হঠাৎ কোন কলরব-মুখর উৎসব বাড়িতে, কি বাজনা-বাজা বিয়ের আসরে ঢুকে স্ত্রী-পুরুষ ভুলে যথেচ্ছ অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। সুন্দরী মেয়েরা ঘাটে স্নান করছে—হঠাৎ এসে তাদের ওপর জোর-জুলুম, নারীত্বের অবমাননা ঘটিয়ে নিয়ে চলল জাহাজে, ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করবে আরাকানে। পূর্ববঙ্গের পল্লীগাথায় তাদের বহু বিলাপ গাঁথা হয়ে আছে—

'অভাগিনীরে মনে রাখিও। ঘাটে আমার কলসী পড়িয়া
রহিল, আমার হাতের কঙ্কন ফেলিয়া আসিয়াছি; আমাকে
মনে করিয়া দুঃখ হইলে কঙ্কন ও কলসী তোমার হাত
দুখানি দিয়া ছুঁইও—তাহাতে আমি জুড়াইব। আর সুন্দরী
দেখিয়া একটি মেয়ে বিবাহ করিও। আমি যে আদর ও
স্নেহের জন্য পাগল ছিলাম, তাহা তাহাকে দিও, হত—
ভাগিনীর অদৃষ্টে তাহা নাই।'

লৌকিক ছড়া বা গান ছাড়াও আমাদের মঙ্গলকাব্যেও এই হার্মাদ-আতঙ্কের পয়ার-বদ্ধ চিত্র চোখে পড়ে।

'ফিরিঙ্গী দেশখান বহে কর্ণধার
রাত্রিদিন বহে যায় হার্মাদের ডরে।'

সমুদ্রোপকুলে গ্রাম-নগর থেকে মেয়েদের চুরি করে আনা এবং ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি করা ছিল পর্তুগীজদের একটা একচেটে ব্যবসা। বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি এই ব্যবসার কেন্দ্র। ছোট ছোট শিশুদের ধরে এনে ক্রীশ্চান করতো। ক্রীতদাস করে বিক্রি করতো।

পর্তুগীজরা মূলধনের জোরে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আসেনি কখনো। তারা ভেবেছিল গায়ের জোরটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জোর। সেই জোরে ব্যবসা জাঁকিয়ে তুলবে। কিন্তু ইতিহাস তাদের সেই অবারিত বাহুবললীলার মাঝখানে জুড়ে দিলে এক নতুন অধ্যায়।

আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাটের সিংহাসন পেলেন জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীর সম্রাট হলে কি হবে পিতার মৃত্যুর পর পুরো এক বছর তাঁর কেটে গেল এক গভীর দুঃসপ্নে, দুঃসহ যন্ত্রণায়। সে যন্ত্রণা প্রেমের। সে দুঃস্বপ্ন আকাশ ভরা চাঁদের চেয়েও লাবণ্যময় একটি মুখের। সে মুখ মেহেরুন্নেসার। একদিন এক নিমন্ত্রণ সভায় দেখেছিলেন তাঁকে মাত্র এক পলকের জন্যে। আর সারা বছর ধরে সেই একটি মাত্র পলকপাতের আগুন ঝলকে ঝলকে পুড়িয়ে মারছে তাকে। মেহেরুন্নেসা বর্ধমানের শের আফগানের স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত শের আফগানকে হত্যা করেই জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নেসাকে নিজের বেগম করলেন।

সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হবার পর থেকে মেহেরুন্নেসার নতুন নামকরণ হল নুরজাহান। মেহেরুন্নেসা মানে রমণীকুলের সূর্য। আর নতুন নামকরণে

তিনি হলেন জগতের আলো।

পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে যে সেলিম সিংহাসন লাভ করে সম্রাট জাহাঙ্গীর হলেন—তাঁর কিন্তু সিংহাসনে সুখ নেই। ভারতবর্ষ তাঁর সাম্রাজ্য নয়। তাঁর সাম্রাজ্য ভালবাসা। তাঁর মনোজগৎ, তাঁর 'জগতের আলো' নুরজাহান। রাজকীয় দলিল-দস্তাবেজে, স্বর্ণমুদ্রায় যেখানে জাহাঙ্গীর, সেইখানেই নুরজাহান। স্বর্ণমুদ্রার একপিঠে লেখা থাকতো—

'বহুত্ত শাহ জহাঙ্গীর যাফৎ সদ জেবর
বনামে নুরজঁহা বাদসহে বেগমী অর ॥'

জাহাঙ্গীরের আমলে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে অনেক। অনেক শত্রুকেই দমন করেছেন তিনি। কিন্তু পর্তুগীজ দমনে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ পায়নি।

জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহ সিংহের চেয়েও প্রচণ্ড। তিনি যখন দ্বিতীয়বার বাংলায় এলেন দ্বাদশ ভৌমিক বা বাবো ভূঁঞার বিদ্রোহ দমন করতে—সেই সময় পর্তুগীজরাও সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করল। ফ্রান্সিস কার্ভালো, রডা, গঞ্জালেস হলেন প্রতাপাদিত্য-পক্ষের নৌ সেনাপতি। এদিকে আবার হুগলীতে ঠিক সেই সময়েই হামলা চলেছে তাদের। হুগলীর কাছ দিয়ে কোন জাহাজ বা বাণিজ্যতরী গেলে তার জন্যে তারা শুল্ক আদায় করতে আরম্ভ করেছে। মুসলমান তীর্থযাত্রীদের মক্কাগামী জাহাজে লুঠপাট চালাচ্ছে হরদম। দেবমূর্তি ভাঙছে। এমনি নানা উৎপাত।

জাহাঙ্গীর বাপের মতই শান্ত। কিন্তু রেগে গেলে তিনিও অসাধারণ নিষ্ঠুর। পর্তুগীজরা দরবারে সুন্দরী মেয়ে উপহার পাঠায়। সম্রাট সে-সব সাদরেই গ্রহণ করেন। এই রমণী-ব্যবসার পরাকাষ্ঠার জন্যে তাদের 'ফকর অলতোজার' অর্থাৎ বণিক-গৌরব উপাধি দিতেও তাঁর কোথাও বাধে না।

কিন্তু যখন অত্যাচারের নেশা এই জলদস্যুদের জন্তুর চেয়েও নৃশংস করে তুলল জাহাঙ্গীর হুকুম দিলেন—সমস্ত পর্তুগীজদের জেলখানায় পুরতে, তাদের খ্রীষ্ট ধর্মের অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়ে গেল। তিনি উল্টে ডাচদের সঙ্গে বাণিজ্যের সন্ধি করলেন।

আর এই সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে উঠে এল ঢাকায়। নাম হল 'জাহাঙ্গীর নগর'।

তবুও যেন একটা 'কিন্তু' রয়ে গেল। পর্তুগীজরা মরতে মরতেও বেঁচে রইল। আর তাদের বাঁচা মানেই বাংলার মরণ।

জাহাঙ্গীর তখনো বেঁচে। তাঁর প্রিয় এবং তৃতীয় পুত্র সাজাহান হঠাৎ সিংহাসনের দাবিতে বিদ্রোহ জানিয়ে বসলেন। তিনি বিয়ে করেছেন মমতাজ বেগমকে। মা নুরজাহানের ভাইঝি। সাজাহান ভাবলেন মায়ের যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ—তখন মাভৈঃ। সিংহাসন তো আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু সব তালগোল পাকিয়ে দিল ছোট ভাই শাহ্রীয়র। তিনি বিয়ে করলেন একেবারে মা নুরজাহানের মেয়েকেই। অবিশ্যি এই কন্যা শের আফগানের ঔরসজাত।

নুরজাহানের সামনে দুটি দিক। একদিকে তাঁর জামাই। অন্যদিকে তাঁর ভায়ের জামাই। কাকে তাঁর বেশী ভালবাসা উচিত। তিনি নিজের জামাতার দিকেই অনুগ্রহ এবং মতামত জানালেন। তবু সাজাহানের মনে একটি মাত্র প্রত্যাশা। সে সিংহাসনের।

১৬২২ সালে তিনি প্রকাশ্যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয় ঘটলো তাঁর। পরাজিত হয়ে তিনি পালিয়ে এলেন বর্ধমানে।

সম্রাট-পুত্র স্বয়ং বিদ্রোহী। এই তো মওকা। যদি এতে আমাদের কিছু উপকার হয়—এই ভেবে পর্তুগীজ গভর্নর এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হা কপাল! ভেবেছিলাম সম্রাট-পুত্রের সেনাবল বোধ হয় খুব ভারী। সম্রাটের সঙ্গে যুঝতে পারবে। এখন দেখছি একেবারে উল্টো। আমাকেই ডেকে বলে—কিছু কামান আর কিছু সৈন্য দিয়ে সাহায্য করুন না। শুভদিন এলে আপনার ঋণ পরিশোধ করবো।

গভর্নর সাহেব চোখে বেশ কিছু ঝাপসা দেখলেন এই প্রস্তাবে। সাজাহান আজ দাপট মারছেন। কাল থাকবেন হয়তো গারদে। অথচ মাঝখান থেকে সম্রাটের কুনজরে পড়লে—একেবারে কুপিয়ে সাবাড়। সাজাহান পর্তুগীজদের সাহায্য পেলেন না।

তিনি একাই দারুণ দুঃসাহসে ভর করে বেশ কিছু সৈন্য সামন্তে ভারী হয়ে আচমকা বাংলার মোগল সুবাদারকে আক্রমণ করে বসলেন। সুবাদার প্রাণ হারালেন। সাজাহান বাংলার সিংহাসনটিতে পা ছড়িয়ে বসলেন দু-বছরের মত। জাহাঙ্গীর আবার ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে দুর্ধর্ষ সেনাদল পাঠিয়ে সাজাহানকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে এলেন। ১৬২৫ সালে সন্ধি হল দু-পক্ষের। ১৬২৭ সালে মারা গেলেন জাহাঙ্গীর। সাজাহান পিতার শূন্য

সিংহাসনে নিজের সুদৃঢ় অধিকার ঘোষণা করলেন।

সিংহাসনে বসেই মনে পড়ল পর্তুগীজদের। বিপদের দিনে, তাঁর জীবনের চরম নিঃসহায়তার দিনে তারা এতটুকু সাহায্য করেনি।

কাশেম খাঁকে তিনি বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠালেন—এই নির্দেশ দিয়ে, পর্তুগীজদের ওপর, তাদের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কার্যকলাপের ওপর তুমি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। আমার সুখ আমার প্রজার সুখে। পর্তুগীজরা কোন রকম বিধিবিগর্হিত কাজ করলেই তখনি সরকারে 'এত্তেলা' করবে। কাশেম খাঁ ভীষণ কড়া লোক। ক্রুদ্ধ বাজের মত অনেক দূর থেকেই তাঁর সূক্ষ্ম, সূচ্যগ্র দৃষ্টি পর্তুগীজদের প্রতিটি অঙ্গচালনার পিছু পিছু ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। বেশী দিন গেল না। দু-বছর পরেই সম্রাটের কাছে এক বিরাট 'এত্তেলা' এসে হাজির।

১। পর্তুগীজরা গায়ের জোরে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করছে।

২। সম্রাটের বিন্দুমাত্র অনুমতি না নিয়ে তারা বিরাট বিরাট দুর্গ তৈরি করছে এখানে ওখানে।

৩। তাদের বাণিজ্য ঘাঁটির সামনে দিয়ে কোন জাহাজ ইত্যাদি গেলেই শুল্ক আদায়ের জন্যে তারা সব রকম অত্যাচার চালাচ্ছে।

৪। বাদশাহের প্রধান বাণিজ্য বন্দর সপ্তগ্রামের ক্ষতি সাধন করছে তারা নানা ভাবে।

সাজাহান নিজে যখন বাংলায় ছিলেন তখন তো সবই দেখেছেন। তাই কাশেম খাঁর সব কথার পেছনেই যে খোদার কসম রয়েছে সেটা সহজেই বিশ্বাস করা যায়। তখনি কাশেম খাঁর ওপর আদেশ হল পর্তুগীজদের বাংলা থেকে একদম হটাও। যেন একটি পর্তুগীজও বাংলার আকাশের নীচে, আর মাটির ওপরে হেঁটে না বেড়ায়। ওদের নিশ্চিহ্ন করে খেদিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সম্রাটের খেদ মিটবে না।

কিন্তু হটাবো বললেই হটানো সহজ নয়। পর্তুগীজরা বড় বড় শক্ত, মজবুত দুর্গ তৈরি করেছে এদিকে ওদিকে। সেগুলো আবার নদী, নালা, ঝিল আর পরিখার পাকে পাকে ঘিরে রাখা। দুর্গের বুরুজে বুরুজে কামান। মোগল-দের চেয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল, অনেক বেশী আধুনিক।

দু-পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলল। এ ওকে অবরুদ্ধ করে। ওর ক্রুদ্ধ

আক্রমণে একে কাটাতে হয় রুদ্ধশ্বাস দিন। শেষ পর্যন্ত নগরের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে তাতে বারুদ পুরে রাতারাতি পর্তুগীজদের পাড়াকে পাড়া, অট্টালিকাকে অট্টালিকা উড়িয়ে-পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে দেবার একটা পরিকল্পনা যখন কাজে পরিণত হল—তখন দেখা গেল বাঘের ঘায়ে ঘোগ ঘায়েল হয়েছে। পর্তর্তুগীজদের সৈন্য মরল এক হাজার। ধরা পড়ল ৪,৪০০ নারী-পুরুষ। তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে ৪০০টি সুন্দর পুরুষ আর রমণীকে নিয়ে আসা হল সম্রাটের দরবারে।

পর্তুগীজদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তগ্রামেরও রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য সম্পদের ভাঙন শুরু হল। বন্দরের বাণিজ্য উৎসবের ভেতরে একটু একটু করে চলেছে ছন্দপতন। সম্রাট আদেশ দিলেন—সপ্তগ্রাম থেকে সমস্ত কাছারী বা রাজকার্যের যা কিছু দপ্তরখানা হুগলীতে উঠিয়ে নিয়ে এস।

সপ্তগ্রামের হারানো জৌলুস হুগলীতে যখন একটু একটু করে জ্বলতে শুরু করলো—ঠিক সেই সময়ে পরাজিত পর্তুগীজদের পাদপীঠে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের এক নতুন বাণিজ্য নাট্যের শুভ উদ্বোধন পর্ব চলেছে পুরোদমে।

এই প্রসঙ্গে শাহজাদা সুজার একটি মন্তব্য খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন:
"এক হাতে কৃপাণ, আরেক হাতে ক্রুশকাঠ এই নিয়ে পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। অজস্র হীরে মুক্তো মানিকের খোঁজ পেয়ে তারা প্রথমে ক্রুশকাঠ ফেলে দিয়ে কেবল থলি ভরাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এক হাতে না পেরে কৃপাণটাও ফেলে দিলে। তারই ফলে পরবর্তীকালে যারা এল তারা পর্তুগীজদের সহজে দমন করে নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করতে পারল।"

পর্তুগীজরা ব্যবসায়ী হিসেবে মরল। সেটা তাদের অতিরিক্ত বজ্জাতির ফল। কিন্তু জাত হিসেবে বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা গেল না। তাদের অনেক কিছু ভালো, অনেক কিছু মন্দ আমাদের সমাজ আর সংস্কৃতিকে মিশিয়ে নিতে হল রক্তের সঙ্গে। আজও মিশে আছে।

মগের বা ফিরিঙ্গীর ঔরসজাত ব্রাহ্মণ-সন্তান 'মগ ব্রাহ্মণ' আজও রয়ে গেছে বাংলায়, বিক্রমপুরে।

মেয়েরা মাথায় করে নিয়েছে 'ফিরিঙ্গী খোঁপা'।

আনারস যতই আমাদের জানা রস হোক, জানা আছে কি সেটা ফিরিঙ্গীদেরই আমদানী এদেশে। পেঁপে, পেয়ারা, কামরাঙা, রাঙা আলু, জামরুল, নোনা

আতা—এগুলোও।

আজ যখন কথা বলি, লিখি, পড়ি—তখন জানতে পারি না যে বাংলাভাষায় পর্তুগীজরা তার কত শব্দ যুগিয়েছে। যেমন জানতে পারি না যে আজকের কত বাঙালী সন্তানের শিরা-উপশিরায় বয়ে চলেছে পূর্বপুরুষ পর্তুগীজের রক্ত। যে 'সাবান' রোজ মাখি, যে 'জানলায়' আকাশকে কাছে পাই, যে 'আলমারিতে' থাকে থাকে সাজাই অনেক মূল্যে কেনা আদরের বইগুলো, 'বেহালার' কান্নায় নিজের কান্না শুনে কাঁদি যখন, যখন স্নানের জল তুলি 'বালতিতে', 'তোয়ালে' দিয়ে গা মুছি, 'বোতাম' লাগাই জামায়, পা ছড়িয়ে জিরিয়ে নিই 'কেদারায়' বসে,—তখন প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমরা পর্তুগীজদের সম্পদকেই নিজের ব্যবহারে খাটাচ্ছি। পর্তুগীজদের 'মাস্তুল' আমাদের জাহাজে। আমাদের জামা কাপড়ে তাদের 'ইস্ত্রী'। তাদের 'আলপিন' আমাদের কাগজে কাগজে জোড়া লাগায়। আমাদের নদীর 'তুফানে' তারা। তুফানের 'বজরায়' তারা। বজরার 'কামান', 'পিস্তল' লোক-'লস্কর' সবই তাদের। আমাদের জন্মমুহূর্তের 'আয়া'টিও তারা যুগিয়েছেন। পুঁথি-পাটার যুগে তারা আমাদের দেশে এসেছিল। অথচ প্রথম বাংলা বই ছেপেছিল তারাই। যদিও তা রোমান হরফে। পরে বেরিয়েছিল একখানা বাংলা ব্যাকরণ।

আর তারা দিয়ে গেছে কিছু ব্যাধি। তাদের অবাধ ব্যভিচারের অনিবার্য ফল। গলিত কুষ্ঠ ও অন্যান্য দুরারোগ্য রোগকে সেকালে বলা হত 'ফিরিঙ্গী' ব্যাধি।

"গন্ধরোগ : ফিরঙ্গোহয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্"

আর আছে তাদের অবারিত অত্যাচারের পীড়নে পীড়নে বেদনায় মর্মরিত হয়ে ওঠা বাংলার বহু লোককবিতা। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের দু-কূল ছাপিয়ে ওঠা পল্লীগাথায় সেদিনের সেই সকরুণ আর্তি,—আজকের আমরা ছাপার অক্ষরে পড়তে গিয়েও বার বার আচ্ছন্ন হয়ে যাই কান্নার আবেগে।
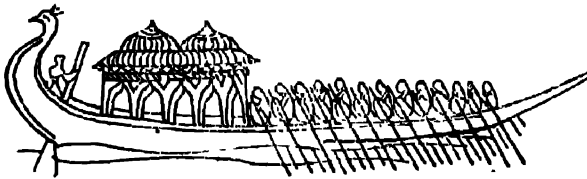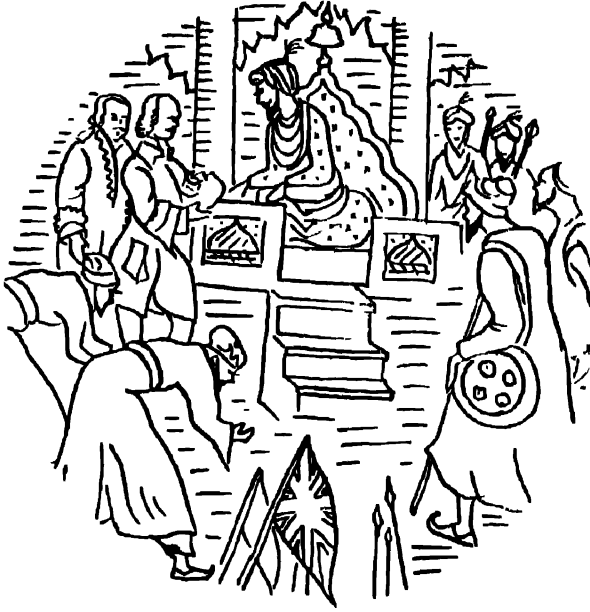
॥ জলের বণিক ডাঙায় ॥

এবার ইংরেজ-অভিযান পালা।

রাজা সপ্তম হেনরী যখন সিংহাসনে তখন থেকেই ইংরেজদের মনের মধ্যে ভারতবর্ষ জয়ের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু জয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগা যতটা জলের মত সোজা, জয় করার জলপথ আবিষ্কার করাটা ততখানি সোজা নয়। ১৫৬৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক বুকে খুব একটা দুঃসাহস আর দৃঢ় একটা সংকল্প নিয়ে প্লাইমাউথ বন্দর থেকে জাহাজে চেপে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি জমালেন। সাগরের ঢেউ ভেঙে ভেঙে, ঢেউ ভেঙে ভেঙে শেষ পর্যন্ত জাহাজ এসে ঠেকল ডাঙায়। মনে ভাবলেন—এইবার বুঝি ভারতবর্ষকে পাই পাই : কিন্তু যাই যাই করে আরো বেশ কিছুটা এসেও তিনি ভারতবর্ষে পৌঁছবার ঠিক পথ আবিষ্কার করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হল ঘরমুখো।

১৫৮৬ সালে টমাস ক্যাভেনডিশ নামক একজন সুদক্ষ নৌ-সেনাপতি আমেরিকার উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করলেন। অতলান্তিক মহাসাগরে জাহাজ কেবল ভেসেই চলেছে আর ভেসেই চলেছে। শেষে অনেক দিন অনেক রাত্রির প্রতীক্ষায় যে দেশের উপকূলে এসে জাহাজ জল ছেড়ে মাটির ছোঁয়া পেল

সেটা ভারতবর্ষ নয়। লানড্রোন ও জাভা। Cape of Good Hope হয়ে জাহাজ ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে পিছু ফিরল।

অবশ্য এঁদের আগে একজন ইংরেজ পরিব্রাজক বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন। তাঁর নাম ফিচ। ১৫৮৬ সালে। তখন ঢাকায় পর্তুগীজদের আধিপত্য এবং এলাকা খুব বড় রকমের।

১৫৯৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর। বিলেতের অলডারম্যানের বাড়িতে একদিন লণ্ডন শহরের সবচেয়ে নামজাদা, সবচেয়ে তাবড়ো তাবড়ো ব্যবসায়ীদের নিয়ে বেশ একটা বড় গোছের জমায়েত হল। উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো। পৃথিবীর পূর্ব দিকের দেশগুলোকে তখন বলা হত ইস্ট ইণ্ডিজ। সেই থেকেই এই কোম্পানীর নামকরণ করা হল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। অলডার-ম্যানের সেই বাড়িকে এখনও বলা হয় Founder's Hall.

এরপর ঠিক হল যে, এই কোম্পানীর মোট ১২৫ জন সদস্যের ভেতর থেকে পঁচিশজন সদস্যকে নিয়ে একটা পরিচালক-বর্গ তৈরি করা হবে। এই পঁচিশজনের মধ্যে একজন হবেন গভর্নর। তিন বছর পরে পরে আবার নতুন নির্বাচন শুরু হবে। পরিচালকবর্গ থাকবেন ইংলণ্ডেই। যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের কর্মচারীদের বেছে বেছে পাঠাবেন এদেশে বাণিজ্য বা ব্যবসা চালানোর জন্যে। তা বলে তাঁরা নিজেদের খেয়ালখুশি মত, মর্জি-মাফিক যা ইচ্ছে তাই করবেন, সেটি হবার উপায় নেই। তাঁদের প্রতিমুহূর্তেই কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মতামতকে মাথায় নিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

১৬০০ সালে রানী এলিজাবেথ এদের একটা বাণিজ্যাধিকারের সনদ দিলেন। ১৬০১ সালে ভারতের দিকে মুখ করে ইংলণ্ডের উপকূল থেকে চারখানা জাহাজ পালের অফুরন্ত হাওয়ায় তরতরিয়ে ছুটে চলল। এই অভিযানের নায়ক স্যার জন মেডেন হল। চারখানা জাহাজের নাম, the Scourge, the Susan, the Hector, the Ascension.

১৬০৩ সালে তিনি হাজির হলেন আকবরের দরবারে। বিনীত, নম্র ভঙ্গি। সঙ্গে নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন। মণিমুক্তো। তেজিয়ান ঘোড়া ও আরও কত কি। কিন্তু সবকিছুতেই বাদ সাধল ভাষা। ইংরেজির একবর্ণও আকবর বা তাঁর সভাসদ কেউই ধাতস্থ করতে পারলেন না। এতদূর থেকে ভেসে ভেসে এত কায়-ক্লেশের পর যদিবা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলাম, সামান্য ভাষার জন্যে ভেসে যাবে এত দিনের পরিকল্পনা? মেডেন হল শিখতে

লাগলেন পার্শী ভাষা। কিন্তু এ ব্যাপারে খুব বেশী এগোনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

১৬০৯ সালে জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে খুব বড় মাপের এক কুর্নিশ ঠুকলেন আর একজন বিনীত ইংরেজ। তিনি হকিন্স সাহেব। পার্শী ভাষা তাঁর কণ্ঠস্থ। এক আধ দিনে বা দু-দশ মাসে সম্রাটের শক্ত মনকে ভেজানো যাবে না, সেটা বুঝেই নিত্য-নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে দিলেন বাদশাহের দরবারে। আদা-জল খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি, আদায় করতেই হবে বাণিজ্যের অধিকার। এত জল-ঘেঁটে, এত কষ্ট অধ্যবসায়ের মধ্যে দিন কাটিয়ে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে নাকি? আড়াই বছর ধরে অবিরাম তোষামোদ খোসামোদের পালা চলল। আর এই ষোলো আনা স্তব-স্তুতির সঙ্গে ছিল আরও দু-আনা বেশী। সেটা উপহার। দর-দস্তুরে সেগুলো মহামূল্যই।

অবশেষে একদিন জাহাঙ্গীর বাদশার মন ভিজলো। তিনি হকিন্স সাহেবকে দরবারে ডাক দিয়ে বললেন—তোমার তপস্যায় আমার তখত-তাউস টলমল। তুমি আমাব কাছ থেকে একটা আরমানী সুন্দরী উপহার নাও।

হকিন্স বোকা নন। তিনি বেশ জানেন যে কামিনীর চেয়ে কাঞ্চনের অধিকার পাবার জন্যেই তাঁদের এত উদ্যোগ-আয়োজন। রূপসীর চেয়ে রূপেয়ার টানই তাঁদের এতদূরে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে মাতৃভূমি ছাড়িয়ে। হকিন্স বললেন, স্ত্রী রত্ন চাই না। আমরা চাই সামান্য একটু বাণিজ্যের অধিকার। আপনার অনুগত থেকেও আমরা চাই কিছু ব্যবসার সুযোগ। খোদাবন্দ, আপনি আমাদের সুরাটে একটা বাণিজ্য-কুঠি তৈরি করার অনুমতি দিন।

জাহাঙ্গীর বললেন, তথাস্তু।

এরই ছ-বছর পরে ১৬১৫ সালে স্যার টমাস রো দিল্লীর দরবারে এসে আভূমি নত হয়ে সেলাম জানালেন সম্রাটকে। তাঁর সঙ্গেও বহুমূল্য উপহার সামগ্রী। মনে ইংরেজ রাজত্ব বিস্তারের দুরন্ত তৃষ্ণা। মুখে মৃদু, শান্ত, স্নিগ্ধ হাসি। সম্রাটের দাসানুদাস এইটেই তাঁর আত্মপরিচয়।

ওপরওয়ালার তুষ্টিসাধনের সবকটি মন্ত্র যাঁর মুখস্ত, কার্যসিদ্ধি করতে তাঁর আর ক-দিন লাগে?

ইংরেজদের সুরাটের কুঠি খুব জেঁকে উঠছে দিনের পর দিন। তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মূলধন নিয়ে অর্থাৎ তখনকার দিনের তিন লাখের মত টাকা নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছিল। এখন এমন অবস্থা যে ফ্যাক্টরীর প্রধান অধ্যক্ষকে

মাইনে দিতে পারে ৫০০ পাউণ্ড। অবশ্য এর মধ্যে আবার কথা আছে। পুরো মাইনে কেউ পেত না। কারো অর্ধেক, কারো সিকি কেটে নেওয়া হত। সেটা জমা পড়তো ইংলণ্ডের খাতায়। টাকাটা হচ্ছে জামিন। তুমি যে তহবিল তছরুপ করে কোম্পানীকে ডোবাবে না তার প্রমাণ কি? তোমার কোন অসদাচরণের ফলে কোম্পানীর যদি কখনো কোন ক্ষয় ক্ষতি হয়—সেইজন্যে জমা রাখা হচ্ছে। প্রথম দিকে ফ্যাক্টরীগুলো থাকতো এক একজন এজেন্টের অধীনে। পরে হল প্রেসিডেন্ট।

১৬২২ সালে সুরাটের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট মারাঠার প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করে সুরাটকে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাই দেখে আওরঙ্গজেব অকসেনডেনকে একটা তরবারী আর খেলাৎ উপহার দিয়ে তাঁর বীরত্বকে সম্মান জানান। বিলেতের কোর্ট অফ ডিরেক্টররা তাঁকে মানপত্রে অভিনন্দন জানালেন—Preserver is not less than conqueror.

১৬৩৯ সাল। ভারতের পূর্ব দিকের উপকূলে চন্দ্রগিরি ছোট্ট একটা রাজত্ব। লম্বায় ছ-মাইল। আর চওড়ায় এক মাইল। ইংরেজরা সেটাকে কিনে নিলে কুঠি বানাবার জন্যে। সামনে সমুদ্র। বাণিজ্যের পক্ষে তোফা জায়গা। তার বদলে ঠিক হল যে চন্দ্রগিরির রাজাকে বছরে ন-হাজার টাকা খাজনা দিতে হবে। রাজার নাম শ্রীরঙ্গ। তাই দানপত্রের এক সর্তানুসারে এই উপকূলের নাম হল শ্রীরঙ্গপত্তনম্‌। এইটেই পুরনো মাদ্রাজ। ভারতের মাটিতে ইংরেজদের প্রথম দুর্গ তৈরি হল এইখানেই। সেন্ট জর্জ।

সুরাটে, মাদ্রাজে, ইংরেজরা কুঠি বানাতে লাগল। ব্যবসা ফেঁপে উঠছে বছরে বছরে। তবু মনে শান্তি নেই। বাংলাদেশকে দখলে আনতে হবে। বাংলার মসৃণ মসলিন, রেশম, চিনি, চাল, কাপড়—এসব জিনিস পৃথিবীর হাটে সবচেয়ে সেরা দামে বিক্রি হয়। এ ছাড়াও আছে নানাজাতের সুগন্ধী মসলা। ডাচরা বাংলার বুকে খুব জমিয়ে বসেছে। জোঁকের মত টাকা শুষছে। এই বাংলাকে আমাদের চাই।

১৬৫০ সাল নাগাদ ইংরেজরা হুগলীতে একটা ছোট্ট কুঠি বানিয়ে টিমটিম করা ব্যবসার বাতি জ্বালিয়ে বসল। ডাচদের একাধিপত্যের ফলে রাতারাতি কিছু একটা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এরই ছু-বছর পরে এল একটা সুবর্ণ সুযোগ।

এক সময়ে সাজাহানের একটি মেয়ের (জাহানারা ?) শরীরের সর্বাঙ্গ আকস্মিক ভাবে আগুনে পুড়ে যায়। জীবনের কোন রকম আশা নেই। এই সময় গেব্রিয়েল ব্রাউটন নামে একজন ডাক্তার দিল্লীর দরবারে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। সম্রাটের সঙ্গে তাঁর মৌখিক পরিচয় ও সখ্যতা ছিল। তিনি উঠে পড়ে লাগলেন সম্রাট-কন্যাকে বাঁচাবার জন্যে। দীর্ঘ চিকিৎসার পর সত্যিই আবার সম্রাট-কন্যার চোখের আলো, চলার শক্তি, রক্তের চঞ্চলতা ফিরে এল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন—কী চান আপনি পারিশ্রমিক হিসাবে বলুন। তাই দেব।

ব্রাউটন ডাক্তার হলেও ইংরেজ। আর ইংরেজ বলেই আর সকলের মত তাঁর আকাঙ্ক্ষাটাও এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রাউটন বললেন—বাংলা দেশে বাণিজ্যে করার স্বাধীন অধিকার।

ব্রাউটনের আদর আপ্যায়ন বাড়ল বাংলার নবাব সুজার দরবারেও। ১৬৩৯ সাল থেকে সুলতান সুজা বাংলার নবাব হয়েছেন। হঠাৎ একদিন সুজার মহিষী কঠিন অসুখে পড়লেন। ব্রাউটন রাজ অন্তঃপুরের সেই মহিষীকেও প্রাণপণে রোগমুক্ত করে তুললেন।

সুজা বললেন—কী চান আপনি পারিশ্রমিক হিসেবে বলুন। আমি তাই দেব।

ব্রাউটন সেই বাণিজ্যাকাঙ্ক্ষী ইংরেজদেরই একজন। আর তখন সব ইংরেজেরই এক রা। তিনি চাইলেন—বাংলাদেশে বাণিজ্য করার স্বাধীন অধিকার আর আদেশপত্র। আর হুগলী-বালেশ্বরে কুঠি নির্মাণের অনুমতি।

সুজা সম্মত হলেন। ঠিক হল প্রতি বছর তিন হাজার টাকা খাজনা দিয়ে সারা বাংলাদেশে ইংরেজরা অবারিতভাবে বাণিজ্য করতে পারবে। কাশিমবাজার, হুগলী, মালদা, পাটনা, ঢাকায় একে একে ইংরেজদের কুঠি উঠতে থাকল।

হুগলীতে যখন ইংরেজদের ব্যবসা ভরাদিঘীর মত কানায় কানায় টলমল, সেই সময়ে হুগলীর ফৌজদারের সঙ্গে চলল তাঁদের বাদ-বিসম্বাদ, রেষারেষি। এক আধ দিন নয়। হরহামেশাই। ব্যাপারটা কি ? ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। তোমরা টাকা কামাচ্ছো, পয়সা পিটছো। অথচ ফৌজদারকে দুটো পয়সা দিতে হাত ওঠে না কেন ? এ তো আর ঘুষ নয়। এ একটা সম্মান। নবাবকে 'নজরানা' দেওয়া যেমন। এ তো গেল একদিক। আরেকটা হল—এসেছ তো বাবা সাত ঘাট পেরিয়ে বিদেশ বিভুঁয়ে। আমাদেরই কৃপা-

করুণায় যাই হোক্ দু-পয়সা করে খাচ্ছো। তা এত নাক উঁচু কেন সব সময়ে ? 'আমাদের বুঝি মানুষ বলেই মনে হয় না।

সুলতান সুজার পর এতদিন বাংলার নবাব ছিলেন মীরজুমলা। ১৬৬৪ সালে মীরজুমলার মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হলেন শায়েস্তা খাঁ। আওরঙ্গজেবের মামা। মীরজুমলা তাঁর জীবদ্দশায় কোচবিহার, আসাম ইত্যাদি অধিকারের জন্যে সব সময়েই যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। ফলে তিনি বাংলার ইংরেজদের দিকে খুব একটা নজর দিতে পারেননি।

শায়েস্তা খাঁও নবাবী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অতিমাত্রায় জড়িয়ে পড়লেন। দক্ষিণ বাংলাকে মগ-পর্তুগীজদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা, আর সেই সঙ্গে আরাকান-রাজকে সন্দীপ আর চট্টগ্রাম থেকে হটিয়ে সেটা দখলে আনার ব্যাপারে।

কিন্তু এসব যুদ্ধ-হাঙ্গামা মিটবার পর যখন শায়েস্তা খাঁ ব্যবসায়ী ইংরেজদের দিকে ভালো করে চোখ তুলে তাকালেন তখন ইংরেজরা হুগলীর ফৌজদারের নামে আজ একটা, কাল দুটো, পরশু তিনটে—এমনি রোজই নানা রকম অভিযোগ ও অন্যায়ের বিবরণ পেশ করে যায়।

ফৌজদাররা আমাদের মাল আটকায়। যখন তখন তাদের টাকাটা-সিকেটার আবদার। যত দিই, কিছুতেই খাঁই মেটে না। টাকা কি আমাদের গাছে ফলে ? আমাদের ব্যবসায় এরকম বাধা দিলে আমরা এখনি এখান থেকে কুঠি-টুঠি সব উঠিয়ে নিয়ে যাব। তখন দেখা যাবে কে তোমাদের মুঠি ভরায় !

শায়েস্তা খাঁ ফৌজদারদের একটু আধটু ধমকানি দিলেন। কিন্তু কোন কাজ হল না। যথাপূর্বং তথাপরং।

হুগলী কুঠির প্রেসিডেন্ট হেজেস সাহেব নিজে গিয়ে এবার নিজেদের সকরুণ আর্জি পেশ করলেন।

করলে কি হবে শায়েস্তা খাঁরই তখন খাঁই দেখা দিয়েছে। টাকা চাই, টাকা চাই। প্রতিদিন যাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি খরচ হয়—তাঁর ভাণ্ডারে সব সময়েই অকুলান। হাত-টান লেগেই আছে।

তাঁর মনে সহসা প্রশ্ন জাগল—ইংরেজদের যখন আছে, তখন দেবে না কেন ? ইংরেজদের জোর সুলতান সুজার ফরমানের জোর। শায়েস্তা খাঁ বললেন—তোমাদের ও ফরমানের পরমায়ু শেষ। যদ্দিন সুজা ছিল তদ্দিনই ওটার

কার্যকাল। ওতো আর বাদশাহী ফরমান নয়। আর টাকা চাইলে দেবে নাই বা কেন? সুজার আমলে তোমাদের অবস্থা যা ছিল—এখন তো তার চেয়ে শতগুণে ভালো। যে দেশের যা রীতি, সেটা মানতে হবে বৈকি।

ইংরেজরা যেমন একনিষ্ঠ, তেমনি একগুঁয়ে। তারা ঐ পাওনা তিন হাজার টাকার বেশী একটা কানা কড়িও দিতে নারাজ।

ফলে অবস্থাটা একটু একটু করে পেকে, দিনে দিনে এমন একটা গুমোট, গরম, অথচ ঝড়ের মত থমথমে জায়গায় এসে পৌঁছল যে—দু-পক্ষেরই 'যুদ্ধং দেহি, রণং দেহি' হাবভাব।

ঠিক এইরকম একটা যুদ্ধ আর পরাজয়ের আশঙ্কার আবিল মুহূর্তে ইংরেজ-দের পক্ষে আবির্ভাব ঘটল একজন সাহসী নেতার। তিনি জব চার্নক। কলকাতার আদি আবিষ্কারক। একদিকে অফুরন্ত স্বপ্ন, অন্যদিকে অবিরাম সংগ্রাম—এই দুই পারাপারের মাঝখানে উদ্বেল, উৎসাহী একটি জীবন।

পলাশীর ১০০ বছর আগে ১৬৫৫ কি ৫৬ সালে চার্নক প্রথম আসেন ভারতবর্ষে। কাশিমবাজারের জুনিয়ার মেম্বর। চতুর্থ সদস্য। মাইনে কুড়ি পাউণ্ড। কোম্পানীর চিরকালের 'old & good servant' তিনি।

১৬৮৫ সালে হুগলীর চীফ্ এজেণ্টের মৃত্যু হওয়ার ফলে কাশিমবাজার থেকে হুগলীতে ডাক পড়ল তাঁর। কিন্তু পাওনা টাকা অনাদায়ের ফলে কাশিমবাজারের দালাল গোমস্তারা কুঠির কর্তাদের নামে ৪৩ হাজার টাকার এক ডিক্রি জারী করে বসল। নবাবের হুকুম হল তাঁকে ঢাকায় আসবার জন্যে। কিন্তু চার্নক সেখানে না গিয়ে কাশিমবাজারেই কিছুদিন নজর-বন্দী হয়ে থাকার পর এক নিশুতি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পালিয়ে এলেন হুগলীতে। সঙ্গে ৩০৮ জন সৈন্য, কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ। ১৬৮৬ সাল।

মোগল সেনারা এদিকে কাশিমবাজার কুঠি দখল করে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরও বড় রকমের একটা অভিযানের কথা ভাবছেন।

চার্নক হুগলীতে এসে একটা কথা বেশ স্পষ্ট করেই বুঝলেন যে, ফরমান-টরমানের নজীর দেখিয়ে নবাবের সঙ্গে লড়া যাবে না। সর্ত-টর্ত নিয়ে আর আমাদের মত্ত থাকলে চলবে না। পায়ের জোর চাই। নিজেদের শক্তিতে নিজেদের দাঁড়াবার জোর। গায়ের জোর চাই। তরবারীর সঙ্গে যুদ্ধ

করতে হলে তরবারীই চাই আরেকখানা। কামানের জবাবে কামান।

চার্নক ওপরওয়ালাদের সঙ্গে গোপনে চিঠি চালাচালি করে কেল্লা বানাবার কথা পাড়লেন। কোম্পানীর লোকেরা জানাল—এখনি সাত-তাড়াতাড়ি কিছু করার দরকার নেই। সরকার চটলে সমূহ বিপদ। তবে যেখানে যত ইংরেজ আছে, হুগলীতে এনে জড়ো করো।

চারধার থেকে ইংরেজরা এসে চাক্ বেঁধে বসলো হুগলীতে।

শায়েস্তা খাঁর তখন অসীম ক্ষমতা। স্বয়ং সম্রাট তাঁকে রাজ্যশাসনের জন্যে স্বাধীন অধিকার দিয়েছেন। হুগলীর এই লোক সংখ্যা, সেনা সংখ্যা বৃদ্ধির খবর যেই এসে পৌঁছল তাঁর কানে—রাগে তিনি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে হুকুম দিলেন—এখনি সেনা সাজাও। ঘেরাও করো হুগলী।

হুগলীর ফৌজদার মনে মনে ভাবলেন—তিনিই বা নবাবের চেয়ে কম যাবেন কেন? হুকুম দিলেন—ইংরেজদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধের জন্যে কেউ যেন কোন কিছু না বেচে বা না কেনা কাটা করে। এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যও নয়।

ছাইচাপা আগুন উঠল গা ঝাড়া দিয়ে। সিংহের কেশরের মত ফুলে ফুঁসে উঠল ক্ষ্যাপা আগুনের শিখাগুলো। কামানে কামানে, গোলায় গোলায়, রক্তে রক্তে মেতে উঠল এক ধ্বংসলীলা।

চন্দননগরে ছিল ইংরেজদের একদল সেনা। ঘোলকাটের কাছে ফৌজদারের তোপখানা। তোপখানার পাশেই শাসনকর্তার আবাস। ইংরেজ সেনারা আরবথনটের নেতৃত্বে সেটা জয় করে যখন আরো এগোতে শুরু করেছে—ফৌজদার আবদুল গনি ছদ্মবেশে নৌকায় চেপে হুগলী ছেড়ে পালালেন।

ইংরেজদেরই জয় হল যুদ্ধে।

বাতাসে বারুদের গন্ধ। সমস্ত শহরের ওপরে কামানের কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া। ধ্বংস আর নীরবতা। নীরবতা আর বুক চাপড়ানো আর্তনাদ। থমথম, ছমছম্ অথচ চঞ্চলতায় ভরা শহর। চার্নক এই যুদ্ধ-থামা হুগলীর কুঠিতে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন, ভেবেই চললেন পর পর ক-দিন—ততঃ কিম। এর পর কি?

৫৪ বছর আগে এই অক্টোবর মাসেই মোগলরা পর্তুগীজদের খুঁটি, কুঠি উপড়ে ফেলেছে বাংলা থেকে। তাদের মেয়েরা হয়েছে বাদশার হারেমের ক্রীতদাসী। পুরুষেরা ক্রীতদাস। কেউ মরেছে ছোরার ফালে। কেউ

মরেছে জলে ডুবে। আর আমরা কি টিকে যাবো? না কি গলায় দড়ি পড়বে এই অতিবুদ্ধির! তার চেয়ে সাবধানের মার নেই। সাবধান হই।

যুদ্ধের পর মাস দুয়েকের মধ্যে জাহাজে কোম্পানীর মালপত্র চাপিয়ে লোক-লস্কর নিয়ে চার্নক হুগলী ছেড়ে পালালেন।

ওদিকে তখন শায়েস্তা খাঁ রেগে টং হয়ে ইংরেজদের ওপর গায়ের ঝাল মেটাচ্ছেন। পাটনার কুঠি লুঠ করা হল। কর্মচারীদের বেঁধে এনে আটকে রাখা হল জেলখানায়। ঢাকাতেও তাই হত। ভরমল নামে একজন ইংরেজ-হিতৈষীর মধ্যস্থতায় সেটা বন্ধ হল।

চার্নক তো পালালেন। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে উঠতে তো হবে একটা জায়গায়। চলো বালেশ্বরের কুঠিতে।

আরে, আরে মাঝপথে ওটা কি? বনে-জঙ্গলে ঢাকা গ্রামটা কেমন দেখা যাক তো নেমে।

গ্রামের নাম সুতানুটি। একটা হাট আছে। আছে খড়ে-ছাওয়া দু-চারটে মাটির ঘর। মাস খানেক এইখানেই রয়ে গেলেন চার্নক। কিন্তু মন খুবই উদ্বিগ্ন। কি হবে, কি না হবে। নবাব শায়েস্তা খাঁর রাগ যে কিছুতেই পড়ছে না।

সুতানুটি ছেড়ে চার্নক আবার এগোতে লাগলেন। মন অস্থির। সুস্থির হয়ে কোথাও বসতেও পারছেন না। মেটেবুরুজ দিয়ে যাবার সময় নবাবের নুনের গোলাকে পুড়িয়ে দিলেন। শিবপুরের থানা দুর্গটাকে খুব সহজেই দখল করে নিলেন।

তারপরেই হিজলী। এখানে এসেও নিস্তার নেই। মোগলদের সঙ্গে একটা ছোট-খাটো যুদ্ধ হয়ে গেল। তার ওপরে যা জংলী জায়গা। জলে বিষ। হাওয়ায় নরকের বীজাণু। জ্বর, ম্যালেরিয়ায় প্রতিদিন মানুষ মরাটা এখানে যেন একটা তুচ্ছ ঘটনা। সেকালের ছড়া এর সত্যাসত্য ব্যাপারে সাক্ষী দিচ্ছে—

"একবার খেলে হিজলী পানি
যমে মানুষে টানাটানি।"

হিজলীতে বসবাস করতে গেলে অসুবিধে যেমন এতগুলো, সুবিধেও তেমনি বিস্তর। প্রচুর শস্য হয় এখানে। নুন তৈরি হয় আরও বেশী, সমুদ্র কাছে বলেই

হয়তো। নুনের ব্যবসা মোগলদের একচেটে, লাভও তেমনি। তাছাড়া জায়গাটা চারদিকে ঘেরা। হুগলী কি ঢাকা থেকে এসে চট্ করে কেউ আক্রমণ করবে, সে ভাবনা নেই।

ভাবনা নেই বলেই ইংরেজরা মোগলদের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ার জন্যে তাল খুঁজছিল।

ইংরেজরা বালেশ্বরে নবাবের দুর্গ আর তোপখানাটা দখলে এনেছে সবে। নদী বেয়ে দু-খানা জাহাজে একদিন চারটে হাতী আসছিল। দুটো নবাব শায়েস্তা খাঁর। বাকী দুটো শাহজাদার। ইংরেজদের কি মতিভ্রম ঘটল, জাহাজ আক্রমণ করে হাতী চারটে দখল করে নিলে।

এই ঘটনায় শায়েস্তা খাঁর একরোখা মেজাজ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। ঘটনা তো একটা নয়। পর পর অনেকগুলো দস্যুপনা ঘটিয়েছে তারা। হুগলী লুঠ, বালেশ্বর দখল, থানা দুর্গ অধিকার, হিজলী দখল। এবার একটু উচিত মত শিক্ষা দিতে হবে।

আওরঙ্গজেব এতদিন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ বিগ্রহে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে তাই তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। হঠাৎ কোন গুরুতর খবর এলে তিনি শুধু বাংলাদেশের মানচিত্রটা চোখের সামনে নিয়ে ভুরু কোঁচকান। আবার নিজের যুদ্ধের ভাবনায় ডুবে যান।

কিন্তু এইভাবে চুপচাপ আর ক-দিন কাটানো যায়। একটা হিত-বিহিত এখনি না করলে—ইংরেজদের কাণ্ডকারখানা ক্রমশ বিপরীত ঘটাবে। শায়েস্তা খাঁ প্রচুর অশ্বারোহী, অসংখ্য পদাতিক সেনা নিয়ে ইংরেজদের খেদিয়ে সাগর-পার করার সংকল্প করে যুদ্ধযাত্রায় পাঠালেন—মালেক কাশেম খাঁকে।

এদিকে মার্চ এপ্রিল মাস থেকে হিজলীতে লেগেছে মড়ক। শয়ে শয়ে লোক মরছে দু-বেলা। ঘরের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে পচা পেট-ফোলা গোরু। পচা মাছ ছাড়া খাবার পাওয়া যায় না। ইংরেজদের যে সব কুলি, মজুর, সান্ত্রী ছিল, আপন প্রাণ বাঁচাতে হিজলী ছেড়ে তারা চোঁচা দৌড় দিলে।

তবুও যুদ্ধ বন্ধ রইল না। চার্নক আক্রমণ করলেন মোগল সেনাদলকে। প্রথম চট্‌কাতেই তিনি দখল করলেন নবাবী-ফৌজের ১৫০০ মন চাল। দ্বিতীয় দফায় নবাবের তোপখানা ভাঙলেন। বড় বড় কামান নষ্ট হল। ছোটগুলো নিজেদের দখলে এল।

কিন্তু এর পরেই যুদ্ধের চাকা উল্টোমুখো ঘুরে দাঁড়াল। মোগলদের নিদারুণ

আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে ইংরেজদের জাহাজ সমুদ্রের দিকে পালাতে লাগল। অবিশ্রাম গোলা পতনের শব্দে মাটির নরম বুক ফেটে চৌচির।

ইংরেজদের তখন কাহিল অবস্থা। জ্বরে, ম্যালেরিয়ায় অসংখ্য মরেছে। বাকী প্রায় শ-তিনেক শুষছে। জ্বরে ভুগে ভুগে শুকিয়ে পাকাটি। ঢাল, তরোয়াল ধরতে না পারলে—শুধু শুধু নিধিরাম সর্দার সেজে আর ক-দিন যুদ্ধ চালানো যায়।

মোগলরা ইংরেজদের এই অসহায় অবস্থার সংবাদ পেয়ে নগরে লুঠপাট, আগুন লাগানো শুরু করে দিলে। মোগলদের উন্মত্ত অত্যাচার-উৎপীড়নে ইংরেজরা 'ত্রাহি মধুসূদন' 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়তে লাগল।

চার্নক ঠিক করলেন—'মরেছি না মরতে আছি'। এবার হিজলী থেকে পাত্‌-তাড়ি তুলে সেই সুতানুটিতেই যাওয়া যাক্। সেখানকার বনে জঙ্গলে একটা মাথা গুঁজবার মত আস্তানা গেড়ে তবু কিছুদিন কাটানো যাবে।

চার্নক আবার নৌকায় চাপলেন সুতানুটির উদ্দেশে। পথেই পড়ে উলুবেড়িয়া। তিনি সেখানে নেমে ডক তৈরি করে জাহাজ মেরামতের কাজে লেগে পডলেন। কিন্তু জায়গাটা খুব আরামদায়ক বলে মনে হল না তাঁর। চারদিক ফাঁকা। বাণিজ্য জমানো কঠিন। জংলী পেঁচার লক্ষীছাড়া ডাক শোনা যায় কেবল।

চার্নক শেষ পর্যন্ত সুতানুটিতেই এসে পৌছলেন। একটা ঘর দোর বেঁধে কিছুদিন মাথা ঠাণ্ডা করে কাটানো যাক্‌ এখানে। তারপর ভাবা যাবে—কি করে ব্যবসাকে আবার পুরনো বা হারানো দিনের মত জমিয়ে তুলতে পারা যায়।

এদিকে তাঁর দূত ছুটল নবাব-দরবারে। ব্যবসার কিছু গতি করবার চেষ্টায়। কিন্তু কিছুই হল না। এমন সময় হীথ সাহেব এসে তড়িঘড়ি জুড়ে দিলেন। চলো, ওঠো। আর এখানে বসে স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখতে হবে না, ঢের হয়েছে। আরাকান রাজের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করে দেখা যাক্—কতটা কি হয়। আরাকান রাজার সঙ্গে সন্ধি হবার আগেই হীথ সাহেব সবাইকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলেন মাদ্রাজে।

মাদ্রাজ তখন খুব জমজমাট। ইংরেজদের বসবাস এখানে কম নয়। ব্যবসা চলেছে জোর।

জব চার্নক মাদ্রাজের কুঠিতে বসে বসেই তখন স্বপ্ন দেখছেন—বাংলাদেশে কি করে ব্যবসা জমানো যায় আবার।

এমন সময় আওরঙ্গজেব নিজের ভুল কিছুটা বুঝতে পারলেন।

ইংরেজরা ছিল, বেশ ছিল। কেন তাদের তাড়ালাম? রাজকোষে বছর বছর তিন হাজার টাকা জমা পড়ত, সেটা গেল। এখন ব্যবসা বাণিজ্যও অচল। আজ মারাঠা, কাল রাজপুত, পরশু বিজাপুর, গোলকুণ্ডার নবাব—এদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে করতে বাদশাহী দৌলতখানা ফৌত হবার যোগাড়।

এ তো গেল অর্থনীতির দিক। রাজনৈতিক দিক থেকেও ইংরেজদের বেশ একটু প্রয়োজন পড়ল সম্রাটজাদার।

পর্তুগীজ জলদস্যুরা খুব উদ্ধত হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। মক্কা যাওয়ার পথে হজযাত্রীদের ওপর তারা হানা দিয়ে নানাভাবে নির্যাতন করে। জলপথে তাদের শায়েস্তা করার মত নৌ-বল বা রণ-কৌশল মোগলদের আয়ত্তের বাইরে। আর ওরা হচ্ছে জলের জীব। হাঙর কুমীরের চেয়েও ভয়ংকর।

এখন ইংরেজদের আবার ডাকাই উচিত। নইলে হার্মাদদের ফাঁদে ফেলা যাবে না।

বাংলার নতুন নবাব হয়েছেন ইব্রাহিম খাঁ। তাঁর স্বভাবটা একটু গো-বেচারা গোছের। 'সুতর-দিলি' মেজাজ তাঁর। অর্থাৎ উটের মত নম্র। তিনি দেখলেন, 'নরম সম্‌সের বুদ'—তরবারির ধার নরম। 'সেল্‌ সেলে ফেৎনা দরাজ' বিবাদের শৃঙ্খল বড়ই লম্বা। 'ও দস্তে খোদ্‌ কোতা দিদা'—নিজের সাধ্যও সংকীর্ণ। সুতরাং 'বা হজরৎ শাহিনশাহী আরজদাস্ত নমুদ'—বাদশাহের কাছে আর্জি জানানো ভালো।

বাদশাহের মনোভাব নরম জেনে ইব্রাহিম খাঁ মাদ্রাজ থেকে বাংলায় ফিরে আসার জন্তে অনুরোধ জানালেন চার্নককে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধে সবই দেওয়া হবে। কেউ কারো ওপর হামলা করবে না আর। আগের মত তিন হাজার টাকা বছরে বছরে খাজনা দিলেই—সব ঠিক-ঠাক।

চার্নক ১৬৯০ সালের ২৪শে অগস্ট সুতানুটির ঘাটে এসে নামলেন। সেই বুনো, জংলী, জলাকীর্ণ সুতানুটি।

আগের বারে এসে যেখানটায় ছিলেন ঘর বেঁধে, এসে দেখেন সেটা ভেঙে চুরে একশেষ। লালমুখো সাহেবদের দেখতে আশপাশের গ্রামের লোক ভেঙে

পড়ছে। কিন্তু তাদেরই বা কি জিজ্ঞেস করবে। মাথা গোঁজার মত ঠাঁই চাই আপাতত। প্রচণ্ড গরম। সমস্ত শরীর যেন পুড়ে কুঁচকে কালশিটে পড়ে যাচ্ছে।

আবার সন্ধ্যে হতে না হতেই এল বৃষ্টি। অঝোর। অবিশ্রান্ত। চার্নক বোটের ভেতরেই রাত কাটালেন।

পরের দিন কাউন্সিলের মিটিঙে প্রস্তাব পাশ হল যে, এই মুহূর্তে একটা গুদাম, একটা রান্নাঘর, থাকবার ঘর, প্রহরীর ঘর আর এলিস্ সাহেবের বাসস্থানের প্রয়োজন সবচেয়ে জরুরী। এজেণ্ট মি: পিচির ঘরটা যা আছে, তাকেই একটু মেরামত করে নিলে চলে যাবে।

শেষ পর্যন্ত সুতানুটিতেই চার্নকের মন বসল। এবং অনেক ভেবে চিন্তেও দেখলেন—জায়গাটা বেশ নিরাপদ, নিরালা। যদিও চারপাশের পরিবেশের মধ্যে কোথাও সৌন্দর্যের নামগন্ধটুকুও নেই। তা হোক্। কে আর আমাদের জন্যে স্বর্গ-রাজ্য বিছিয়ে রেখেছে না রাখবে?

ইংরেজরা প্রথম দিকে হাটখোলাতেই আস্তানা পেতে বসল।

পাশের গাঁয়েই সুতানুটির হাট। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধে।

বৌবাজারের রাস্তাটা শেয়ালদার গা ছোঁবে ছোঁবে করছে যে জায়গাটায়—সেখানে একটা বিরাটকায় বটগাছ। তারই তলায়, অনেকখানি ঘন কালো শীতল ছায়ার নীচে বসে চার্নক গড়গড়া টানতেন রোজ। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত হাট বাজারের ব্যাপারীরা। চলত দর-দস্তুর। কেনা-বেচা। আমদানী রপ্তানীর আয়োজন। আবার ফিরে যেতেন তাঁর ব্যারাকপুরের নিজস্ব বাসাবাড়িতে।

আর স্বপ্ন দেখতেন—এইখানেই ইংরেজদের একটা সবচেয়ে সেরা কুঠি, সেরা বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা যায় কোন্ মন্ত্রবলে। সুরাটের চেয়ে বড়। মাদ্রাজ দেখলে লজ্জা পাবে। কোম্পানী বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাবে—এত বড় একটা বাণিজ্য-কেন্দ্র!

কিন্তু বেশী দিন এ স্বপ্ন তাঁকে দেখতে হয়নি। মাত্র তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশ একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করেই তিনি মারা গেলেন।

চার্নক বিয়ে করেছিলেন পাটনায়। সে এক ঘটনা।

সতীদাহে প্রাণ বিসর্জন দিতে এসেছে এক মেয়ে। পরমা সুন্দরী। মানবী

নয় যেন দেবী। হিন্দুর মেয়েরা স্বামীকে এত ভালবাসে ? এমন অতুল জীবন, অপরূপ যৌবন পুড়িয়ে ছাই করে দেয় তারা স্বামীর চিতায় !

হিন্দু নারীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠলেন চার্নক। পাটনা কুঠির সিপাই সান্ত্রীদের ডাকিয়ে বন্ধ করলেন ঐ সতীদাহ। মেয়েটির সঙ্গের লোকজন আত্মীয়-পরিজনকে কড়া ধমকানি দিয়ে তিনি তাড়ালেন। হিন্দু রমণী যত্নের আশ্রয় পেল ইংরেজ কুঠির কামরায়। পরে এই রমণীকেই দীর্ঘ প্রেম-আরাধনা করার পর শেষে তাঁকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতা করে ক্রিশ্চানী মতে বিয়ে করলেন।

চার্নকের তিন মেয়ে। তিন মেয়েরই কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা নামজাদা ইংরেজদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল।

মরবার আগে চার্নক যে উইল রেখে গিয়েছিলেন—সেটা খুবই বিচিত্র। কন্যারা সম্পত্তি পাবেই—এ জানা কথা। কিন্তু কেউ ভাবতে পারেনি যে উইলে তাঁর সরকার মশাই বদলী দাস আর দুজন প্রিয় চাকর ঘনশ্যাম আর দুর্লভ—এদেরও নাম থাকবে।

আরেকজন ছিল—এক বাঙালী ডাক্তার। তাকে আর উইল মারফৎ কিছু দেননি। মরবার আগে নিজের হাতেই যা দেবার দিয়ে যান।

চার্নক নেই। এলিস্ সাহেব হলেন সুতানুটির কুঠি-সর্দার। তিনি 'কাজে কুঁড়ে আর ভোজনে দেঁড়ে' গোছের মানুষ। গোটা মগজ খুঁজলেও তিল পরিমাণ বুদ্ধি বেরুবে কিনা সন্দেহ।

এমনি সময় মাদ্রাজ থেকে কোম্পানীর সুতানুটি পরীক্ষা করতে এলেন স্যার জন গোল্ডসবরা। এসে দেখেন এ যে ফাঁকা মাঠ! ঘর কই? বাড়ি কই? কোম্পানীর হিসেবের নথিপত্র, খাতা কাগজ রাখবার কাছারী কই? মালপত্র এরকম স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেন ?

গোল্ডসবরা এলিসের কাজের দৌড় টের পেলেন। ১৬৯৬ সালে তিনি চার্নকের জামাই চার্লস আয়ারকে মাদ্রাজ থেকে ডেকে এনে কলকাতার সর্বময় কর্তা করে দিলেন।

সেই সঙ্গে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে তাঁদের কাছারীটা ভাড়া নিলেন মালপত্তর রাখার, দপ্তর বসাবার সুবিধের জন্যে।

তারপরে ভাবলেন কেল্লার কথা। প্ল্যান্‌টান তৈরি। কাজ আরম্ভ করে দিলেই হয়।

সুতানুটির দক্ষিণ দিকে কলকাতার একটা উঁচু টিপি, ঠিক গঙ্গার গায়েই।

গোল্ডস্‌বরা সেইখানেই কাজ আরম্ভ করলেন। একটা বুরুজ শেষ হয়েছে। মাটির দেয়াল গাঁথা হচ্ছে। এমন সময় গোল্ডস্‌বরার ডাক এল মৃত্যুর দেশ থেকে। কলকাতা যেন অভিভাবকহীন, নির্জীব হয়ে রইল কিছুদিন। চার্লস আয়ার নিলেন তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার নিজের হাতে। দুর্গের কাজ এগোচ্ছে। কিন্তু মনটা ক্রমশ ভয়ে পিছোচ্ছে। যদি নবাবের কানে গিয়ে পৌঁছায়—তাহলেই সর্বনাশ। নবাবের অনুমতি ছাড়া যেখানে একটা ইঁট গাঁথা বারণ সেখানে ঘর নয়, বাড়ি নয়, একেবারে একটা কেল্লা।

চার্লস আয়ার ভয়ে ভয়ে নিজের বুকের ঢিপঢিপানি নিজেই শুনতে শুনতে চোখ-কান বুজিয়ে কেল্লার কাজটা সেরে নিচ্ছিলেন। এমন সময় এল এক মহাসুযোগ। যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি। ইংরেজরা বড় হবে—ইতিহাস তার দিকে। তাই রাজ্যে যে কোন ঘটনা-দুর্ঘটনা, যাই ঘটুক ইংরেজদের কাছে সেইটেই হয়ে দাঁড়ায় সুবর্ণ সুযোগ।

শোভাসিংহ চেতোয়ার জমিদার। প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্যক্তি। থেকে থেকে আজ এর কাল ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেন।

ওদিকে উড়িষ্যায় আফগান দলপতি ছিলেন নাককাটা রহিম খাঁ। শোভা সিংহ তাঁকে দলে টেনে নিয়ে মেতে উঠলেন বর্ধমান-রাজকে আক্রমণ করতে। বর্ধমান-রাজ রাজা কৃষ্ণরাম রায় তখন সারা পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে ধনশালী। ঐশ্বর্যের স্বর্গে তিনি সিংহাসন পেতে বসেছেন। কিন্তু তলোয়ারের জোরে শোভাসিংহের কাছে তিনি পারলেন না। শত্রুর দুর্ধর্ষ আক্রমণে তিনি মারা পড়লেন। যুবরাজ জগৎ রায় ঢাকায় পালিয়ে বাঁচল।

শোভাসিংহ বর্ধমান জয় করে নিজেই নিজের ঢাক-ঢোল পেটাতে লাগলেন। আমি রাজা। আমি রাজা।

আর ওদিকে রাজ-সেনারা এদিক ওদিক যখন যে দিকে পারল দু-হাতে লুঠ-পাট জুড়ে দিলে। এগোতে এগোতে হুগলীর দরজায় এসে পৌঁছল সেই লুঠপাট বাহিনী। ইংরেজদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে আমসী হবার যোগাড়।

ইব্রাহিম খাঁ বৃদ্ধ। সত্তর বছর বয়স। মাথার চুল বেল ফুলের চেয়ে সাদা। দিনরাত ফার্সী পুঁথি পড়েন। সাদীর গুলিস্থান আওড়ান। এমন সময় ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী—এই তিন বিদেশী বণিক একটা সম্মিলিত যুক্ত ফ্রন্ট তৈরি করে করজোড়ে গিয়ে নবাবের দরবারে দাঁড়াল।

হুজুর, ধর্মাবতার, খোদাবন্দ, বিদ্রোহীদের উৎপাতে আমাদের ব্যবসা যায় যায়।

আমাদের এমন কোন শক্তি নেই যা দিয়ে কেউ আক্রমণ করলে আত্মরক্ষা করি। বঙ্গেশ্বর, অনুমতি করুন, আমরা যাতে নিজের নিজের এলাকা-এক্তিয়ারের মধ্যে কেল্লা বানাতে পারি।

নবাবের মন তখন সাদীর গুলিস্তানের রসে মাতাল। কোনরকমে একবার মুখটা তুলে শুধু বললেন—'যে যে ভাবে পারো, নিজেদের রক্ষা করো।' কেল্লার সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বললেন না।

ইংরেজরা শুনলে—নবাব মত দিলেন কেল্লা বানাতে। ঢাকা থেকে দূত ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেল্লার কাজে পুরোদমে হাত পড়ল।

কেল্লা তো হল। কিন্তু কি নাম দেওয়া যায়? তখন ইংলণ্ডের রাজা হচ্ছেন উইলিয়ম দি থার্ড। সুতরাং তাঁরই নামানুসারে কেল্লার নাম হল—ফোর্ট উইলিয়ম। অবশ্য ফোর্ট বলতে আমরা যা বুঝি—তা নয়। বা ক্লাইভের আমলে গোবিন্দপুরে যা তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গেও এর কোন মিল নেই। মাটির দেওয়াল চারপাশে। ভেতরে কতকগুলো গুদোমঘর, কাঁচা-পাকা, ইঁট আর মাটি মিলিয়ে তৈরি। তারই উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে পশ্চিমে চারটে বুরুজ। সেই বুরুজের ওপরে সিংহের মত কালো কুচকুচে চারটে থাবা উঁচানো কামান। ইতিমধ্যে শোভাসিংহ মরলেন বর্ধমান রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর হাতে। শোভা সিংহ যে রাত্রে তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্যে আলিঙ্গনের ব্যগ্র বাহু বাড়ালেন, সেই রাত্রেই এবং তখনি রাজকুমারী নিজের বস্ত্রাঞ্চলের ভেতর থেকে লুকানো ছুরি বার করে শত্রু নিধন পর্বটা চুকিয়ে ফেললেন। ওদিকে চন্দ্রকোনার রহিম খাঁর মাথা কাটা গেল আজিম ওসমানের এক আরবী সেনাপতির হাতে।

আওরঙ্গজেব ইব্রাহিম খাঁ-র অতিরিক্ত পুঁথি-প্রিয়তা দেখে এবং তাঁর রাজনৈতিক ভুল-ভ্রান্তির পরিমাণ লক্ষ্য করে তাঁকে নবাবগিরি থেকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসিয়েছেন নাতি আজিম ওসমানকে।

এই যুদ্ধ হাঙ্গামাগুলো একটু থিতোবার পর ইংরেজরা বললে—কেল্লা তো হয়েছে। এইবার কলকাতার এই জমি জায়গাগুলোকে নিজেদের হাতে আনার একটা চেষ্টা করা যাক্। দূত গেল নবাব দরবারে। খোজা সরহাদ। একজন আরমানি সওদাগর। অনেক দিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক। তিনি বাদশাহী নবাবী শাসনব্যবস্থার অনেক ঘাঁতঘোঁত জানতেন। তাই ঢাকায় পদার্পণ করার আগেই খোজা সাহেব উপহার সামগ্রী কিনে নিলেন ১৬ হাজার টাকার।

বলাই বাহুল্য, তাঁর এই মহৌষধ কাজে লাগল। ওসমান রাজী হলেন ইংরেজদের গ্রাম তিনখানা বিক্রি করতে।

সাবর্ণ চৌধুরীদের আর সেই পুরনো খানদানী অবস্থা নেই। শরিকে শরিকে ভাগাভাগি হয়ে বিষয় সম্পত্তি সব তছনছ। টাকার দরকার সকলেরই। তাই রাজী হতে খুব একটা সময় লাগল না তাদের। বিস্তর দর কষাকষির পর চৌধুরীরা তাদের জমিদারী তেরশ টাকায় ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিলেন। কলকাতার ইংরেজরা তাঁদের এই দীর্ঘদিনের মনোবাঞ্ছা পূরণের কথাটা বিলেতে ডিরেক্টরদের কাছে এই ভাবে জানালেন যে, কোম্পানীর টাকাকে আমরা কলকাতা কেনার মত আর কোন লাভজনক কাজে এ পর্যন্ত লাগাতে পারিনি।

কলকাতা আর গ্রাম নয়। আর তখনও শহর হয়নি। কোম্পানীর নির্দেশমত এটা হল একটা প্রেসিডেন্সী। এবার থেকে একজন করে প্রেসিডেন্ট থাকবেন এর সর্বময় কর্তা হিসেবে। আর তাঁর সঙ্গে থাকবে কাউন্সিল। আর এই কাউন্সিলই তামাম বাংলাদেশে যাবতীয় কুঠির নিয়ন্ত্রণকর্তা।

আয়ার সাহেব অসুস্থ হয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন। বহু অনুনয় বিনয় করে তাঁকে সেখান থেকে বাংলায় নিয়ে আসা হল। আবার তাঁকেই দেওয়া হল কলকাতার প্রথম প্রেসিডেন্টের গৌরবাধিকার।

কলকাতার প্রথম প্রেসিডেন্টের গৌরব যেমন আয়ারের, তেমনি বাংলায় ইংরেজ কুঠির প্রথম গভর্নর হবার গৌরব উইলিয়াম হেজেসের। ইংরেজ রাজত্বের একেবারে শৈশবের দিনগুলিকে জানতে গেলে হেজেসের ডায়েরী না পড়ে উপায় নেই। তুলি দিয়ে ছবির পর ছবি সাজিয়ে গেছেন তিনি। সেই হেজেসের সঙ্গে চার্নকের জীবন, তখনকার বাংলা কুঠির জীবনযাত্রা সব জড়িয়ে আছে গায়ে গায়ে।

ফিরে যাই ১৬৮২ সালের ২৮শে জানুআরিতে। ঠিক হয়েছে বাংলার কুঠি আর মাদ্রাজের অধীন থাকবে না। নিজস্ব গভর্নর থাকবে তার। কে গভর্নর? উইলিয়াম হেজেস। 'ডিফেন্স' জাহাজে চেপে হেজেস সাহেব ঐ তারিখে বাংলায় এসে পৌঁছলেন।

বাংলায় তখন একদল উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজদের উৎপাত চলেছে। রাজসনদ নেই। নিশান নেই। ছাড়পত্র নেই। এসব ছাড়াই কোম্পানীর কর্মচারীদের উৎকোচে

কব্জা করে, অবাধে ব্যবসা চালিয়ে লাভ করে যাচ্ছে। এদের বলা হত 'ইণ্টারলোপার্স'। বিলেতের কর্তারা এদের দারুণ উপদ্রবে শঙ্কিত। মাদ্রাজ থেকে হেজেস সাহেবকে পাঠানো হল এই আদেশ দিয়েই যে তুমি কুঠির ভেতরের শাসন শৃঙ্খলার সুবন্দোবস্ত করে এই সব 'ইণ্টারলোপার'দের একদম সমূলে লোপ করে ছাড়বে। হেজেস তা পারেননি। তার কারণ কোম্পানীর কর্মচারীদের ভেতরেই আসল রোগ।

গভর্নর হেজেসের অধীনে এক মন্ত্রীসভা। সাতজন সদস্য। জব চার্নক, জন বেয়ার্ড, জন রিচার্ড, ফ্রান্সিস ইলিশ, জোজেফ উড ও উইলিয়াম জনসন। যে কোন কারণেই হোক কনিষ্ঠ জনসনের ওপরে হেজেসের দারুণ অনুরাগ। আর জ্যেষ্ঠ চার্নকের ওপরে হাড়ে হাড়ে চটা। জনসন হেজেসের গুপ্তচর। কে কোথায় কোন ষড়যন্ত্রের কি কোন অপবাধের চেষ্টা করছে—খোঁজো। তখন কেঁচো খুঁজতে সাপ বেরোয়।

কোথায় ধরা পড়বে চার্নক। কিন্তু ধরা পড়ে জন বেয়ার্ড। হেজেসের বিরুদ্ধে একশ কুৎসা গেয়ে বিলেতে চিঠি পাঠাচ্ছিল। ধরা পড়ে এলিস। চার হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে কোম্পানীর মাল সরিয়েছে। চার্নকের নামেও অভিযোগ নানা। অনন্তরাম নামে এক বদমাইশকে কর্মচারী করে তিনি কোম্পানীর ক্ষতি করেছেন। বিরক্ত, বিব্রত চার্নক একদিন খোলাখুলি প্রকাশ্য ভাবেই ঘোষণা করলেন—হেজেসের দিন ফুরিয়েছে।

মুখের কথা না গলার ফাঁস। সত্যি সত্যিই ১৬৮৪ সালের ১৭ই জুলাই মাদ্রাজ থেকে হো সাহেব তাঁর পদচ্যুতির খবর নিয়ে এলেন। 'পুনর্মূষিকভবঃ' হয়ে বাংলার কুঠির শাসনভার আবার চলে গেল মাদ্রাজের হাতে।

মাদ্রাজের হাতে কুঠির ভার গেল—তা যাক। কিন্তু ইংরেজদের হাতেই তো রইল। চার্নকের স্বপ্ন তো মরলো না। বহুঝুরি বটের তলায় বহুদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কেন মরলো না?

সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর ডিহি কলিকাতা—এই তিন নিয়ে যে কলকাতা, ইংরেজরা তার কর্তৃত্ব-ভার হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। এতদিনে।

॥ শিশু কলকাতার কাহিনী ॥

বনের গায়ে বন। জঙ্গলের ঘাড়ে জঙ্গল। পচা পাতার গন্ধ। আর বুনো পাখীর কলকলানি। দিনে শুয়োরের হানা। ঝোপে ঝাড়ে সাপ-খোপের শিস-টানা। রাতে বাঘের গর্জন। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বাঁচা।

এদিকে ওদিকে শুধু ধান ক্ষেত। ক্ষেতের গায়ে খড়ির বন আর হোগলার ঝাড়। বন পেরুলে এঁদো ডোবা ডোবা ছাড়িয়ে মস্ত মস্ত খানা-খন্দ। তাতে যত জল, তত বিষ।

একটু বনের পথ ধরে হাঁটলে মরা-মানুষের হাড় পায়ে ঠেকে। একটু বেশী রাতে বাড়ি ফিরতে গেলে ডাকাতের হাতে প্রাণ যায়। রাত আরও গভীর হলে নরবলি দেওয়ার উন্মত্ত চিৎকার ওঠে দূরের কোন এক মন্দিরে।

ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর আর বনে বাদাড়ে ঠাঙ্গাড়ে-খুনে-ডাকাতের ঘাঁটি —এই ছিল সেদিনের কলকাতা। বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না।

কিন্তু ইতিহাস-রমণী বড়ই রহস্যময়ী।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, একজন ইংরেজ লেখক, অ্যাটকিনসনের কবিতা।

"হে কলিকাতে! তোমার অবস্থা তখন কি ছিল? তোমাকে তখন উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অতি কষ্টেস্ষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইত; তখন তোমার অঙ্গ নিবিড় জঙ্গলে ও অনিষ্টকর জলায় সমাচ্ছন্ন ছিল; তাহাতে অনেক সাহসী উচ্চাভিলাষী লোককেও প্রাণ দিতে হইয়াছে; চতুর্দিকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসমূহ আলোকরুদ্ধ করিয়া ইউপাস তরুর ন্যায় বিষাক্ত বাষ্প উদগীর্ণ করিত; দিনমান প্রগাঢ় উত্তাপে জ্বলিতে থাকিত এবং তমসাচ্ছন্ন রজনী অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও জ্বরসঙ্কুল শয্যা আনয়ন করিত; সায়ংকালে যে সকল পর্যটক সজীব ছিল, প্রভাতে তাহারা জীবনশূন্য হইত।"

আজ নিওন আলোর ঘাগরা ঘুরিয়ে যে চৌরঙ্গী রোজ রাত্রে আমাদের মনকে ঘরছাড়া করে তোলে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয় তার কুট-কটাক্ষে, মেট্রো সিনেমার তলায় এয়ারকণ্ডিশন করা আধো আঁচর বিছিয়ে ডাকে—এসো, এসো—আর একদিন সেই চৌরঙ্গী দিয়ে মানুষ হাঁটতে ভয় পেতো, পালকি বেহারাদের ডবল ভাড়া দিয়েও পাওয়া যেতো না এইটুকু পথ পার করে দিতে। দিনের বেলায় সূর্যের আলোর মুখ দেখা যায় না চৌরঙ্গীর জঙ্গলের ভেতরে। আর রাতের আলোয় সে জঙ্গল মুখর হয়ে ওঠে মানুষ-মারা খুনে-ডাকাতের দাপা-দাপিতে।

সহায় সম্পদ, জ্ঞাতি গোষ্ঠী হারানো একদল ফিরিঙ্গীই এই ডাকাতি ব্যবসাটা চালাতো। তাদের সঙ্গে গোলেমালে মিশে থাকতো আরও কিছু ইওরোপীয় নাবিক। সেকালের ইওরোপবাসী ও ইংরেজদেরকে সাধারণ লোকে বলতো ইঙ্গ-রাজ। আর এই সব চোর ইঙ্গ-রাজদের খুন-জখম রাহাজানির রাজত্ব বলেই, লোকের মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে গোবিন্দপুর অঞ্চলের ঐ জঙ্গলটার নাম 'চৌরঙ্গী'ই চালু হয়ে গেল।

অন্যেরা বলেন—তা নয়। ঐ ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে চৌরঙ্গী গিরি নামে একজন সাধু আশ্রম করে বসবাস করতেন। ধূপ ধুনো জ্বেলে, বুনো কাঠের হোম জ্বালিয়ে বহু বছর ধরে তিনি ঐ জঙ্গলে বসে ভজন-পূজন করেছেন। চৌরঙ্গী নামটা এসেছে সেই চৌরঙ্গী গিরির নাম থেকেই।

১৯৫৬ সালের আমরা আজ সেদিনের ইতিহাসকে সহজ ভাবে মেনে নিতে কি মনে নিতে পারবো না হয়তো। চোখে ফুটবে বিস্ময়। মনে অবিশ্বাস। কখনো মনে হবে এ বুঝি রূপকথা। নয়তো এ কোন রোমাঞ্চ-সিরিজের

রহস্য কাহিনী।

আর যদি কেউ সেই পুরনো কলকাতার রহস্যময় হাতছানিতে ভুলে শহরের পথে পথে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, অলি-গলি, ইঁট পাথর হাতড়ে মরে, তবু কি খুঁজে পাবে কোনদিন ওয়েলেসলি প্লেসের সেই ঝাঁকড়া-মাথা বিরাট বহুঝুরি বটগাছটাকে,—যার ডালে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হত? খুঁজে পাবে কি চিৎপুরের ধুলোয় সতীদাহের চিতার একটুকরো স্মৃতি কি এককণা ছাই?

অথচ ১৮২৮ সাল পর্যন্ত এই চিৎপুরে সতীদাহের চিতা জ্বলেছে সহস্র শিখায়। এখন সেখানে ট্রামের ঘণ্টা, মোটরের হর্ন, রিক্সার টুং টাং—ট্রাফিকের বিচিত্র ঐকতান। আর সেদিন ছিল শুধু একটা দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ, কান্নার, চাপা গোঙানির, অস্পষ্ট আর্তনাদের আওয়াজ হাওয়ায় হাওয়ায়। সিমলা স্ট্রীটে যেতে হলে আজ আমাদের জামা কাপড় খুলে যেতে হয় না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী শুরু হবার ক-বছর পর পর্যন্তও বাঘের ডাক আর ডাকাতের লাঠির দাপটে সমস্ত অঞ্চলটা কাঁপতো ভয়ে থরহরি। চাকর খানসামারা কাজ সেরে মনিবের বাড়িতে জামা কাপড় রেখে, প্রাণটাকে হাতের মুঠোয় শক্ত করে এঁটে নিয়ে তবে বেরুতো পথে। আজকের এই উদ্বাস্তু-কলরব-মুখর শিয়ালদার কাছে সেদিন, সেই ইংরেজ রাজত্বের শৈশবে, ছিল বৈঠকখানার গলাকাটা গলি। যেখানে একবার মাথা গলালে নিমেষেই সে মাথা ধড় থেকে ছিন্ন হয়ে ধুলোয় লুটোতো। আজকের এই বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় সেই পথঘাট চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে। রূপকথা কি রহস্য কাহিনীর মত তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কেবল ইতিহাসের পাতায় পাতায়, অধ্যায়ে অধ্যায়ে। অধ্যয়নের অধীনতা পাশে বাঁধা সেই ইতিহাস।

উইয়ে কাটা, ধুলো লাগা, জীর্ণ, অস্পষ্ট—তাকে আবিষ্কার করে নিতে হবে।

পশ্চিমে ভাগিরথী। উত্তরে সুতানুটি। পুবে নোনা জলাভূমি, শিয়ালদহ ইত্যাদি। আর দক্ষিণে গোবিন্দপুর। এই হচ্ছে ডিহি কলিকাতার তৎকালীন চতুঃসীমা।

বাগবাজারের খাল থেকে বড়বাজারের টাঁকসাল পর্যন্ত সুতানুটি; কাস্টমস্ হাউস পর্যন্ত কলিকাতা, আর কলিকাতার দক্ষিণে এখনকার ভবানীপুর পর্যন্ত গোবিন্দপুর। এখন যেটাকে বলে—'হাটখোলার ঘাট'—আগে সেইটেই ছিল সুতানুটির ঘাট। আর ঘাটের গায়েই হাট।

এই তিন গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে ছিল দুটো খাল। একটা চৌরঙ্গীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কালীঘাট। আরেকটা ক্রীক রো-র ভেতর দিয়ে সোজা ধাপা। ধাপার খালের নাম ছিল সল্ট লেক।

নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই আসে নামোৎপত্তির প্রশ্ন। বংশ পরিচয়কে বাদ দিয়ে কি জীবনচরিত লেখা যায় নাকি ? এবার তাই নামের কূল-কিনারা ছেড়ে নামোৎপত্তির অকূল-নীরে পাড়ি দিতে হবে।

এককালে হুগলীর জনবহুল সাতটি গ্রাম একসঙ্গে মিলে মিশে গলা জড়াজড়ি করে বড় হতে হতে একদিন হয়ে উঠল একটা সমৃদ্ধিশালী নগর। নাম সপ্তগ্রাম। রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্ব যখন ফুরোয় ফুরোয়, তখন তাঁর আত্মীয় কুটুম্ব আপন স্বজনরা নিজেদের সঞ্চিত মণিমুক্তো সোনাদানা ধনদৌলত আর কুলদেবী সিংহবাহিনীকে বগলদাবা করে এই সাতটি গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেছিল। সাতটি সাধুকে হর্ষবর্ধন এই গ্রাম সাতটি উৎসর্গ করেছিলেন। তাই এই নাম।

"এই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গা ঘাটে পূর্বে সপ্তঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবী একস্থানে একত্র মিলন,
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সম্মিলন॥"

বিপ্রদাসের 'মনসা মঙ্গলে' চাঁদসাগর চলেছে ত্রিবেণীর ধারা আর সপ্তগ্রামের সৌন্দর্য-ঐশ্বর্যের ঘটা দেখতে দেখতে।

"অভিনব সুরপুরি, দেখি সব সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন অবিসাল, জ্যোতির্ময় কাচ কাল
রাজমুক্তা প্রবালের ধারা।"

অধিবাসীদের মধ্যে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট গেল বসবাসের বন্দোবস্ত করতে। তারপরই শুরু হল ব্যবসা-বাণিজ্যের আয়োজন। দেশ বিদেশের জাহাজ এসে ভিড়তে লাগল সাতগাঁ-র ঘাটে। আরব, পারস্য, আবিসিনীয়া থেকে। জাহাজ তৈরি হয় সাতগাঁ-এও। মক্কার জাহাজের মত। আবার চীনেদের 'জুঙ্গোর' মত। বাঙালী কবিরা বলে 'ডিঙা'।

জাহাজ যায় অনেক দূরে। চোল বন্দর, মালাবার, কাম্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, সিংহল। রপ্তানী হয় তুলো, আখ, আদা, লালমরিচ। বিদেশে যায় মেয়েদের ওড়না, ঝালর, চাদর। পুরুষদের জামা তৈরির কাপড়। কত কি নাম তাদের। মামুনা। দোগজা। চৌতার। তোপান। সোনাবাসো।

এসব ছাড়া ছিল সোনার ব্যবসা। তাই থেকেই পরবর্তীকালে সোনার ব্যবসায়ীদের নাম হয় সোনার বেনে।

রুকনউদ্দীন বারবক্শাহ তখন সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা। তাঁর স্মৃতি ব্যারাক-পুর নাম নিয়ে কলকাতার পাশে বিরাট জনপদ হয়ে গড়ে উঠেছে। এই বার-বক্শাহের আমলেই বাংলার মুসলমান শাসনকর্তারা হুগলীতে টাঁকশাল তৈরি করেছিলেন।

পর্তুগীজদের আধিপত্য তখন একটু একটু করে বাড়ছে। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলকে লুটে-পুটে অত্যাচারে ধ্বংস করে তারা ক্রমশ এগোচ্ছে।

নদীতে জলের অভাবের ফলেই এত এগোনো সত্ত্বেও পর্তুগীজদের জাহাজ হুগলীতে সরাসরি গিয়ে পৌঁছতে পারতো না। নদীর পশ্চিম পাড়ে বেতোড় নামের একটা জায়গায় নোঙর ফেলত, ঘাঁটি বসাত। তৈরি হত দরমা আর হোগলা দিয়ে আটচালা। হুগলী আর হুগলীর অভ্যন্তর থেকে দেশীয় ব্যবসায়ীরা ঐ বেতোড়ের হাটে মাল আমদানী করত। সারা বছর ধরে সেই মাল সংগ্রহ করে জাহাজ ভরাত পর্তুগীজরা। তারপর যখন নোঙর উঠতো জাহাজের, পাল উঁচু মাস্তুলের ডগায় কেশর ফোলানো সিংহের মত দাপাদাপি শুরু করে দিত যখন, পর্তুগীজরা তার আগেই আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিত সেই হাট, সাজানো দোকান পসরা। আবার ফিরে এলে আবার নতুন হাট বসানো হত।

জাহাজ চলাচলের সুবিধে হতেই বেতোড় থেকে সালকেতে এল তারা। এই সময়ে পর্তুগীজদের সঙ্গে ব্যবসার প্রয়োজনে চার ঘর শেঠ ও বশাক সপ্তগ্রামের মায়া কাটিয়ে কলকাতায় উঠে এলেন। শেঠ বসাকরা আগে সুতো কাটত, চরকা চালাত। দেখতে দেখতে তারা একদিন অবস্থার উন্নতিতে হয়ে গেল সুতোর আর কাপড়ের ব্যবসাদার। দাদন দিয়ে সুতো কাটিয়ে, সেই সুতোর কাপড় চোপড় বুনিয়ে হাটে বাজারে চালান দিত।

কাপড় অথবা বস্ত্রশিল্প সেকালের বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী। আর সুতোর কাটনা কাটা সেকালের বাংলার গৃহলক্ষ্মীদের ভাগ্য। 'দাদনি' নিয়ে কাটনা-কাটা

বাংলার খুব পুরনো প্রথা। কবিকঙ্কণে আছে—

"প্রভুর দোসর নাই উপায় কি করে
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে।
দাদনি দেয় এবে মহাজন সবে
টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে?"

তখনকার গ্রামীণ সমাজে জীবনধারণের বা জীবিকার্জনের পথ চরকার দৌলতে খুব প্রশস্ত। তখনকার গ্রামীণ ছড়ায় তাই চরকার অনেক প্রশস্তি।

"চরকা মোর ভাতার পুত্, চরকা মোর নাতি,
চরকার দৌলতে আমার দুয়োরে বাঁধা হাতী।"

শুধু ছড়া নয়, সামাজিক কথোপকথনে, উপমা ব্যবহারেও সুতো কিংবা চরকার অথবা তাঁতীর উল্লেখ চোখে পড়ে। একটি প্রাচীন বৈষ্ণব গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

"(সে হাটে) বিকায় নাকো অন্য সুতো
বিনা তাঁতী নন্দের সুত॥
সে হাটের প্রধান তাঁতী, প্রজাপতি পশুপতি
আর কত আছে তাঁতী তাদের শুধু যাতায়াত॥"

পর্তুগীজরা যত দিন না সপ্তগ্রামে গিয়ে থিতিয়ে বসলো ততদিন পর্যন্ত সুতানুটি হাটের কী জাঁকজমক। সুতার নুটি এই কথা থেকেই জায়গাটার নাম হয় সুতানুটি। সুতোর ফেটিকে চলতি কথায় বলে নুটি।

কেউ কেউ বলেন—না, তা নয়। ইংরাজ আধিপত্যের আগে কলকাতায় পর্তুগীজরা অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর ব্যবসাও করতো। আর সেই সব ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা আর্মেনীয়দের হাতে এসে সুতা ও নটীর কাজ করতো।

সেকালের ইওরোপীয়রা কেউ স্বদেশ থেকে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে আসতো না। এদেশে এসেই প্রজাপতির নির্বন্ধে বিবাহ বন্ধন ঘটতো তাদের। তাই নটীর ব্যবসা জবরদস্ত জেঁকে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি! রতন সরকার নামে একজন ধোপা এই নটীর ব্যবসার দালাল ছিল সেকালে। সে ছিল নবাগত ইওরোপীয়দের দোভাষী।

এখন যেমন 'নোট' অর্থাৎ টাকায় সব হয়, মোগল রাজত্বে মগ ফিরিঙ্গীরাও তেমন নটী দিয়ে সব অসাধ্য সাধন করতো। আর্মেনীয়রা এই নটী ব্যবসায়

সম্রাটের মনোরঞ্জন ঘটিয়ে উপাধি পেয়েছিল 'ফকর অলতোজার'। অর্থাৎ বণিকগৌরব।

আবার অন্য পক্ষ মাথা নাড়েন। এসব বাজে কথা। কলকাতার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দে জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের শ্যামরায়ের তলায় উৎসবের দিনে প্রসাদ বিতরণ হত। লুট দেওয়া হত মিঠাই মণ্ডা কি বাতাসার। আর মাথার ওপরে টাঙানো থাকতো চন্দ্রাতপ। যাকে চলতি কথায় বলে ছত্র। এই ভাবে ছত্র ও লুট একত্রে মিলে 'ছত্রলুট' কথাটা ক্রমে ক্রমে সত্রলুট এবং তার থেকে সুতানুটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। 'সুতানুটির' জন্ম বৃত্তান্ত এইটুকু।

গোবিন্দপুরের নামোৎপত্তি নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব। প্রাচীন পুঁথি-পত্রে বা কবি-কাহিনীতে এ সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাদের সম্পর্কটা অনেকটা আদায় কাঁচকলায়।

রাজা প্রতাপাদিত্যের আমলে অর্থাৎ 'বারোভাটির' বাংলায় গোবিন্দ দত্ত নামে এক রাজা গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রা সেরে ঘর-মুখো চলেছেন নৌকো চালিয়ে। হঠাৎ নদীপথেই এক রাত্রে কালী দেবী তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আদেশ করলেন —'ওরে বেটা, যে জায়গাতে এখনো চাষবাস হয়নি এমনি কোন অকর্ষণ-পুরীতে গাছ-গাছড়া, বন-বাদাড় কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করে একটা মহাগ্রাম তৈরি কর। করলে বাঁচবি। নইলে তোর অমঙ্গল। মরণ।'

গোবিন্দ দত্ত দেবীর পিঠে একটা স্কন্ধদ্বয়-যুক্ত লাঙলের চেহারা দেখতে পেয়ে-ছিলেন স্বপ্নে। ভাগিরথী নদীর তীরে একটা জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা বেছে নিয়ে সেখানকার মাটি খুঁড়ে প্রচুর অর্থ পেয়ে গেলেন তিনি। তারপর যাগ-যজ্ঞ-হোমাদি করে, কালী দেবীর পুজো দিয়ে, ধনে-ধান্যে, সন্তান-সন্ততিতে দিনে দিনে খ্যাতি-প্রতিপত্তির শিখরে উঠতে লাগলেন। আর কালক্রমে তাঁরই নাম থেকে ঐ মহাগ্রামের নাম হল গোবিন্দপুর।

স্থান এবং কাল একই। কিন্তু চরিত্র আলাদা। এই একই কাহিনীর আরেকটি সংস্করণ আছে। সেটাও বলি।

রাজা প্রতাপাদিত্যের খুড়ো রাজা বসন্ত রায় তাঁর উৎকলেশ্বর মহাদেব আর গোবিন্দজীকে যশোরে নিয়ে যাবার পথে স্বর্ণরেখার তীরে উৎকলবাসীদের হাতে নাস্তানাবুদ হন। সেই সময় টুপ্ করে তাঁর গোবিন্দজীর মূর্তির পাশ থেকে শ্রীমতীর বিগ্রহটি ঢেউ-এর ওপর পড়ে আর অমনি কোথায় তলিয়ে যায়।

বসন্ত রায়ের গোবিন্দজীর মূর্তিটিকে নিয়ে তাঁর কর্মচারী চলল কলকাতার দিকে যশোরে পৌঁছবার জন্যে। পথের মাঝখানে কর্মচারী গোবিন্দ দত্ত স্বপ্ন দেখলেন—কালীমাতা তাঁকে আদেশ করছেন—'ওরে বেটা, কালীঘাটের কাছে অমুক গাছতলার মাটিটা খুঁড়ে ত্থাখ, যা আছে সবই তোর।'

গোবিন্দ দত্ত মাটি খুঁড়ে দেখলেন শুধু টাকা আর টাকা। সাত রাজার ধন জড়ো হয়েছে বুঝি একখানে। গোনা-গুন্তি করে ফুরোনো যাবে না এত টাকা।

গোবিন্দ দত্ত আহ্লাদে আটখানা হয়ে খুব ধুমধাম করে কালীদেবীর পুজো-হোম-যাগ-যজ্ঞ করে সেইখানেই একটা গ্রামের পত্তন করলেন। গোবিন্দজীর কৃপায় এই অর্থলাভ। তাই গ্রামের নাম রাখা হল গোবিন্দপুর।

কিন্তু তর্ক-বিতর্কের এইখানেই শেষ নয়। আরও আছে।

গোবিন্দজী যে কেবল রাজা বসন্ত রায়েরই গৃহদেবতা তা নয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহদেবতা, কলকাতার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দে শেঠ-বসাকদের গৃহদেবতাও ঐ একই। ফলে তাঁদের দাবি-দাওয়াটাও বেশ জাঁকালো। একেবারে হেলাফেলায় উড়িয়ে দেবার নয়। যাঁরা ঐতিহাসিক তাঁরাই এই নাম-সমস্যার আসল-নকল বাছ-বিচার করবেন।

আমি সমাধা করি আমার গল্প বলার কাজ।

এখন আসছে কলিকাতার কথা। ডিহি কলিকাতা।

আজকের কলকাতা শহরটা আমাদের যতখানি কাছে, অতীতের কলকাতা ঠিক তেমনি অনেক দূরের। একেবারে নাগালের বাইরে। আইন-ই-আকবরী, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কবিরামের দিগ্বিজয় প্রকাশ, বিপ্রদাসের মনসা-মঙ্গল-এর উইয়ে-খাওয়া পাতার মধ্যে থেকে তাকে আবিষ্কার করে নিতে হবে।

কলিকাতা—এই নামকরণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

ভোটে-ভারী বা জোটে-ভারী একদল ঐতিহাসিকের মতামত—কালীমায়ের কোলেই কলিকাতার জন্ম। অর্থাৎ কালীক্ষেত্র কথাটা ভেঙে ভেঙেই 'কলিকাতা'-র কলেবর নিয়েছে।

একজন ডাচ পরিব্রাজক বলেন—এই জায়গাটা আগে ছিল 'গল-গথা' অর্থাৎ মাথার খুলিতে ভর্তি। চৌরঙ্গী অঞ্চল তখন দস্যুদের আড্ডাখানা। ইওরোপীয় বণিক বা ব্যবসায়ীদের 'গলাগথা' উচ্চারণ থেকেই কলিকাতার জন্ম।

আবার কেউ কেউ বলেন—না হে না, ওসব নয়। দেখছো না শহরটার চারপাশে কি রকম খাল-খন্দ। কলিকাতা জন্মেছে ঐ 'খাল কাটা'-র থেকে, বুঝলে ?

অন্যদিক থেকে অমনি তার জবাব আসে। শোনো তাহলে, হিন্দুস্থানী ভাষায় 'কালীকা-থা' অর্থাৎ কালীমাতা এখানে ছিলেন—কলিকাতা নামটা এসেছে সেইখান থেকে। এ আর বুঝতে কষ্ট কি ?

অপর পক্ষের মতামত পাল্টা আক্রমণ করে বসে সঙ্গে সঙ্গে। দেখ কালীকা-থা-টা ওসব বাজে কথা। আজকের কলকাতা নামটা আগে ছিল 'কালী-কোটা। অনেক খোলস ছাড়তে ছাড়তে এই নামটাই শেষ পর্যন্ত টিকে গেছে।' কালী কোটা। মানে কি জান তো ? কালীর মন্দির।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মতটা আবার একটু ভিন্ন গোছের। তাঁর মতে কলিকাতার আগের নামটা হচ্ছে 'কিলকিলা।' হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, খড়দহ, শিয়ালদহ এই সমস্ত গ্রাম নগর ছিল এককালে কিলকিলা নামের একটা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমে তার সরস্বতী নদী। পূবে যমুনা। আয়তনে ১৬০ মাইল।

মগধের সভাপণ্ডিত কবিরামের দিগ্বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থে—এই 'কিলকিলা' প্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

এসব গেল যুক্তি-তর্কের কথা। এ ছাড়া অনেক মজার মজার গল্প-গাছাও চালু আছে কলকাতার নামকরণ নিয়ে। তার মধ্যে একটি গল্পই খুব পরিচিত। এক ঘেসোড়েকে দেখে একজন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—'ওহে, 'what place is this'। ঘেসোড়ে তো ইংরেজির গুরুদেব। সে ভাবলে সাহেব বোধ হয় তার নধর ঘাসের আঁটিগুলো দেখে মজে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন—কবে কাটলে ? ঘেসোড়ে সেইভেবেই জবাব দিলে—'আজ্ঞে কাল কাটা।'

সাহেব বুঝলেন: তাহলে জায়গাটার নাম কালকাটা। ডাইরিতে গোটা গোটা অক্ষরে লিখে নিলেন ইংরেজি বানানটা CALCUTTA.

তবে কালী-কোটাই হোক, আর কাল-কাটাই হোক, সেকালের কলকাতায় কাল-কাটানো নরক বাসের চেয়ে খুব বেশী সুখের ছিল না। তাকে কালান্তক যমের একটা ব্রাঞ্চ আপিস বললেও চলে। জল-নিকাশের নালা নেই। জঞ্জল জমে জমে সাঁচী স্তূপের মত উঁচু হয়ে উঠেছে। পুকুরগুলোর গা ভর্তি পচা

পানায়। পড়ে আছে কাকে ঠোকরানো মরা-কুষ্ঠ রোগীর মত। আর সমস্ত সময় মাটি স্যাঁতসেঁতে। তার ওপর চোর ডাকাত, বাঘ-ভাল্লুক আর ঝোপ-ঝাপের সাপ-খোপ। এরই মাঝখানে দু-চার ঘর চাষী-ভুষি, জেলে-জোংলা। কেউ ধান বুনে, হোগলা চাষ করে, বাঁশ কিংবা ঘাস কেটে, কেউ মাছ ধরে কোনমতে বেঁচে-বর্তে থাকতো।

এতই যদি দুর্দশা তাহলে সোনার সপ্তগ্রাম ছেড়ে, হুগলীতে রাজকীয় দিনযাপনের মায়া কাটিয়ে এই ম্যালেরিয়া আর মৃত্যুর আড়তে ছুটে এলেন কেন চার্নক ? আর কি জায়গা ছিল না ?

জায়গা ছিল অনেক। তার চেয়ে অনেক বেশী কারণ ছিল চার্নকের এটা পছন্দ করার পেছনে।

আমাদের চোখে কলকাতার যা কিছু বাজে, চার্নকের দূরদৃষ্টিতে সেদিন সেইটে সবচেয়ে কাজের বলে মনে হয়েছিল। এই যে বন জঙ্গল, জলা-জমি, সল্ট লেক—এগুলোই তিনি খুঁজছিলেন। হুট্ বলতে শত্রু পক্ষ এসে অক্রমণ করবে সে রাস্তা চারদিকেই বন্ধ। জঙ্গলে একবার আটকালে 'দে-ছুট, দে-ছুট' করে পালাবে।

তারপর এই গঙ্গা। ওপারে মারাঠাদের উৎপাত। কিন্তু এপারটায় নিশ্চিন্দি। কেউ সহজে নদী ডিঙিয়ে আক্রমণ করতে আসবে না। তার ওপর এই বাঁ পাড়টাতেই জল বেশী গভীর। জাহাজ চালাবার কত সুবিধে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলবে ? কাপড়-চোপড়, গামছা-সুতো—কি চাই বলো ? সে সব-কিছুরই দোকান-দানি, হাট-বাজার এ পারে। সুতানুটির হাট। তাছাড়া শেঠ-বসাকদের পাচ্ছে পাশের গাঁয়ে।

এবার এখান থেকে উত্তরমুখো যেদিকে দু-চোখ যায় নৌকো চালাও, মফস্বল থেকে মাল কেনো, বিদেশে চালান দাও, দেখ, দু-দিনে দেখতে-না দেখতেই ব্যবসার বাঁকা চাঁদ ষোল-কলার আলোয় উপচে পড়বে।

চার্নকের সময়ে এতটা ভাবা হয়তো দিবাস্বপ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু আজকে এসবই দিনের আলোর মত পরিষ্কার বাস্তব।

চার্নকের তালুক কলকাতায় তখন বাঘ-ভালুকের বাসা যত, মানুষের বসবাস তার চেয়েও ঢের কম। শুনবার আগেই ফুরিয়ে যায় বুঝিবা। তাকালেই শুধু চোখে পড়ে বাঁশের ঝাড়, হোগলার ঝোপ, আর মোটা-সোটা বট গাছে কচি পাতার কাঁপুনি।

আর যদিই বা কোথাও থাকে ঘর-গেরস্তালি কিছু, সেও তো ঐ শুধু খড়ের চাল, মাটির দেয়াল। পাকাবাড়ি কি নেই একটাও? আছে। নাম রক্ষে করার জন্যে একটা। লাল দিঘীর পশ্চিম পাড়ে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী। এরা আবার কারা গো? কাছারী যে বললে, তাহলে কি জমিদার?

হ্যাঁ, জমিদার বটেই তো। কি করে কি হল আগা-গোড়া সে বৃত্তান্তটা তাহলে বলে নিই।

কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজের জন্মস্থান গোপাল-পুর থেকে হঠাৎ একদিন দেশছাড়া হলেন ব্রহ্মচারীর বেশে। দেশে দেশে ধর্মকথা, শাস্ত্রকথা প্রচার করা, আলোচনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। দিনে দিনে দেশে বিদেশে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সেই সময় রাজা মানসিংহ তাঁর বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদিন প্রতাপা-দিত্যের সঙ্গে একটা চরম বোঝাপড়ার জন্যে মানসিংহ বাংলায় আসছেন। কাশীতে দেখা গুরুদেবের সঙ্গে। দীর্ঘকাল সংসার ছাড়ার ফলে ব্রহ্মচারীর মন একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করেছে। ঘরে ফেরার ডাক যেন আলোয় হাওয়ায় কানে এসে বাজছে তাঁর। মনে পড়ছে সেই সদ্যজাত শিশুপুত্রের মুখ।

মানসিংহকে দেখেই ব্রহ্মচারী বললেন—দেখ, তুমি যে ভাবে পারো বাংলায় গিয়ে আমার শিশুপুত্রের কি হল একবার খোঁজ নেবে। নইলে আমার পক্ষে বাঁচা বড় কঠিন।

মানসিংহ বলিলেন—তথাস্তু।

কবিরামের 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' থেকে এই ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ-মূলক কবিতাটি এখানে একটু টেনে আনছি—

> "শিব সহোদর জীয়ো, রাখি শিশুপুত্র
> সংসার সাগর হতে উঠায় বহিত্র।
> প্রসব হইলা পুত্র, প্রসূতির কাল
> তাহাতে, দ্বিজের ঘাট বিষম জঞ্জাল।
> লুকাইয়া চলি যায় বারানসী পুর
> পরিব্রাজ ধর্ম তথা করিলা প্রচুর।
> দিনে দিনে বাড়ে শিশু প্রতিপদ চাঁদ
> পশ্চাৎ দেখিবে এটি কুল-ভাঙা ফাঁদ।

ক্রমশ দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল
পিতৃ-অনুদ্দেশ হেতু বিবাদ ঘটিল।
উপনয়ন কাল তার ছাড়াইয়া যায়
হেনকালে সমাচার শুন মহাশয়।
মানসিংহ মহারাজ, কাশীতে আছিল
জীয়োর নিকট তিঁহ উপদ্দিষ্ট হল।
রাজারে কহিল দ্বিজ, শুন বাপধন
শুনি করিতেছ তুমি বঙ্গেতে গমন।
মম পুত্রে গিয়া তুমি ঠিকানা করিবা
সেই কার্য করি বাপ মোরে বাঁচাইবা।
বঙ্গেতে আসিয়া রাজা সে কার্য করিল
প্রথমতঃ ঐ কার্য—পশ্চাৎ সকল।
পাটুলীতে হয় শূদ্রমণি জমিদার
তাহারে ডাকিয়া রাজা কহে সমাচার।
রাজাজ্ঞা মতেতে সেই ঠিকানা করিল
গুরুবাক্য ঐক্য করি ঠিকানা হইল।
তারপর রাজা, গুরু পুত্র দরশন
করিয়া হইল অতি আনন্দিত মন।
শূদ্রমণি মহাশয় কর-জোড় করি
দেখেন রাজার মনে আনন্দ লহরী।
রাজা বলে ওহে তুমি যে কার্য করিলা
তার পারিতোষ তুমি লহ এই বেলা।

* * * *

তারপরে রাজা কহে বালকের জন্য
দেখ এক জমিদারী যার কর শূন্য।
বড়িশা আদি নানা পরগণা স্থির হল
শিব-শক্তির অদূরে বড়িশায় রহিল।
যেই মত গল্প শুনি, সেই মত গাই,
সত্য মিথ্যা যাহা হউক, এই মত পাই।"

জীয়ো গাঙ্গুলী কামদেব-এরই আরেক নাম। আর তাঁর দ্বাদশ বর্ষীয় ছেলেটির

নাম লক্ষ্মীকান্ত। এই লক্ষ্মীকান্তের আমলেই বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীর জমিদারী পাট্টার পত্তন। মানসিংহ গুরুপুত্রকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ যে জায়গির আর সনদ সানন্দে দান করেছিলেন তার মধ্যে ছিল মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর—এই পুরো পাঁচটি পরগণা আর হেতেগড় পরগণার কিছুটা অংশ। উপাধি জুটল চৌধুরী।

"লক্ষ্মীর অতুলবিত্ত রায়চৌধুরী খ্যাতি
কন্যাদানে কুলনাশে কুলের দুর্গতি।"

লক্ষ্মীকান্তের পর তাঁর ছেলে গৌরহরি 'চৌধুরী'-র চৌহদ্দি ছাড়িয়ে 'মজুমদার'-এর মহল্লায় পৌঁছলেন। দমদমের কাছে বিরাটিতে তাঁর নিবাস। সঙ্গে পুত্র শ্রীমন্ত। পেশা সম্রাটের রাজকর আদায়।

১৭১২ সালে নবাব মুর্শীদকুলি খাঁ সুবে-বাংলার অন্তর্গত তাঁর নিজের দখলে আনা রাজ্যগুলোকে তেরোটা চাকলা আর অনেকগুলো পরগণায় ভাগ করে নেন। শ্রীমন্তের পুত্র কেশব মজুমদার বা কেশব রায় দক্ষিণ চাকলার রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী হন। বাদশাহ তাঁর কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে 'রায়-চৌধুরী' উপাধি দেন।

মুর্শীদকুলির আমলে ইংরেজদের হুটোপাটি বা লুটোপাটির মাত্রাটা বেশ একটু একটু বাড়ছিল। সমস্ত বাংলাদেশের গা ছমছমিয়ে ওঠে ইংরেজদের নাম শুনলে। মুর্শীদকুলি তাই তাঁর প্রত্যেক কর্মচারীকে কড়া নোটিশে জানিয়ে দিলেন যে তোমরা কেউ ইংরেজকে এক ছটাক কি এক কাচ্চাও জমি বিক্রি করবে না।

কেশব রায় দেখলেন—এই যদি রাজ্যের হালচাল হয় তাহলে তো জমিদারী রাখা দায়। তাই তাড়াতাড়ি বিরাটির বাসা উঠিয়ে বড়িশায় এসে নতুন সংসার পাতলেন। জমিদারীর মাঝখানে না থাকলে—ইংরেজের থাবা কখন কোন্ দিক থেকে থাবলা মারবে—চোখে পড়বে না।

কেশব রায় থেকেই রায়-চৌধুরী হল বংশের নাম। গোত্রের নাম সাবর্ণ। তাই থেকেই সাবর্ণ চৌধুরী। চার্নকের আমলে এই বংশের বিদ্যাধর রায় চৌধুরী জীবিত। তখন তাঁদের জমিদারী উত্তরে দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণে বাহুলা। এখন যাকে বলি বেহালা। কালীঘাটের মন্দির তাঁদেরই প্রতিষ্ঠা করা। নিজেদের পুজোরী-গিরি করতে তাদের মানে বাধতো। তাই মাইনে করা বামুন ছিল হালদারেরা।

"কালীঘাট কালী হল চৌধুরী সম্পত্তি
হালদার পূজক তাঁর এই তো বৃত্তি।"

সাবর্ণ চৌধুরীদের কুলদেবতা শ্যামরায়। ঐ পাকা কাছারী বাড়িব সামনেই কুলদেবতার মন্দির। শ্যাম রায় বারো মাস থাকেন কালীঘাটে। দোল এলেই চতুর্দোলায় চেপে চলে আসেন মন্দিরে। আবীর, কুমকুম্, বাজনা বাদ্যি, হাট-বাজার, মেলা বসিয়ে উৎসব জেঁকে ওঠে তখন।

রায়-চৌধুরীদের কাছারী বাড়ির সীমানার মধ্যেই একটা পুকুর। দোলের দিনে রঙের খেলায় সেই পুকুরের জলও খুশিতে খিল খিল করে হেসে উঠতো। সারা শরীরে ঢেউ খেলে যেতো আবীর-মাখা অনুরাগ। লোকে তাই ভালো বেসে নামটা পাল্টে দিল তার। পুকুর নয় আর দিঘী। লাল দিঘী।

এর আবার ভিন্ন মতও আছে। ইংরেজরা তখন সবেমাত্র ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ গড়েছে। লাল টকটকে পাকা ইঁটের দেয়াল। তারই ছায়া পড়তো ঐ পুকুরে। পুকুর তো নয়। যেন স্বচ্ছ কাচের মুকুর। তাই তাতে তো আর ছায়া পড়ছে না। অন্য এক মায়া ফুটে বেরুচ্ছে যেন। লোকে অবাক হয়ে দেখতে আসতো রোজ এই অপূর্ব দৃশ্য। সেই সময় থেকেই লোকের মুখে মুখে তার আগুন মাখা রঙের গুণগাথা ছড়াতে ছড়াতে কাছারী বাড়িব পুকুর হয়ে উঠল সকলের আদরের লাল দীঘি।

চৌধুরী বাড়ির কাছারীতে তখন খাতা সাবা নায়েব ছিল একজন ফিরিঙ্গী। অ্যাণ্টনি সাহেব। কবিওলা অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গীর ঠাকুর্দা। কলকাতার রাস্তায় এখনো তাঁর স্মৃতি বেঁচে আছে। অ্যাণ্টনি বাগান লেন নামের গলিটায় কোন দিন মাথা গলালে চোখে পড়বে।

আর কাছারী বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল যাঁর ওপর মানে ম্যানেজার ছিলেন যিনি, তাঁর নাম রুক্মিণীকান্ত। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের প্রপিতামহ। নবাবের কাছ থেকে তাঁরা উপাধি পেয়েছিলেন "ব্যবহার্তা"।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম বা একেবারে আদি যুগে এই কাছারী বাড়িই ছিল কোম্পানীর সেরেস্তা। তখন বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। পরে গোটা বাড়িটাকেই কিনে ফেলা হয়।

কোম্পানীর লোকজনের অর্থাৎ কর্মচারীদের তখন কি দুর্দশার দিনই না গেছে! একে চারপাশে বন জঙ্গল। তার ওপর মাথা বাঁচাবার মত একটুও ঠাঁই নেই। মাটির একটা দোচালা ঘর তখন তাদের কাছে বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের

চেয়ে বেশী আদরের, আকর্ষণের। কারো আবার রোদে জলে দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত কাটে গঙ্গার ওপরেই জাহাজের পাটাতনে। তাঁবু খাটিয়ে যারা থাকতো—দু-দিন যেতে না যেতেই জ্বরে কাবু হতে হত।
আগে যে পাকা বাড়ির কথা বলা হয়েছে—তাতে শুধু চৌধুরীদের কাছারী বাড়ির নাম করা হয়েছে। এ ছাড়া আরেকটা ছিল। সেটা বাড়ি নয়। গৃহ। পর্তুগীজদের প্রার্থনা গৃহ। এই প্রার্থনা গৃহের নাম সেণ্ট জন গির্জা। তারই পাশে গোরস্থান। হুগলী বা বালেশ্বর যাওয়ার পথে যে সব ইংরেজ অকালে কিংবা আকালে মারা যেতো—তাদের সমাধিস্থ করা হত এইখানে। চার্নক, হ্যামিলটনের নশ্বর দেহ আজও এর মাটির তলায় ধুলো বিছানো বিছানায় ঘুমিয়ে আছে।
চার্নকের সময়ে কলকাতার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দে শেঠ আর বসাক। কুড়ুল দিয়ে গাছ, কোদাল দিয়ে মাটি আর কাটারী দিয়ে হোগলা বন কেটে তাঁরা জায়গা বানিয়েছিলেন বসবাসের। তাই তাঁদের বলা হত 'জঙ্গল কাটা বাসিন্দে'। সুতো বেচা তাঁদের ব্যবসা। বরানগরের তাঁতীদের দাদন দিয়ে সুতো কাটিয়ে তাঁরা এই ব্যবসা চালাতেন বলে তাদের জনসমাজে পরিচয় ছিল 'দাদনি বণিক'। মুকুন্দরাম শেঠ, কালিদাস বসাক, বাসুদেব বসাক ইত্যাদিরা এই দুটি বংশের প্রাণ-পুরুষ।
'হরি ঘোষের গোয়াল' এই কথাটি ব্যঙ্গচ্ছলে আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি। এই আজো না-ভোলা প্রবাদটির মধ্যে যে ব্যক্তির দানশীলতা আর আত্মীয় পোষণের ঘোষণা জড়িয়ে আছে সেই হরি ঘোষের পূর্বপুরুষ ছিলেন মনোহর ঘোষ। তিনিও চার্নকের আমলের বাসিন্দে। মনোহর ঘোষেরা কনোজের কায়স্থ। তিনি নিজে ছিলেন রাজা টোডরমল্লের গোমস্তা। তাঁর আস্তানা ছিল চিত্রপুরে। যেটা আজকের চিৎপুর। চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী আর সর্বমঙ্গলার মূর্তি ও মন্দির এঁরই তৈরি। সেকালের লোকে চিৎপুরের রাস্তাকে 'তীর্থযাত্রীর পথ' বলতো।
আরেক পুরুষের কথা না বললে এ প্রসঙ্গ পুরো হয় না। সেটা দত্ত বংশের কথা। নিমতলার বিরাট শিবমন্দির মদন দত্তের তৈরি। কালীপ্রসাদ দত্ত ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণের প্রতিবেশী। তাঁর পুত্র চূড়ামণি দত্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। অতুল ঐশ্বর্য এবং খাঁটি হিঁদুয়ানীর প্রতি প্রবল পক্ষপাতিত্বের ফলে সেকালে এঁদের মনে যে আত্মাভিমান দেখা দিয়েছিল আজও লৌকিক প্রবাদে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এঁরা হাটখোলায় আসার আগে বালিতে থাকতেন। তাই বলা হত—

"অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি।"

এ ছাড়া বিশ্ববিখ্যাত ঠাকুর বংশের প্রথম পুরুষ—পঞ্চানন ঠাকুরও ঐ সময়ে কলকাতায় বসবাস করতেন।

আজ যে চিৎপুর জনস্রোত আর যন্ত্রযানের তরঙ্গে উদ্বেল, চার্নকের সময়ে তারই গা বেয়ে বয়ে যেত কলনাদিনী ভাগিরথীর জলস্রোত।

ভাগিরথীর কূলে কূলে এর পর কলকাতা ক্রমশ জেগে উঠতে থাকল। সে আর স্বপ্ন হয়। দূরাকাঙ্ক্ষা নয়। বাস্তব। দিবালোকের মত প্রত্যক্ষ আর উজ্জ্বল।
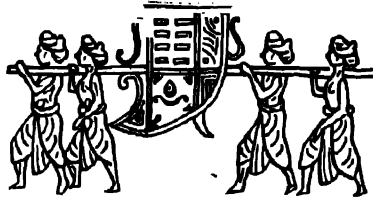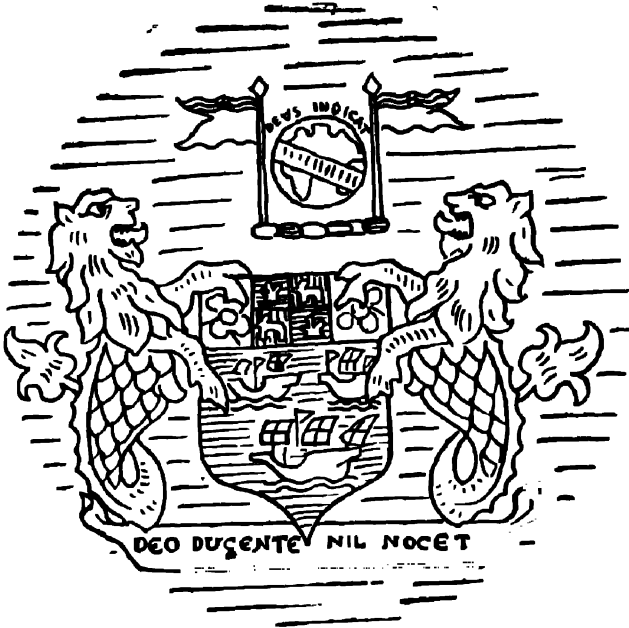
॥ কলকাতার বাল্যলীলা ॥

১৭০০ সালের শুরু থেকেই কলকাতা নিজের পায়ে ভর দিয়ে একটু একটু করে দাঁড়াতে শিখল। শুরু হল তার বাল্যলীলা পর্ব।

১৭০০ সালের ২৭শে মার্চ পর্যন্ত বিলেতের ডিরেক্টারদের কাছে যে সমস্ত চিঠিপত্র গেছে তাতে 'সুতানুটি'রই উল্লেখ করা হয়েছে বারবার। তারপর থেকে কলিকাতা আর ফোর্ট উইলিয়ম এই নামই ব্যবহার করা হয়েছে।

ইংরেজদের 'কলিকাতা' নামটার ওপর ক্রমশই আগ্রহ বাড়ে। তার একটা বড় কারণ ছিল। পর্তুগীজরা কালিকটেই প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ইওরোপে 'কালিকটে'র মালের খুব সুনাম ও চাহিদা ছিল। ইংরেজরা সেই সুনাম ও চাহিদাকে কাজে লাগবার জন্যেই 'কলিকাতা'র দিকে ঝুঁকল। দুটো নামের মধ্যে একটা বেশ সাদৃশ্য রয়েছে যেহেতু।

এসব অনেক পরের কথা। গোড়ার কথায় ফিরে যাই।

চার্লস আয়ার বিলেতে চলে গেছেন কাজে ইস্তফা দিয়ে। তাঁর বদলে এসেছেন নতুন প্রেসিডেন্ট। জন বিয়ার্ড। তিনি আবাল্য বাংলাদেশে মানুষ।

আর ওদিকে বাংলার সিংহাসনে তখনও নবাব আজিম ওসমান। আর দেওয়ান হচ্ছেন মুর্শিদকুলী খাঁ। দেওয়ান হলেও তাঁর ক্ষমতার দৌড় নবাবের সিংহাসন ডিঙিয়ে আরও লম্বা।

ইংরেজ কোম্পানীর বাল্যলীলা শুরু হল বটে, কিন্তু চলবার আগে তাকে বহুবার আছাড় খেতে হয়েছে, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে।

১৭০০ সালেই আরেক নতুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে এসে হাজির। হাতে ইংলণ্ডেশ্বর উইলিয়ম দি থার্ডের দেওয়া সনদ। পয়লা নম্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তো তা দেখে শুনে চোখ কপালে উঠল। এদিকে সম্রাট আওরঙ্গজেবও পড়লেন মহা ধাঁধায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বলতে দু-দুটো। এখন মাশুল আদায় করবো কার কাছ থেকে? এ ওকে দেখাবে। ও দেখাবে একে। একটা কথাবার্তা কইবার দরকার হলেই বা ডাকবো কোন্ দলের কাকে? সম্রাটের এমন ধারণা করাটাও অমূলক নয়। সুরাটের কাছে হজযাত্রীদের ওপর ইংরেজরা হামলা চালাচ্ছে। কাউকে ধরতে গেলে এ বলে—আমরা নয়। ও বলে—আমরা নয়।

আওরঙ্গজেব শেষ পর্যন্ত যখন কোন মীমাংসাতেই আসতে পারলেন না—তখন ঢালাও হুকুম দিলেন যেখানে যত ইংবেজ দেখবে—সবাইকে এনে পোরো কারাগারে। তাদের মালপত্র যেখানে যা কিছু আছে আটক করো সব। আজ থেকে ভারতবর্ষে সমস্ত ইওরোপীয় বণিকেরই ব্যবসা বন্ধ। একূল ওকূল, অর্থাৎ মালপত্র আর বাণিজ্যের অধিকার দুইই হারিয়ে দুই কোম্পানীই চোখে সর্ষে ফুলের বাগান দেখতে লাগলো। পয়লা নম্বরের চেয়ে দোসরা নম্বর কোম্পানীরই ক্ষতি হল বেশী সুদে আসলে। শেষে দুটো কোম্পানীই এক হওয়ার একটা প্রস্তাব নিলে। কিন্তু তাতেও সম্রাটের মন ভেজে না। ভাবলেন—এরা টাকা অর্থাৎ মাশুল ফাঁকি দেবার জন্যে একটা চাল চালছে বুঝি।

অনেক তদ্‌বির-তদারকের পর আবার বাণিজ্যের ওপর থেকে পরোয়ানাটা তুলে নিলেন তিনি। শত অপরাধের সাতখুন মাপ হয়ে গেল। কিন্তু হলে হবে কি—আরেক নতুন মুশ্‌কিল বাধলো ঢাকার নতুন দেওয়ান মুর্শিদকুলীকে নিয়ে। দিনরাত তাঁর খাই খাই রব। শুধু টাকা, টাকা আর টাকা। এই সেদিন ৩০ হাজার টাকা দিয়ে বাণিজ্যের সনদ আদায় করেছে। এখনও তাঁর লোলুপ দৃষ্টি ইংরেজদের ওপর।

দেশের লোকের ওপর তো খাজনার পর খাজনা বেড়েই চলেছে। জায়গির-দারদের খুশিমত জায়গির কাড়ছেন, ওঁচা জায়গায় নতুন জায়গির দিচ্ছেন। আর নিত্য নতুন আবওয়াব অর্থাৎ অতিরিক্ত করের উপদ্রব। তার ওপর আবওয়াব আদায়ের জন্যে তম্বি-তাগাদার অন্ত নেই। মুর্শিদকুলী খাঁ জমিদারদের ঘাড় ভাঙছেন। জমিদাররা গিয়ে ঘাড়ে-গর্দানে মারছে গাঁয়ের গরীব চাষা-ভুষো, প্রজা-পাঠকদের। শুধু টাকা, টাকা আর টাকা।

আবার যদিবা কোনমতে দেওয়ানের পেট ভরানো গেল তো তখন নবাব-জাদা মুখ হাঁ করলেন। আজ এত চাই। কাল তত চাই। বয়স বাড়ছে নবাবের। ভবিষ্যতের জন্যে কিছু গচ্ছিত রাখতে হবে তো!

নবাব আর দেওয়ানের দাপটে পড়ে ইংরেজ কোম্পানীর অতিষ্ঠ অবস্থা।

এসব ১৭০৬ সালের ঘটনা।

১৭০৭ সালের একেবারে শুরুতেই এল আকস্মিক দুঃসংবাদ। সম্রাট আওরঙ্গজেব, শাহানশা মহীউদ্দীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব বাদশা আলমগীর দেহ-ত্যাগ করেছেন। ভারতবর্ষ জুড়ে একটা চঞ্চলতা। রাজ্যে রাজ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি। আকাশে বাতাসে যেন কী এক দারুণ অঘটনের আনচান।

ইংরেজরা দেখলে শিয়রে মরণ। এবার সিংহাসন নিয়ে লাগবে মহারণ। সেই সুযোগে বিদেশীদের কাঁচা পয়সা পেয়ে সবাই চালাবে লুঠপাট। অবাধ অত্যাচার। চারপাশে হুকুম গেল—যে যেখানে আছ, এখুনি, সংবাদ পাওয়া মাত্রই মালপত্র, হিসেব-নিকেশ গুছিয়ে কলকাতায় চলে এস।

আর এই ডামাডোলের সুযোগে ফোর্ট উইলিয়মটাকে বেশ মজবুত করে মেরামত করা চলল।

আওরঙ্গজেবের পর দিল্লীর মসনদে বসেছেন শাহ আলম। ১৭১২ সালে তিনিও মারা গেলেন। এর পর এলেন ফারুকশিয়র। আজিম ওসমানের ছেলে।

১৭১৫ সালের এপ্রিল মাস। বাদশার কাছে নজরানা যাবে। তার জন্যে নৌকো বোঝাই হচ্ছে সারে সারে উপহার সামগ্রীতে। প্রায় তিন লাখ টাকার মত দাম হবে মালগুলোর। উপহার ছাড়াও আছে নগদ টাকা। ঘুষের জন্যে নয়। ওটি ওপরওয়ালাদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলী হিসেবে অর্পণ করা হবে। তবে যদি কোথাও মাথা গলাবার সুযোগ ঘটে। দূত হিসেবে চলেছেন কাউন্সিলের সভ্য, জন সুরম্যান। সঙ্গে খোজা সরহাদ নামে একজন সওদাগর। তিনিই আজিম ওসমানের কাছ থেকে ইংরেজদের

তিনটে পরগণা প্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধে আদায়-উসুল করে দিয়েছিলেন।

এই সঙ্গে আরেকজন যিনি আছেন, তিনি দূতও নন, তল্পিদারও নন। তিনি ভূত ছাড়ানো ওঝা। ওঝা বললে সত্যি কথাটা বোঝা কঠিন হবে। তিনি ডাক্তার। হ্যামিলটন। ২৪ টাকা তাঁর মাস মাইনে। কলকাতার ইংরেজ কোম্পানীর সহকারী ডাক্তার।

নৌকো ছাড়ল কলকাতার ঘাট থেকে। সেখান থেকে পাটনা। এইটুকুই যা জলপথ। পাটনা থেকে বাকী পথটা স্থলপথে যাত্রা শুরু হল।

বাদশাহ ফারুকশিয়রের কাছে খবর এসে গেছে ইতিমধ্যে যে, ইংরেজরা ১০ লক্ষ টাকার উপহার নিয়ে দিল্লীর দরবারে আসছে। তার মধ্যে শুধু তিন লক্ষ টাকার আছে কাচের বাসন, কিংখাপ, জরীদার মসলিন, রেশ্‌মী পোশাক পরিচ্ছদ, মখমল, ঘড়ি, পিস্তল, খেলনা, চিনেমাটি-তামা-দস্তার পাত্র আর নানাবিধ তৈজসপত্রাদি।

খবর শুনে ফারুকশিয়র ফেটে পড়লেন আনন্দে। কাছাকাছি প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের কাছে আদেশপত্র গেল—ইংরেজদের আসার পথে রক্ষী পাঠাও। নইলে রক্ষে নেই।

তিন মাস পথশ্রমের পর জুলাই মাসে ইংরেজরা সম্রাটের সিংহাসনের সামনে এসে শ্রদ্ধাবনত সম্মান জানালে।

ওদিকে মুর্শীদকুলী খাঁ অপমানে ফুলছেন। থামো ব্যাটা ইংরেজ, তোমাদের ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া শেখাচ্ছি।

তিনি উজীর আবদুল্লা খাঁকে পেছনে লাগালেন এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা পণ্ড করার পরামর্শ যুগিয়ে। উজীর আবদুল্লা খাঁ-র সাহায্যেই বাদশা পেয়েছেন সিংহাসন। সুতরাং তাঁর কথাগুলোকে কানে তুলবেনই, উড়িয়ে দিতে পারবেন না।

কিন্তু এতে বিশেষ কিছু সুবিধে হল না। কোন দিক থেকেই নয়। না পারলেন উজীর আবদুল্লা খাঁ সম্রাটের মনে ইংরেজ বিদ্বেষ জাগাতে। না পারলে ইংরেজরা লক্ষ টাকার মুদ্রাঞ্জলী দিয়ে তাঁকে তপে তুষ্ট করতে। তিনি উপহার নেন। অর্থও গ্রহণ করেন। সবই ঠিক। কিন্তু ইংরেজরা এমন সুযোগ পায় না যে তাঁকে তাদের মনোবাঞ্ছা জানায়। আজ শিকার। কাল তীর্থযাত্রা, তারপর শরীর খারাপ, মন ভালো নয়—এসব তো সাত দিনে সতেরো ব্যাধি লেগেই আছে। তাহলে হবে কি। এতগুলো টাকা জলে চলে যাবে মিথ্যে মিথ্যে।

তা কি কখনো যায়। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ।

বেশী দিন নয়। কিছু দিনের মধ্যেই এল দৈবযোগ।

রাজা অজিত সিংহের মেয়ের সঙ্গে সম্রাটের বিবাহের পাকাপাকি। বিয়ের দিন যথা-বিহিত আড়ম্বরে রাজকুমারী রাজধানী পৌঁছে গেছেন। এমন সময়ে সম্রাটের হল কঠিন দুরারোগ্য পীড়া। প্রাণ যায় যায়। সর্বনাশ। ডাক্তার ডাকো। ডাক্তার যে ডাকবে ডাক্তার কোথায়? কে একজন বাতলালে— কেন, ইংরাজদের সঙ্গে একজন ডাক্তার এসেছে। তাকে ডাকলে হয় না। হয় বৈকি। তবে দেরি কেন? ডাকো এখনি।

এলেন হ্যামিলটন। রাজবদ্যি হাকিম কবরেজরা যা করতে গিয়ে হিমশিম, ঘেমে অস্থির, হ্যামিলটন সাহেব কি সব এটা ওটা অস্ত্রশস্ত্র চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেমালুম সুস্থ, সুস্থির করে তুললেন সম্রাটকে।

প্রাণ ফিরে পাবার আনন্দে সম্রাটজাদা তখন ডাক্তারকে উপহারে উপঢৌকনে ঢেকে ফেললেন। এই হীরের আংটি। এই শিরোপা। এই ঢাল তরোয়াল। এমনি নানান কিছু। এর পরেও জিজ্ঞেস করলেন—পারিশ্রমিক হিসেবে আপনি কী চান বলুন। আমি তাই দেব।

যে ব্রাউটন সেই হ্যামিলটন। এক দেশের মানুষ। একই ক্ষমতা-তৃষ্ণা তাঁদের সাগর পারে ছুটিয়ে এনেছে। হ্যামিলটন বললেন—ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকারের স্বাধীনতা আর ফরমান। সম্রাট খুশি মনেই বললেন—কটা দিন রোসো। বিয়ের হাঙ্গামা চুকলে সব হবে।

১৭১৬ সালের জানুআরি মাসে আবেদন পত্র দাখিল হল সম্রাটের কাছে। তাতে ৪টি প্রার্থনা। ১। কলকাতার কুঠির অধ্যক্ষের সই করা ছাড় বা দস্তক দেখালে কোন সরকারী কর্মচারী কোন অজুহাতেই কোম্পানীর মাল-পত্র আটকাতে পারবে না। ২। মুর্শিদাবাদ টাঁকসালের কর্মচারীগণ প্রয়োজন হলে সপ্তাহে তিন দিন কোম্পানীর মুদ্রা প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা করবেন। ৩। ইংরেজ কোম্পানীর কাছে ঋণগ্রস্ত এমন লোক, দেশী বা বিদেশী যাই হোক, কোম্পানীর প্রয়োজনে তাকে কোম্পানীর হাতে দিতে হবে। ৪। সুলতান আজিম ওসমান আগে যেমন ইংরেজদের কলকাতা ইত্যাদি জায়গার জমিদারী কিনতে অনুমতি দিয়েছিলেন—এখন ঠিক সেই ভাবেই কলকাতার চারপাশের আটত্রিশখানি গ্রামের জমিদারী কেনার অনুমতি ইংরেজ কোম্পানীকে দিতে হবে।

১৭১৭ সালের জুন মাসে ইংরেজদের দীর্ঘ দু-বছরের মেহনতের ঘাম মুক্তোর বিন্দুতে ফুটে উঠল। মুখে, মনে আনন্দ। পকেটে সনদ। সুরম্যান সাহেব দিল্লী ছেড়ে আবার কলকাতায় পাড়ি দিলেন।

হল বটে সবই। কিন্তু আবার কিছুই হল না বলা চলে। কেননা এত সাত কাণ্ড ঘটে গেলে হবে কি—মুর্শিদকুলী খাঁর সেই পুরনো গোঁ। তিনি সম্রাটজাদার অধীনতা বা আজ্ঞা মানেন বটে কিন্তু সম্রাটের সিংহাসন বা শক্তির কাঠামো যে কত ঠুনকো আর ফাঁপা, সেটা তাঁর যথেষ্টই জানা আছে। তিনি সম্রাটের ফরমানের অনেক কিছুই আমল দিলেন। যেমন টাকা তৈরির ব্যাপারটা। টাকার ব্যাপারে ইংরেজদের তখন খুব অসুবিধে। বাংলাদেশে তখন ইংরেজদের আর্কট টাকা খুব চলেছে। তার কারণ হচ্ছে আর্কট টাকা দক্ষিণ অঞ্চলের। আওরঙ্গজেব সেদিকে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। ফলে সাত হাত ঘুরে ঘুরে এই টাকা আবার দক্ষিণেই ফিরে যেতো। কিন্তু যেই দক্ষিণের যুদ্ধ থেমে গেল, অমনি আর্কট টাকার চল আটকে গেল। হিন্দুস্থানে চলে সিক্কা টাকা, আর্কটের বদলে যদি সিক্কা টাকা নিতে হয় তাহলে ইংরেজদের ডাহা লোকসান। কেননা তাতে শতকরা ১২½% টাকা ক্ষতি হয়ে যায় কোম্পানীর। সে যাই হোক্ মুর্শিদকুলী খাঁ টাকসাল তৈরির অনুমতি দিলেন। দু-নম্বর হল তিনি সম্রাট প্রদত্ত ফরমানের একটি নবকলেবর দান করলেন নিজের ব্যাখ্যায়। সম্রাট তিন হাজার টাকার বাণিজ্যাধিকার দিয়েছেন সেটা তো মানিই। কিন্তু ওহে ইংরেজ, তার মানে এই নয় যে, তোমরা বহির্বাণিজ্যের মত অন্তর্বাণিজ্যেরও অধিকার পেয়েছ। এদেশের জিনিস কিনে এদেশেই ব্যবসা করতে গেলে নতুন মাশুল লাগবে।

তখন অবশ্য কোম্পানীর ফরমানের সুযোগ নিয়ে বহু ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে এই অন্তর্বাণিজ্য চালাতো এদেশেরই অঙ্গে বঙ্গে ঘাটে ঘাটে।

মুর্শিদকুলী খাঁ খুব কড়া লোক। চড়া মেজাজ, ফলে তাঁর দাপটে পড়ে ইংরেজদের অনেক দম খেতে হয়েছে। তবু কিন্তু তাঁর সময় থেকেই ইংরেজদের সৌভাগ্য শশীর পঞ্চদশী অবস্থা। পূর্ণিমা ছোঁয় ছোঁয়।

বছরের পর বছর কেবল আয় বেড়ে চলেছে কোম্পানীর। অসম্ভব দ্রুত লয়ে। আর জনসংখ্যা। বিশেষ করে সুতানুটি আর বড়বাজারের দিকটায়। ১৭০০ সালের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল ১৭০৫ সালে। এখন সেটা আরও বহুগুণ গুরুত্ব

পেয়েছে। ১৭৫২ সালে এই জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল চার লক্ষ ন-হাজারে।

১৭০৬ সালে খাস কলকাতার মোট জমির পরিমাণ ১৭১৭ বিঘে। ৮৫০ বিঘে জমিতে লোকে বসবাস করতো। ১৫২৫ বিঘেয় চাষবাস। ৪০৬ বিঘের বাগান। ২৫০ বিঘেয় ব্রহ্মোত্তর হিসেবে ব্রাহ্মণদের নামে উৎসর্গ করা। ১৬৭ বিঘে খামার বা পতিত জায়গা। বাকী জমিতে রাস্তা ঘাট, নালা, নর্দমা, পুকুর, জঙ্গল।

বড়বাজারের জমির পরিমাণ ৪০৮ বিঘে ১০ কাঠা। গোবিন্দপুরের ১১৭৮ বিঘে ৭ কাঠা। সুতানুটির ১৬৯২ বিঘে ১২ কাঠা।

১৭০০ সালে মিঃ র‍্যালফ্ শেলডন কলকাতার প্রথম কালেক্টর হন। তখন কোম্পানীর কালেক্টরের একজন করে সহকারী থাকতো। তাদের বলা হত কোম্পানীর ব্ল্যাক ডেপুটি। বা ব্লক কালেক্টর। শেলডনের যিনি সহকারী ছিলেন তাঁর নাম নন্দরাম সেন। ইংরেজ কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ চাকরিতে ইনিই প্রথম বাঙালী। কিন্তু তাঁর কপালে বেশী দিন এ-সম্মান সইলো না। সেই যে কথায় বলে না—'ফাটা কপালে চন্দন চড়চড় করে' তাঁরও হল সেই দশা। তহবিল তছরূপ ইত্যাদির দায়ে তাঁর চাকরি গেল। এল নতুন কর্মচারী জগৎ দাস। কিন্তু তিনিও তাঁর পূর্ববর্তী মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়লেন। ভাত মারা গেল ভদ্রলোকের। নন্দরাম সেনই আবার বহাল হলেন পুরনো পদে। কিন্তু স্বভাবের ধর্মে তিনি সেই একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে হুগলীতে পালিয়ে গা ঢাকা দিলেন। কোম্পানী এবার আর সহজে ছাড়লো না। সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে তাঁকে ধরে এনে সোজা পুরলে জেলে। শোভাবাজার অঞ্চলের একটি গলিতে এখনো তাঁর স্মৃতিচিহ্ন টিকে আছে।

মুর্শিদকুলী খাঁর দেওয়ানিগিরির দাপটে বাংলার বনেদী জমিদারদের ভিটে মাটি উঠে যাওয়ার যোগাড়। আবওয়াবের পর আবওয়াব যুগিয়েও তাঁর উদরের ক্ষুধা মেটে না। তার ফলে পুরনো জমিদারের নতুন বংশধররা স্বদেশ বা স্ব-গ্রামের মায়া কাটিয়ে তখন দলে দলে কলকাতায় এসে জড়ো হচ্ছে। কানে কানে মুখে মুখে দেশে দেশে ছড়িয়ে গেছে কলকাতার গুণকীর্তন। সাপ খোপের বন কেটে ইংরেজরা নাকি স্বর্গ বানিয়েছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তবু চোখ ভরে না। মন মাতোয়ারা হয়। তবু মনের আশা মেটে না। কী নেই সেখানে?

নদীর ধারে কেল্লা। কেল্লার চারদিকে ইঁটের গাঁথুনি। পেছনেই গঙ্গা। বড়বাজারের সামনে, ঠিক যে ঘাটটার কাছে জাহাজ থেকে মালপত্র নামে, জাহাজ নোঙ্গর ফেলে, সেখানে এসে দেখে যাও কী সুন্দর মন্দির একটা। মন্দিরের ঠাকুরের নাম কি? নোঙ্গরেশ্বর শিব। মহাজনেরা মালপত্র নামিয়ে মহাধুমধামে এই শিবের পুজো করে।

হ্যাঁ, আর যে কথা বলছিলাম, কেল্লা—। কেল্লার দেওয়াল হচ্ছে ৪ ফিট পুরু। ১৪ ফিট উঁচু। ভেতরে তার সারে সারে সাজানো ঘরে থাকে কর্মচারীরা। সেগুলো একটু উঁচু। একে বলে Long Row. কেল্লার উত্তরে অস্ত্রাগার। আর বারুদখানা। তারই গায়ে মাল গুদাম। চিকিৎসালয়। আর কারখানা। দক্ষিণ দিকে দুটো ফটক। এই দুটো ফটক দিয়ে দুটো রাস্তা। একটা গেছে নদীর দিকে। আরেকটা পুব দিকে লালদিঘীর ধার ধরে, লালবাজারের পাশ দিয়ে বৌ বাজারের দিকে। কেল্লার ভেতরে দক্ষিণ দিকের উঠোনে প্রেসিডেণ্টের ঘর। ঘর তো নয় যেন প্রাসাদ। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার মত বটে জায়গাটা। আর কি বলছিলুম—লালদিঘীর কথা। সাহেবরা সেটার কি নাম দিয়েছে জানো? Green before the Fort. এই তো সেদিন ৫৪ টাকা খরচ করে লালদিঘীটা সারানো হল। মাঝে লালদিঘীর জলটা খুব নোংরা হয়ে গিয়েছিল। মুখে দেওয়া যায় না। অথচ ভালো পানীয় জল আর নেই কোথাও। তাই শুধু ২০ টাকা খরচ হল পাঁক তুলতে আর পানা সরাতে। বাকী ৩৪ টাকায় চারপাশে বাগান গড়া হল, দিঘীতে মাছ ছাড়া হল। কাঁকরের রাস্তা। কমলালেবুর গাছ, শাক-সবজী তরি-তরকারীর বাগান। দু-দণ্ড অবাক হয়ে দেখবার মত।

এমন কলকাতা ছেড়ে আর যাবে কোথায়? সেখানে গেলে বড় বড় চাকরি পাবে। টাকার কথা ভাবতে হবে না। শুধু মুঠো মুঠো করে কুড়োবার সময় পেলে হয়।

কথাটা সত্যিই। কলকাতা শহরের জনসংখ্যা, বসতি আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর দপ্তরখানাও যত বাড়ছে ততই নতুন কর্মচারীর প্রয়োজন পড়ছে। আর এসব ব্যাপারে দেশীয় লোকদের সাহায্য না নিলেও সুষ্ঠুভাবে কাজ চলে না। ফলে লোকে চাকরি খুঁজবে কি কোম্পানীই তাদের চাকরি দেবার জন্যে জেদাজেদি করে।

নন্দরাম সেনের কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি তো ডেপুটি কালেক্টর।

এছাড়া দালাল, ব্ল্যাক জমিদার আরও কত কিছুর জন্যে লোক চাই।
কলকাতার পুরনো বাসিন্দে শেঠেরা। তাঁদের বাড়ির কর্তা জনার্দন শেঠের বরাত খুলল একদিন। কোম্পানী তাঁকে একেবারে মুসলমানি কেতায় শিরোপা দিয়ে নিজেদের বড় দালালের পদটি জোর করে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। এই শেঠেরা বংশানুক্রমে ইংরেজ আমলের বড দালালির কাজ করে এসেছে। তাঁদের কাজ ওদেশের মাল এদেশের বাজারে কাটিয়ে দেবার খদ্দের খোঁজা। এদেশের মাল ওদেশের বাজারের জন্যে সস্তা দরে সংগ্রহ করা।
বেশ বড় ঘরের ছেলে গোবিন্দ মিত্র। স্ব-গ্রাম চানক ছেড়ে কলকাতার বাসিন্দে হয়েছিলেন। তিনি হয়ে গেলেন জমিদার হলওয়েলের নীচে ব্ল্যাক জমিদার। চাকরিতে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর রাজত্বে রাতারাতি বড়লোক হবার যে সব গলি ঘুঁজি, অন্ধকার ঢাকা সুড়ঙ্গপথ আছে সে সবের হদিশ জেনে ফেললেন। ফলে গাড়ি হাঁকাতে, বাড়ি হাঁকাতে আর ক-দিন লাগে! নিজের নামে, আবার বেনামে—সমানে ব্যবসা চলছে তাঁর। সস্তা দরে চেনা-জানাদের মধ্যে জমি বিলি করিয়ে, আদায় করা খাজনা থেকে টাকাটা সিকেটা সরিয়ে জমিয়ে জমিয়ে তিনি জমিদারী চাকরির সঙ্গে সঙ্গে টাকার কুমীর হয়ে উঠলেন। কী তাঁর নাম ডাক! বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায় তাঁর দাপটে। হাতে থাকে তেল চকচকে সোনা বাঁধানো ছড়ি একখানা সব সময়। সেটা তাঁর শাসন দণ্ড। কুমোরটুলীতে তাঁর অট্টালিকা। অট্টালিকার সঙ্গে মন্দির। নবরত্ন মন্দির। ন-চুড়োওয়ালা। মনুমেণ্টের চেয়ে উঁচু তার চুড়ো। ১৬৫ ফিট। ১৭২৫ সালে সেটা গড়া হয়েছিল। ১৭৩৭ সালের এক মহাপ্রলয়ের রাতে অনেকগুলো চুড়ো ভেঙে পড়ল। ১৮৪০ সালের ভূমিকম্পে সেটা পুরোপুরিই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। এখন যা আছে—সেটা কঙ্কাল।
জমিদার হলওয়েল সাহেবের কিন্তু এই বাঙালী মিত্তিরের সঙ্গে খুব মিত্রতা ছিল না। সাহেব ডিঙিয়ে বাঙালীর এতটা দাপটের দৌড় বোধ হয় জমিদার সাহেবের মনে লাগেনি। তাই উঠে পড়ে লেগেছিলেন তিনি কাউন্সিল থেকে গোবিন্দ মিত্তিরকে তাড়াবার চক্রান্তে। কিন্তু সে সময়ে বাঙালীরাই ইংরেজদের বাঁচার একমাত্র ভরসা—তাই চট্ করে এমন একটা চটাচটির কাজে খুব সহজে কেউ রায় দেয়নি।
একবার হল কি, হলহয়েল সাহেব তাঁর কাছ থেকে জমিদারী সেরেস্তা সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দেখতে চাইলেন। গোবিন্দ মিত্র তাঁর পত্রবাহকের হাতে জবাব

লিখে দিলেন তখনি—

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাদের দুজনেরই মালিক। আমরা দুজনেই মাইনে পাওয়া কর্মচারী মাত্র। তাই প্রেসিডেন্ট সাহেবের অনুমতি পত্র না হলে আপনাকে কাগজ-পত্রের ছিটে ফোঁটাও দেখানো যাবে না।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। শঠে শাঠ্যং।

আরেকবারও এমনি ঘটল। সেটা পলাশী যুদ্ধের বছর পাঁচেক আগে। কাউন্সিলের কাছে জমিদার সাহেব অভিযোগ জানালেন—গোবিন্দরাম আদৌ ভালো লোক নয়। সে নানা অসদুপায়ে টাকা রোজগার করে। তার ওপর সে কোম্পানীর তহবিল থেকেও কিছু টাকা সরিয়েছে।

গোবিন্দরাম নির্ভয়চিত্তে তাঁর কৈফিয়ৎ দাখিল করলেন কাউন্সিলের কাছে। যারা সব আমার মত ডেপুটিগিরি করে গেছেন—তাদের সকলেই আমার মত স্বত্বাদি ভোগ করেছেন। আমার মত একজন মোটা পদের কর্মচারীর পক্ষে যে পরিমাণ লোকজন, দাসদাসী, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি না রাখলেই নয়,—নইলে পদ মর্যাদা বা গৌরব কিছুই প্রকাশ পাবে না—সে রকম জাঁকজমক এতলাব বলতে আমার এমন কি আছে? আপনাদের মাইনে মান-ইজ্জত বাঁচাতেই কুলোয় না। সুতরাং—

গোবিন্দরাম মিত্র শুধু একাই নন। আরও কয়েকজন প্রভাবশালী লোকের পরিচয় দিলে তখনকার দেশীয় বড়লোকদের অনেকখানি চরিত্রই চেহারা নিয়ে ফুটে উঠবে চোখের সামনে।

সেকালের কলকাতায় একটি প্রবাদ বাক্য চালু ছিল সর্বত্র।

বনমালী সরকারের বাড়ি
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
জগৎ শেঠের কড়ি
উমিচাঁদের দাড়ি।

ছড়াটির নানা রূপ আছে। আরও নানা চরিত্রের উল্লেখ আছে অন্যান্য পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ছড়াগুলিতে।

কোনটিতে জগৎ শেঠের জায়গাটা জুড়ে বসেছেন—হুজুরী মল্ল। আবার কোনটায় হুজুরী মল্লের মুল্লুকে নাক গলিয়েছেন নকু ধর।

ছড়া যাই হোক—এঁরা সকলেই কোম্পানীর আমলের গোড়ার দিকের কলকাতার খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি—তাতে সন্দেহ নেই। একে একে এঁদের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই এবার।

বনমালী সরকার জাতে সদগোপ। পাটনার কমার্শিয়াল রেসিডেন্সির দেওয়ান। পরে কোম্পানীর ডেপুটি ট্রেডার হন। ব্যবসায় বিস্তর টাকা কামিয়ে কুমোরটুলীতে তাঁর ইয়া প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ উঠল। ভেতরে এলাহি ব্যাপার। ৮।১০ বছর লেগে গেল সেটা গড়তে। ভেতরে এত সব দেখবার জিনিস যে, দূর দেশ থেকে কেউ কলকাতা কি কালীবাড়িতে এলে বনমালী সরকারের বাড়ি একবার দর্শন করে যেতে না পারলে মন কেমন কেমন করতো। এমন কি লাটবেলাট-মারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর বয়স্য গোপাল ভাঁড়কে সঙ্গে নিয়ে এই প্রাসাদ-দর্শনে এসেছিলেন। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীর প্রতিষ্ঠাতা ইনি।

এবার জগৎ শেঠ। এঁর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে বাংলার রাজনৈতিক জগতে এই শঠ-চূড়ামণির অসামান্য ভূমিকা সর্বজনবিদিত। "জগৎ শেঠ" এই উপাধি সম্রাট ফারুকশিয়রের দান। আসল নাম ফতেচাঁদ। সম্রাট হওয়ার আগে তিনি কিছুদিন বাংলার রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। এবং সিংহাসন লাভের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। সেই সময়ে সম্রাট এই শেঠ মহাশয়ের কাছ থেকে বহুভাবে সাহায্য পান। আর তারই কৃতজ্ঞতা হিসেবে এই উপাধিদান। সঙ্গে রত্ন-মোহর আর ফরমান। এই ফরমানের জোরে তাঁর আসন হল বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব বাহাদুরের সিংহাসনের বাঁ-দিকে। নবাব বাহাদুরের এমন সাধ্য ছিল না যে জগৎ শেঠ-এর পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ বহু দিন ছিলেন বাংলার দেওয়ান। শেষ দিকে হলেন নবাব। আর সেটা পাইয়ে দেবার জন্যে বহু উমেদারী করেছিলেন যিনি—তিনি এই জগৎ শেঠ। রাজস্ব সংগ্রহের ভার পেয়েছিলেন তিনি। তিনিই কোষাধ্যক্ষ। তারই বাড়ির উঠোনে মুদ্রাযন্ত্র। দুশো অশ্বারোহী সৈন্য তাঁর ধন ভাণ্ডার পাহারা দিত দিনে রাতে। দেশসুদ্ধ লোকের মাথা তখন নোয়ানো থাকতো তাঁর শ্রীচরণারবিন্দের দিকে। জমিদারদের সুখ-দুঃখের, ধার-কর্জের, বুদ্ধি-পরামর্শের যাবতীয় ব্যাপারে জগৎ শেঠ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি অগতির গতি। যেন এক জাগ্রত দেবতা।

নবাব দরবারে জগৎ শেঠ যেমন শেঠদের মধ্যে সবচেয়ে স্বনামধন্য, বণিকদের মধ্যে তেমনি উমিচাঁদ। উমিচাঁদ তাঁর আসল নাম নয়। ইংরেজদের উচ্চারণের উখোয় ক্ষয়ে ক্ষয়ে উমাচরণ নামটাই একবার আমির চাঁদ, তারপর আমিনচাঁদ, আমিচাঁদ হতে হতে অবশেষে উমিচাঁদ-এ এসে ঠেকেছে। লর্ড

মেকলে তাঁকে বলেছিলেন ধূর্ত বাঙালী। কিন্তু কস্মিনকালেও তিনি বাঙালী নন। শিখ বণিক। জাতে হিন্দু। বাঙালীদের কাছে তিনি বণিক। ইংরেজদের কাছে রাজা। নবাব দরবারে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নেই। তাঁর আবাস-গৃহ এক প্রকাণ্ড রাজপুরী। বিরাট বাগান। সেনা-সামন্ত ঘেরা সিংহদ্বার। প্রতিষ্ঠা-লাভের আগে ইংরেজ-বণিকরা বিপদে-আপদে তাঁর পদাশ্রিত হয়েছে বহুবার। আর প্রতিষ্ঠালাভের পর তাঁকে পায়ের তলায় ফেলে পিষতেও তাদের বাধেনি। মানিকচাঁদ শেঠের ব্যবসায়ে খেটে খেটে অর্থোপার্জনের উন্মাদনায় যে উমিচাঁদের প্রথম জীবন শুরু হয়েছিল—তার শেষ জীবন অর্থঘটিত অনর্থের ফলেই উন্মাদের উন্মত্ততায় একটু একটু করে শেষ হয়ে গেল।

হুজুরী মল্ল উমিচাঁদের শালা। তেজারতি ব্যবসায় পয়সা খাটিয়ে লাখপতি হয়েছিলেন তিনি। বৈঠকখানা বাজারের কাছে পুকুর কাটিয়ে বিরাট তাঁর বাগানবাড়ি। এখন সে পুকুর কালস্রোতে ভেসে গেছে। তার পাড় দিয়ে যে রাস্তা—সেটাকেই এখন আমরা জানি হুজুরী মল ট্যাঙ্ক লেন বলে।

এবার গোকুলচন্দ্র মিত্র। শত্রুদের মনে তাঁর ছড়ি সম্পর্কেও আতঙ্ক ছিল প্রবল। বাগবাজারে বাড়ি। বাড়ি নয়, রাজবাড়ি। নাটমন্দিরে আজ দোল, কাল দুর্গোৎসব, পরশু রাস, পরের দিন অন্নকূট মহোৎসব—একটার পর একটা লেগেই আছে। নাচে, গানে, কলরবে, জনসমাগমে সমস্তক্ষণ তাঁর বাড়ি গমগম। যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের তিনিই ছিলেন মূলাধার। স্বাধীন ভাবে নুনের ব্যবসা করেই যা কিছু অর্থ। গঙ্গার ধারে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন তিনি একটা। সেটা নুনের ঘাট কিনা জানি না—তবে এটা তাঁর জীবনের গুণাবলীর অন্যতম একটি ঘটনা বটে! লটারীর টিকিটের দৌলতে চাঁদনী চক্-এর মালিক হয়েছিলেন তিনি।

এর পর ধরা যাক্ নকু ধরের কথা। আসল নাম লক্ষ্মীকান্ত ধর। চার্নকের সময়ে হুগলী থেকে সুতানুটি আসেন। পলাশী যুদ্ধের সময়ে ক্লাইভকে সাহায্য করেছিলেন ইনি নানাভাবে। প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় ইংরেজ-দের ন-লক্ষ টাকা কর্জ দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে খুবই সম্মান প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের যা কিছু উন্নতি—তার মূলে নকু ধরের অনেক ধরাধরির কাণ্ড আছে। পোস্তার রাজবংশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল তাঁর জীবদ্দশায়।

বাকী রইল কেবল আরেকজনের কথা। তিনি রতন সরকার। জাতে

ধোপা। চাকরি করতেন নন্দরাম সেনের বাড়ি। ১৬৭৯ সালে থ্যাকম (ফ্যাল্‌কন ?) নামে একটা জাহাজ এসে ভিড়ল গার্ডেনরীচে। মিঃ স্টাফোর্ড জাহাজের কাপ্তেন। তিনি বাংলাভাষার বিন্দু বিসর্গও বোঝেন না। ফলে দরকার হল একজন 'দোভাষী'র। হুকুম হল 'দোভাষী' খুঁজে আনো। একথা বলবার সময় সাহেব বাংলায় উচ্চারণ করলেন 'দোবাস্‌'। বাঙালী কর্মচারী শুনল 'ধোবা'। অমনি রতন সরকারের কাছে এসে হাজির।

'ইয়েস', 'নো', 'ভেরি ওয়েল'—এ তিনটে ছাড়াও আরও পাঁচ-দশটা ইংরেজি শব্দ শেখা ছিল তাঁর। ফলে চাকরিটা বেমালুম জুটে গেল বরাতে। বড়বাজারের একটা রাস্তা আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

গ্রাম কলকাতার গা থেকে ক্রমশ শহরের গন্ধ ফুটে বেরুচ্ছে। শাসন-কাজের সুবিধের জন্যে চারটে ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে তাকে। সাহেব পাড়াটা একেবারেই আলাদা সব কিছু থেকে। ওদিকের হেস্টিংস স্ট্রীট থেকে শুরু করে এদিকের চীনেবাজার পর্যন্ত তার পরিধি।

সাহেব পাড়ার উত্তরে বড়বাজার। এখানকার বাসিন্দে হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অনেক লোক। আরবী, পার্শী, মোগল, হাবসি, চীনে, কাফ্রি সবাই আছে। বড়বাজার ছাড়লেই সুতানুটি। খাস বাঙালীদের বসবাস এখানে। মুকুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, চাটুজ্যে, পাঠক, ঘোষাল, ঠাকুর, মিত্তির, বোস, ঘোষ, দত্ত, দে, কর, ধর, সোম, সরকার, পাল, কুণ্ডু, বসাক, কোঠয়া, মল্লিক, রায় সবাই। ছিল বটে সবাই, তবু সকলকে ডিঙিয়ে পিরালী বামুন, কায়স্থ, তাঁতী আর সোনার বেনেদের মান-মর্যাদাই সবচেয়ে বেশী। কলকাতার যা কিছু সমৃদ্ধি—সব তাঁদেরই হাতে গড়া। একটা ছড়াই আছে তাই—

"পিরালী, কায়েত, তাঁতী আর সোনার বেনে
করলে আবাদ তারা দেশ বয়ে ধন এনে।"

সাহেব পাড়ার বাড়িগুলো ইঁটের। বড়বাজার মাঝামাঝি। ইঁটও আছে, মাটিও আছে। আর সুতানুটির বাঙালী পাড়া একদম মেটে।

১৭০৬ সালে কলকাতায় লোক চলাচলের রাস্তা ছিল মোটে দুটো। আর গলি বলতেও দুটো। পুকুর ১৭টা। ৮টা পাকা বাড়ি। ৮ হাজার মেটে বাড়ি। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করতে এলেন যখন তখন পাকা বাড়ি ৪৯৮টা। মেটে ঘর ১৪,৫০০ হাজার। ২৭টা রাস্তা। ৫২টা গলি। বাইলেন ৭৪টা। আর পুকুর ১৩ টা।

লোকসংখ্যা যত বাড়ে, জমিদারীর কাজও বাড়ে তত। কাজের ঠেলা থেকে জমিদারী সেরেস্তার পত্তন হল। যাকে বলে কাছারী। এখনকার লাল-বাজারের ওপর ছিল কাছারী ঘর।

খাতা লিখবার জন্যে ফিরিঙ্গীদের ডাক পড়ল। চৌকিদার হবার জন্যে গোয়ালাদের। যিনি কালেক্টর, তাঁকেই আবার দেওয়া হল ফৌজদারী বিভাগের প্রধান কর্মচারী আর ম্যাজিস্ট্রেটের পদ। তিনি একটা ছোট্ট পুলিস দলের অধিকর্তা। ১৭০৪ সালে এই দলের লোকজনের মধ্যে ছিল একজন প্রধান কর্মচারী, ৪৫জন কনস্টেবল, ২জন নকীব আর ২০জন চৌকিদার। ১৭০৬ সালে চৌকিদারের সংখ্যা কিছুটা বেড়ে হল ৫১ জন।

ঐ সময়ে জমিদারী সংক্রান্ত কাজের সময় ছিল সাধারণতঃ সকাল ৯৷১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। মাঝখানে খাবার সময়। একটা বড় হল ঘরের ভেতরে পদ-মর্যাদা অনুসারে সবাই পর পর নিজের নিজের আসনে খেতে বসতো। রাত্রেও এই এক ব্যবস্থা। মধ্যাহ্নের বিরতির পর আবার কাজ শুরু হত বিকেল ৪টের পর থেকে।

কর্মচারীদের ওপর আইন-কানুনের কড়াকড়ি ছিল খুব। কুঠি-কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কেউ বাইরে রাত কাটাতে পারতো না। নদীয়া ছিল সেকালের গভর্নর বা পদস্থ সাহেবদের বায়ু পরিবর্তনের জায়গা। আর আড্ডা দেবার জায়গা ছিল ডেমিঙ্গো অ্যাশ্-এর বৈঠকখানা।

প্রত্যেক সপ্তাহের গোড়ায় কেল্লার ভেতরে কাউন্সিলের সব সদস্যরা মিলে আলোচনা করতেন ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে। ১৭০৪ সালের পর থেকে নিয়ম হল যে একেকজন একেক সপ্তাহে সভাপতিত্ব করবে।

সাধারণ কর্মচারীদের তখন পালকি চড়ার অধিকার ছিল না। প্রধান প্রধান রাজ-কর্মচারী আর তাদের সহকারী ছাড়া। অন্যান্য কর্মচারী বা রাইটররা ছাতা মাথায় দিয়ে পথ চলতো। পয়সা দিলেই পথের মাঝখানে 'ছাতা-বরদার' পাওয়া যেতো অনেক।

আর বিচার-কার্য চলতো সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত—প্রত্যেক শনিবারে। অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল বেশ বিচিত্র ধরনের। হত্যা-কারীদের গলায় গরম লোহার শিকের ছেঁকা দিয়ে গঙ্গা পার করে দেওয়া হত। ১৭০৪ সালে কাউন্সিলের আদেশ প্রচার করা হল। দেশীয় অধিবাসী-দের অপরাধের দণ্ড থেকে, জরিমানা থেকে সমস্ত টাকা আদায় হবে,

সে সব টাকা শহরের ভেতরকার আর আশপাশের নালা-নর্দমা, খানা-ডোবা এই সব ভরাট করার কাজে লাগানো হবে।

চার্নকের সময়ে আদেশ জারী করা হয়েছিল—কোম্পানীর দখলে যে সব পতিত বা জঙ্গলে জায়গা আছে নিজেদের খরচে সেটা কাটিয়ে যে-কোন লোক যে-কোন জায়গায় নিজেদের ঘর বাড়ি তুলতে পারে।

তার ফলে ১৭০৩ সাল পর্যন্ত কলকাতায় যে সব বাড়ি তৈরি হয়েছে—তার পিছনে সৌন্দর্যবোধের চেয়ে সুবিধাবাদের দৌরাত্ম্যই বেশী প্রকট।

১৭০৪ সালে কাউন্সিলের নতুন আদেশপত্র বেরুল। বিশৃঙ্খলভাবে ঘর বাড়ি আর কাউকেই তৈরি করতে দেওয়া হবে না। ফোর্ট উইলিয়ম কর্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্র অনুমতি না নিয়ে অনেকে বাড়ি তুলছে, পাঁচিল দিচ্ছে, পুকুর কাটাচ্ছে ভিটের ভেতরে। এখন থেকে এ ব্যাপারে সবাইকেই সাবধান হতে হবে। বলা বাহুল্য এই ঘোষণায় খুব ফল ধরেনি।

১৭০৯ সালের পর থেকে কলকাতায় দেখবার জিনিস হচ্ছে সেণ্ট অ্যান গির্জা। তার চূড়োটা ছিল যেন আকাশ-ছোঁয়া। বহু দূর-দূরান্তর থেকে চোখে পড়ত সবার। ১৭১০ সালে বক্সীর ওপর জঙ্গল কাটা, নালা বুজোনো, নয়ানজুলি কাটা, ইত্যাদির আদেশ এল কাউন্সিলের কাছ থেকে। বকসী হচ্ছে নায়েবের নীচের পদ।

আর এদিকে তৈরি হতে লাগল হাঁসপাতাল। এখনকার সেণ্ট জন্ চার্চের পুব দিকের জায়গাটায় তৈরি হল হাঁসপাতাল। পাশেই গোরস্থান।

১৭১৭ সালের চৌরঙ্গী কয়েকটা মেটে বাড়ি নিয়ে একটা পাড়াগাঁ-র মত জায়গা। আজকের গড়ের মাঠ তখন জলা, ধেনো জমি, বাঁশঝাড় আর জঙ্গলে ভর্তি।

১৭২৭ সালে কলকাতায় একটা সমিতি বা কর্পোরেশন গড়া হল। এর কর্তা যিনি তাঁকে বলা হত মেয়র আর সঙ্গে থাকতো ৯জন অলডার-ম্যান। হলওয়েল সাহেব কলকাতার জমিদাররূপে এই সমিতির প্রথম সভাপতির পদটি মাথায় তুলে নিলেন।

কলকাতা আগের চেয়ে ছিমছিম, ফুটফুটে হয়ে ফুটে উঠল। কে যে এর শাসক, কে যে এর রাজা, কে মন্ত্রী, কে কোটাল—কিচ্ছু জানে না লোকে। শুধু দেখে একটা গ্রাম তার বুকের জংলী পোশাকটাকে পালটে একটু একটু করে নিজেকে সাজাচ্ছে নানা রত্ন আভরণে, সৌখিন আড়ম্বরে। আজ ওখানে গির্জে তৈরি হচ্ছে নতুন। কি নাম? না সেণ্ট অ্যান।

রানী কুইন এ্যান-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এই উদ্যম। কাল ওখানে ব্রীজ তৈরি হচ্ছে। জোড়া জোড়া সাঁকো। তার থেকেই একটা জায়গার নাম আজও চালু হয়ে আসছে জোড়া সাঁকো। এখানে বাজার বসবে। শ্যামবাজার, লালবাজার আরও ক-টা। পুকুর কাটানো কমাও। চিৎপুর রোডের ওপরে গাছ পোঁতো।

পচা পানা, পচা পাতা, এঁদো নালা ডোবা, ভিজে মাটি, বন জঙ্গল সব মিলিয়ে মাত্র ক-বছর আগে যে জায়গাটাকে নরক ছাড়া আর কিছু বলা যেতো না—ইংরেজরা এসে তাকে দিনের পর দিন স্বর্গের মত গড়ে তুলছে। তবু কেন যেন এত সুখেও একদল লোকের দুঃখ ঘোচেনি। মারী-মড়কের বাড়াবাড়ির জন্যে কিনা কে জানে! পশ্চিমী সিপাইগুলো পেটের জন্যে কলকাতায় এসে কিছুতেই মন টিকোতে পারতো না। খৈনি টিপতে টিপতে গান গাইতো তারা—

"দাদ হোয়, খাজ হোয় আর হোয় তৌ হোহা।
কলকাতা নাই যাও, খাও মৌহা।"

পশ্চিমী সেপাইরা যাই বলুক, বাল্যলীলার বয়স পেরিয়ে শহর কলকাতা তরতর করে এগিয়ে চলেছে যৌবনের টানে। অপরের অনুগ্রহের দান নয় আর। নিজের শক্তিতে বিশ্বাসী, সুদৃঢ়, সুঠাম তার অবয়ব। ধমনীর রক্তবিন্দুতে কেবল অস্থিরতা। আকাঙ্ক্ষা। কেন? কিসের? কাকে চায় সে? রাজকন্যা খোঁজে নাকি? নাকি অর্ধেক রাজত্বের অধিকার? তা জানিনে। হয়তো অর্ধেক। হয়তো সবটাই। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা—সবটাই।

লাট ভবন

লাট ভবনের আরেকটি চিত্র

১। গণৎকার
২। সরকার
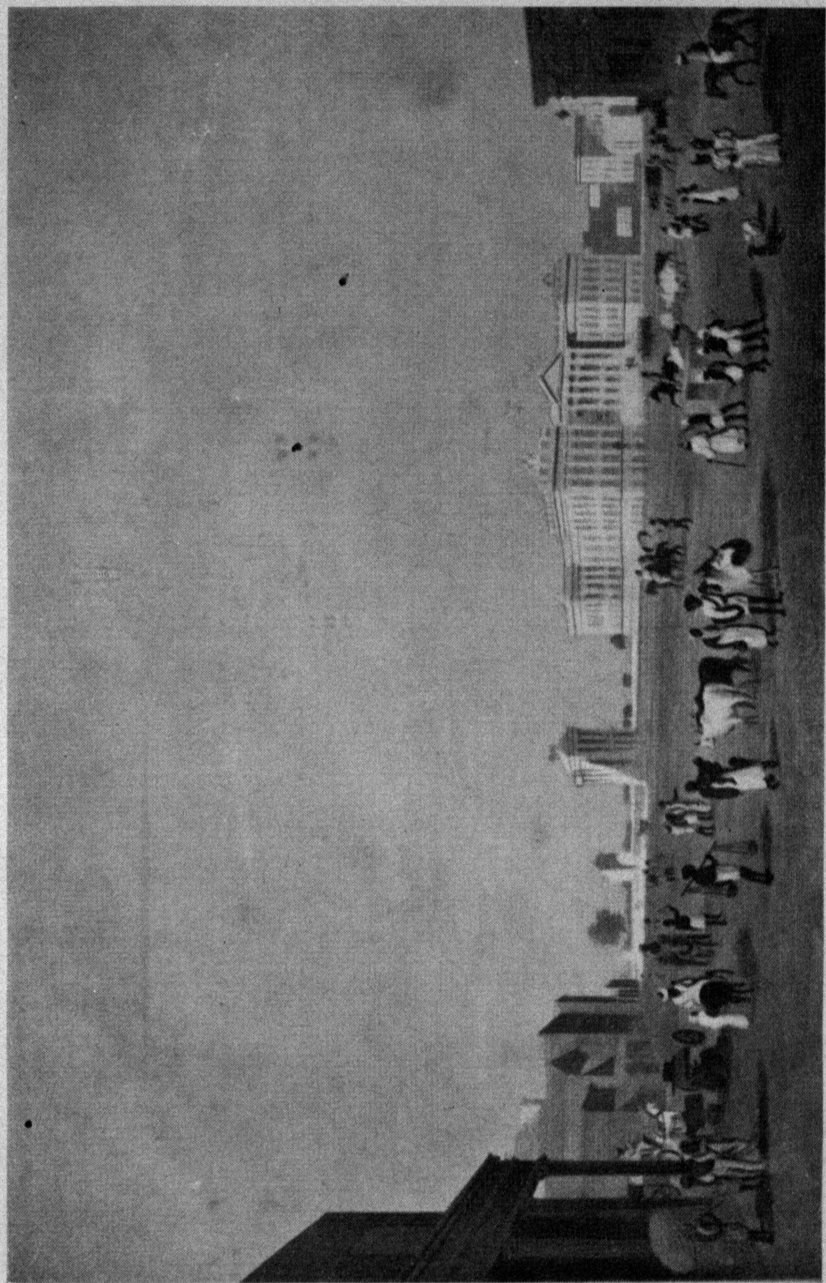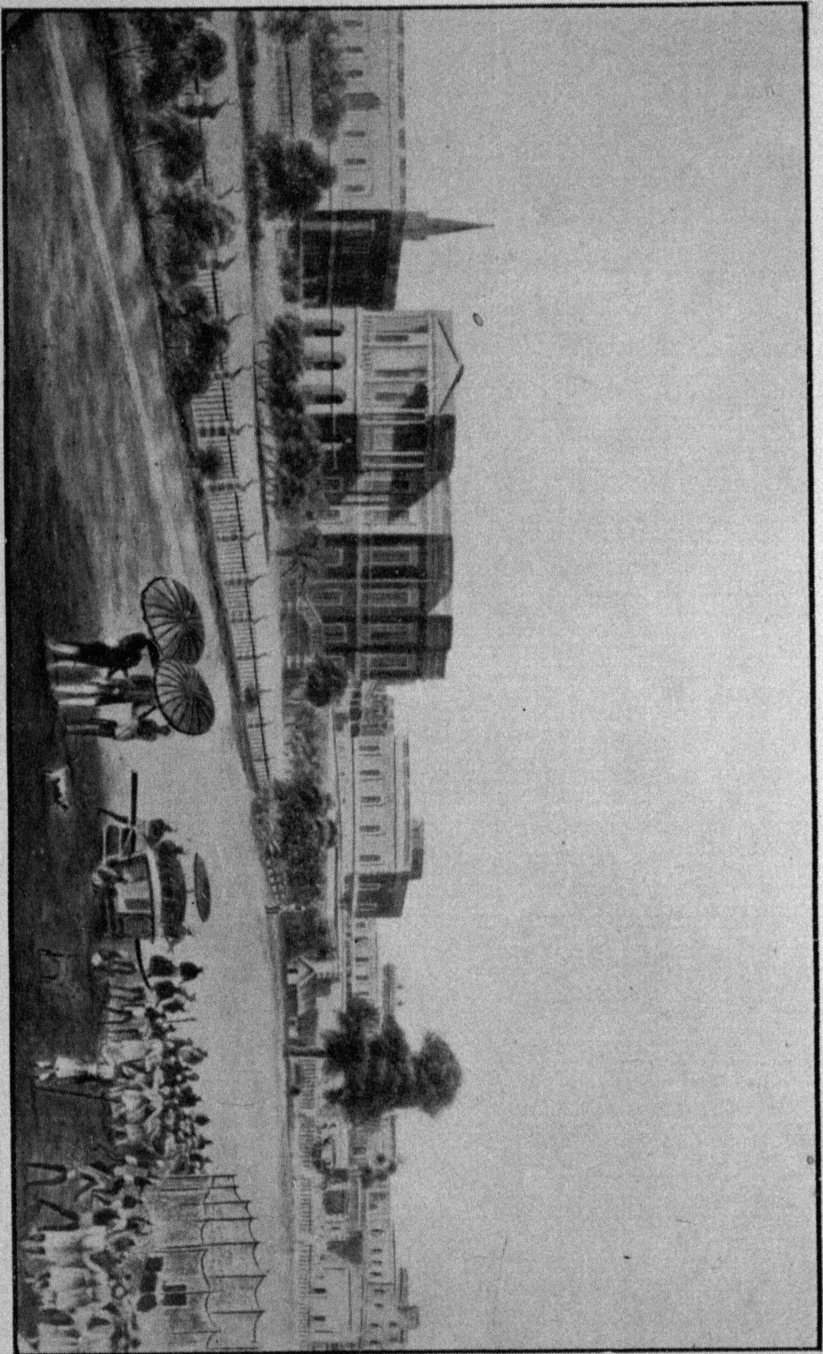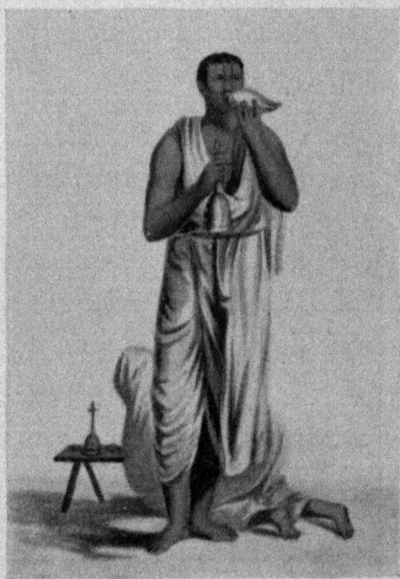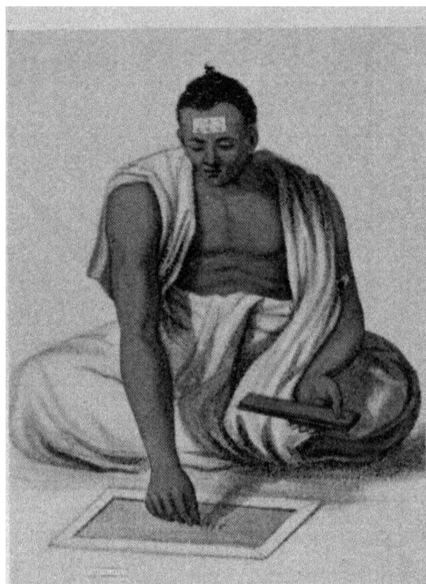
৩। হুকাবরদার
৪। পূজারী
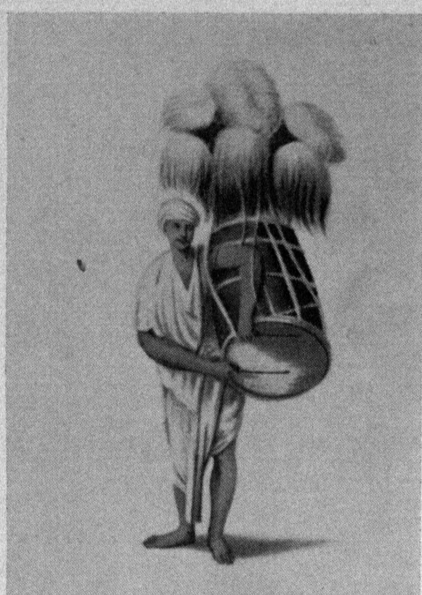
১। মেছুনী
২। ভদ্রমহিলা

৩। ঢাকী
৪। ভদ্রলোক

॥ বর্গী এল দেশে ॥

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে মোগল সাম্রাজ্য বিবাদে আর বিশৃঙ্খলায় টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙছে। রাজ্যে রাজ্যে অরাজকতা। মুল্লুকে মুল্লুকে লুঠতরাজ, খুনখারাপি, মারপিঠ। চারদিকে মাৎস্যন্যায়ের চূড়ান্ত। আর চারদিকেই একটা কালো, কঠিন, বিভীষিকাময় ধ্বংসের ছায়া।

আওরঙ্গজেবের ৫০ বছর রাজত্বের ইতিহাস—ধ্বংস। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে শাসনদণ্ড হাতে নিল—ধ্বংস। রোজ বদলায় রাজা। প্রজাদের দুঃখ কেঁদে মরে প্রজার মনেই। চোখের সামনে এমন কেউ নেই যাকে দেখে মনে হয়—প্রতিপালক, মনে হয় রক্ষা-কর্তা। চোখের সামনে শুধু একটা কালো ছায়া—ধ্বংস। সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত আর কথা কয় না। কেননা তার বুকের ভেতর—ধ্বংস।

দিল্লীর সিংহাসনে দিল্লীশ্বর নেই আর। আছেন কাঠের পুতুল। তাকে যেমন নাচানো হয়—তিনি তেমন নাচেন। কেউ রাজস্ব দেয়। কেউ আজ দেবো কাল দেবো বলে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করে। প্রদেশে প্রদেশে সুবেদাররা বা নবাবরা যে যার নিজের মাথায়, নিজের আত্মীয় কুটুম্বের মাথায়

রাজছত্র তুলে ধরার উদ্যোগে মহোদ্যমে উঠে পড়ে লেগেছেন। কেননা এমন চরম সুযোগ আর কোন দিন আসবে না। কিসের সুযোগ? ধ্বংসের।

বাংলার মসনদ থেকে মুর্শিদকুলি খাঁর চির বিদায়ের পর শুরু হল পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব। একদিকে জামাই। শুজাউদ্দীন খাঁ। অন্যদিকে পৌত্র সরফরাজ। সরফরাজের দিকে উত্তরাধিকার। শুজাউদ্দীনের দিকে চক্রান্ত, লোভ। শেষ পর্যন্ত লোভেরই জয় হল। স্ত্রী এবং শাশুড়ীর উদারতায়। পুত্র সরফরাজের মাতৃভক্তির ফলে।

শুজাউদ্দীন রাজ্যলাভের আগে যা ছিলেন, রাজ্যলাভের পর কিন্তু আর তা থাকলেন না। তাঁর কাম-প্রবৃত্তি বেশ কিছু কমলো। বিলাসিতার বহরটা খাটো হল মাপে। আমোদ প্রমোদ তিনি ভুললেন না। তবু প্রজাদের জন্যে ভালো করার ইচ্ছেটাও তাঁর মনে ঠাঁই পেয়েছিল। ঢাকার বিস্তীর্ণ জনপদে আবাদের সূচনা হল তাঁর রাজত্বকালে। জিনিস পত্রের দাম হল শায়েস্তা খাঁর আমলের মত সস্তা। খাজনার বাকী-বকেয়া ঘটলেও জমিদার কারারুদ্ধ হত না। শায়েস্তা খাঁ ঢাকার পশ্চিম দিকে এক তোরণে লিখে গিয়েছিলেন যে, চালের দাম যখন তাঁর সময়ের মত সস্তা হবে, তখনই এই তোরণ-দ্বার উন্মুক্ত হবে। শুজাউদ্দীনের আমলে শায়েস্তা খাঁর সেই স্পর্ধিত গর্ব ম্লান হল।

দোলের দিনে নবাবের বিলাস-নগর ফরহাবাগে আবীরে, কুমকুমে ধুলো লাল হয়। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে নাচ, গান আর উৎসবের আনন্দ ধ্বনিতে। নবাবের জন্মদিনে কি কর্মচারী, কি অনুচরবর্গ, কি প্রজামণ্ডলী, কি কবিকুল এমন কি দরিদ্র প্রজাসাধারণ সকলকেই বিতরণ করা হয় সোনা, রূপো, টাকা কড়ি।

শুজাউদ্দীনের আমলে ইংরেজরাও ছিল নির্বিবাদে, নির্ঝঞ্ঝাটে। কিছু গণ্ডগোলের শুরু হতে না হতেই যদি নবাবের মুঠোটাকে ভরিয়ে দেওয়া যায় তো সব চুকে গেল।

সাময়িকভাবে রাজ্য জুড়ে শান্তির মুখ দেখা গেল কিছুদিন। কিন্তু শান্তির চেয়ে ধ্বংস তখন বাংলার মাটিতে, মসনদে গোপনে গোপনে গা ঝাড়া দেবার জন্যে অপেক্ষা করছে। বাতাসে তার চাপা ফিস্‌ফাস শব্দ। গাছের ঝরা পাতায় তার পায়ের লঘু চলাফেরার ধ্বনি।

শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হলেন পুত্র সরফরাজ খাঁ। সরফরাজ খাঁর রক্তে রক্তে কলুষতা। রাজসিংহাসনের চেয়ে রাজ অন্তঃপুরে তাঁর দৃষ্টি বেশী। সেখানে ১৫০০ কামিনী। সে যেন বেহেস্তের চেয়েও বেশী সুখের। ঘরে অসংখ্য যৌবনবতী রমণী। ঘরের বাইরে ইয়ার বন্ধুবান্ধব। রাজদ্বারে যত রাজ্যের গাঁজাখোর আফিমখোর, পির ফকির, সাধু সন্ন্যাসী— এই হচ্ছে সরফরাজের জগৎ।

জগৎ শেঠ উপাধিধারী ফতেচাঁদ তখন অর্থবলের বাহুল্যে একজন গণ্যমান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তাঁর স্বর্ণ-সিন্দুকের ডালার তলায় রাজ্যসুদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মাথার টিকি বন্ধক। সরফরাজ তাঁর বাড়ির সুন্দরী বৌ-এর দিকে চোখ দিয়েছে। রাগ জ্বলছে শিরার শিরায়। তার ওপর টাকাকড়ির গণ্ডগোল। নানা দিকে সরফরাজের দুর্ব্যবহার। জগৎ শেঠ আর আলিবর্দী খাঁর বড় ভাই হাজী মহম্মদ বুঝলেন এবার রাজের ধ্বংসের পালা। কে নেবে? কাকে দেওয়া যায় রাজ্যভার? কেন আলিবর্দী? অমন বীর, অকুতোভয় পুরুষ থাকতে দিশেহারা আমরা!

১৭৪০ সাল। গিরিয়ার মাঠের একদিকে সরফরাজ খাঁ। অন্যদিকে আলিবর্দী।

"নবাবের তাম্বু পড়িল ব্রাহ্মণের স্থলে,
আলিবর্দীর তাম্বু তখন পড়িল রাজমহলে॥
নবাবের তাম্বু যখন পড়িল দেয়ান সরাই,
আলিবর্দীর তাম্বু তখন আইল ফরক্কায়॥
নবাবের তাম্বু আইল খামরা সরাইতে,
আলিবর্দীর তাম্বু তখন সুতীর দরগাতে।
নবাবের তাম্বু পড়িল গিরিয়ার মাঠেতে॥
আলিবর্দীর তখন পড়িল পিপিলাতে।"

দু-দিকেই বাজছে যুদ্ধের বাজনা। সৈন্যসামন্তের রণোল্লাস। গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে ধ্বংস।

এক বছর ২৮ দিন বাংলার নবাবগিরি করে যুদ্ধে সরফরাজের জীবন শেষ হল।

"শুজা খাঁ নবাব সুত সরফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রাঁয়া॥
ছিল আলিবর্দী খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বাধিলেক তায়॥

তদবধি আলিবর্দী হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতসা খেতাব ॥"

আলিবর্দী খাঁ রাজকার্যে নিপুণ। সংযত, স্থির, ধীর, ব্যক্তি। চরিত্রবান। সারা জীবন একটির বেশী দুটি নারীর সংসর্গে দিন কাটাননি কখনো। দৈত্য কুলের প্রহ্লাদের মত মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর তালিকায় এ এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। দোষের মধ্যে শুধু একটি। খেতে ভালবাসেন বিস্তর।

আলিবর্দী নবাব হলেন বটে, কিন্তু সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য জুড়ে নেমে এল কালো ছায়া। কালো ছায়া আতঙ্কের। উৎপীড়নের। ধ্বংস। আবার সেই ধ্বংস।

মহারাষ্ট্র জুড়ে জেগেছে মারাঠা জাতি। নেতা তাদের শিবাজী। অসি, ধনুক, মল্লবিদ্যা আর অশ্বারোহণে তাঁর অসাধারণ নিপুণতা। একরাজ্য ধর্মপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে বেঁধে তোলার মহান সংকল্পে, দুঃসাহসী পরিকল্পনায় তিনি পার্বত্য প্রদেশের অন্তরালে দীর্ঘদিন সুকঠিন রণ-সাধনা করেছেন। অসংখ্য তার বর্গী সৈন্য। অসীম তাদের সাহস।

সমস্ত হিন্দুস্থানের হিন্দু তাকিয়ে আছে তাঁর সুগঠিত সংকল্প আর সংগঠিত সেনাবাহিনীর দিকে। এতদিন পরে বুঝি এল ত্রাণকর্তা। এল মানুষের বেশে স্বর্গীয় অবতার।

একের পর এক রাজ্য জয় করে চলেছেন শিবাজী। আজ কঙ্কন। কাল বিজাপুর। পরশু সুরাট লুণ্ঠন। তারপর গোলকুণ্ডা। দেখতে দেখতে সারা দাক্ষিণাত্যে উড়ল মারাঠা জাতির বিজয় নিশান।

কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক ভাবে থেমে গেল সব অগ্রগতি। বড় বড় সর্দার সেনাপতিরা মেতে উঠলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার, স্বার্থসিদ্ধির পারস্পরিক কলহে। দেশপ্রেম নিল লুণ্ঠনের, অরাজকতা সৃষ্টির ভূমিকা।

মারাঠা নায়ক তখন রঘুজী ভোঁসলে। মন্ত্রী পণ্ডিত ভাস্কররাম কোল্হৎকর। কূটবুদ্ধিতে অতুলনীয়। তারা দুজনে ঠিক করলেন বাংলাদেশকে এইবার জয় করে জুড়ে দিতে হবে নাগপুরের সঙ্গে। কি করে সম্ভব হবে সেটা? কেন লুঠপাট জোর জুলুম, হত্যা, অত্যাচার। নাগপুরের এক পাহাড় অঞ্চলের অন্ধকার অরণ্য বার বার শিউরে উঠল এই দুই মারাঠা বীরের গোপন ষড়যন্ত্রে।

শিবাজীর জীবিত কালেই দিল্লীর বাদশা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে রাজস্বের

এক চতুর্থাংশ অথবা চৌথ মারাঠাকে দেওয়া হবে। ভাস্কর পণ্ডিত আলিবর্দীর কাছে চেয়ে পাঠালেন সেটা। আলিবর্দী অস্বীকার করলেন অতীতের অঙ্গীকার। না চৌথ, না সরদেশ মুখ।

সেটা ১৭৪২ সাল। ঘোড়ার খুরে পাথর ফাটিয়ে, নাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চল কাঁপিয়ে, বীরভূম-বিষ্ণুপুরের শালবন ডিঙিয়ে, উড়িষ্যার গিরিনদী পার হয়ে বিশ হাজার বর্গী সেনা নেমে এল বাংলার বুকে। সঙ্গে ২৩ জন সর্দার। আর সেনাপতি তাদের ভাস্কর পণ্ডিত।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব এদের ঠাট্টা করে বলতেন—'পার্বত্য মূষিক'—সেই মূষিকের আক্রমণেই বাংলার গ্রাম, নগর, জনপদ, ফেটে পড়ল এক আকস্মিক চিৎকারে। দুঃস্বপ্নের পর যেন চোখের সামনে দেখছে ছায়া ছায়া মত কি। ছায়া নয়। দুঃস্বপ্ন নয়। ধ্বংস। গ্রাম পুড়ছে। ঘর জ্বলছে। ধনরত্ন হচ্ছে লুঠপাট। মানুষ পালাচ্ছে জন্মভূমির মাটির মায়া কাটিয়ে। দ্বিপ্রহরের চড়চড়ে রোদ। তারই মাঝে উন্মাদিনীর মত প্রাণ ভয়ে ছুটছে গর্ভবতী রমণী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পালাচ্ছে। গলায় দুলছে শালগ্রাম শিলা। বগলে শাস্ত্র-গ্রন্থ। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' এই পলায়নের দ্রুত, খর পদধ্বনি ফুটে উঠেছে প্রতি ছন্দে।—

"তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলাএ কত নিক্তি হড়াপ লইয়া ॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিত্তল লইয়া কাসারী পলাএ কত ॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি ॥
সঙ্ক বণিক পলাএ করাত লইয়া জত।
চতুর্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত ॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল ॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগির পলানে পেটারী লইয়া মাথে ॥

ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলোয়ারের ধনি।
তলোয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ য়মনি॥
গোসাঞি মোহন্ত জত চোপলি-এ চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া॥
চাষা কৈবর্ত্ত জত জা-এ পলাইঞা।
বিচন বলদের পিঠে লাঙ্গল লইয়া॥
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
গর্ভবতী নারী জত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে॥
সিকদার পাটোআরী জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥"

পালাবার পথে যেতে যেতে হঠাৎ চোখের সামনে দু-দশজন লোককে দেখতে পেলেই প্রশ্ন করে, বর্গীদের দেখতে পেলে?

তারা বলে, না হে আমরাও তো পালাচ্ছি। চোখে তো দেখিনি। তবে লোকে পালাচ্ছে দেখেই পালাচ্ছি। কিন্তু পালিয়ে বেশী দূর যেতে হল না। পথের মাঝখানেই এসে পড়ল বর্গীরা।

"এই মত সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাডা।
সোনা রুপা লুঠে নএ আর সব ছাডা॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধ-এ পরাণ॥
ভাল ২ স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জন ধরে
রমণের ডরে ত্রাহি শব্দ করে।
এই মতে বরগি যত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইডা॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধা-এ।

বড় ২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডপ।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব।
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিকে বরগি বেড়াএ লুটিয়া ॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে—লাথি পা-এ জুত চড়া ॥
রুপি দেহ রুপি দেহু বলে বারে বার।
রুপি না পাইয়া তবে নাকে জলে ভার ॥
কাহুকে ডুবায়ে বরগি পথইয়ে ডুবা-এ।
কাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জা-এ ॥"

বর্গীদের হাতে-পিঠে হাল্কা ঢাল। কোমরে তলোয়ার। রক্তে টগবগ করছে পাশব জিঘাংসা। আর তার চেয়েও কঠিন, অস্ত্রের চেয়ে শানিত নির্দেশ রয়েছে মাথার ওপর। সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের হুকুমৎনামা।

"স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলোয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা ॥"

সেই বর্গী-আক্রমণের নৃশংসতা আজও আমাদের দেশে ছেলে-ভুলোনো বা ঘুম পাড়ানো ছড়ার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আমাদের দেশের মা-মাসিরা শিশুদের কানে প্রথম যে গানের কলিটি গেয়ে শোনান—সে এক ধ্বংসের গান। সে ঐ বর্গী-আক্রমণের সুদূরপ্রসারী বিষক্রিয়া।

বালেশ্বর থেকে রাজমহল পর্যন্ত বর্গী-আক্রমণে অস্থির। আজ মেদিনীপুর ডুকরে কাঁদছে। কাল বর্ধমান। ওদিকে হুগলীর আর্তনাদ ভাগিরথীর ঢেউ-এ আছড়ে আছড়ে ছুটে আসছে কলকাতার কিনারে। তখন বর্গীরা শিবপুর থানা-দুর্গ দখল করছে।

আর বৃদ্ধ আলিবর্দী বছরের পর বছর হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই হানাদারী শত্রুর পেছনে পেছনে। কিছুতেই বাগে আনতে পারেন না বর্গীদের। শেষ পর্যন্ত ১৭৪২ সালে যার শুরু হয়েছিল তার একটা সাময়িক নিষ্পত্তি হল ১৭৫১ সালে। সন্ধির সর্তে। বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যা প্রদেশটাকে প্রাপ্য চৌথ হিসেবে মারাঠাদের শাসনাধীনে ছেড়ে দিলেন। শুধু মেদিনীপুরকে ছেঁটে নিয়ে জুড়ে দিলেন বাংলার সঙ্গে।

ভাস্কর পণ্ডিতের মাথা কাটা গেছে তার আগেই। আলিবর্দীর ছলনাজালের ফাঁদটাকে তিনি ভেবেছিলেন সত্যি বুঝি সন্ধি-আলোচনার তাঁবু। যাই হোক্ বাংলাদেশ থেকে মৃত্যু আর রক্তপাত আর হত্যার আতঙ্ক একটু একটু করে ধূসর হতে হতে মুছে যেতে লাগল এইবার।

এতবড় ঘটনার সময়ে কলকাতার গায়ে কিন্তু আঁচড়টিও লাগেনি। বরং হিসেব খতিয়ে দেখা দেখলে বোঝা যাবে—খরচের চেয়ে জমার ঘরেই পরিমাণটা বেশী।

বর্গীরা যখন হুগলী আক্রমণ করেছে—তখন সবাই চারদিক থেকে পালাই পালাই চিৎকারে ছুটে এল কলকাতার দিকে। কলকাতায় ইংরেজ আছে। ইংরেজদের কামান বন্দুক আছে। গোলা-বারুদ আছে। সৈন্য সামন্ত আছে। কেল্লা-দুর্গ আছে। চলো কলকাতায়। আরো সুবিধে কলকাতার এদিকে চারপাশে নিবিড় বন জঙ্গল। ওদিকে নদী। মারাঠারা সহজে কলকাতা আক্রমণ করতে এগোবে না। দেখতে দেখতে কলকাতা শহর দু-দিনে মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেল। হাঁপিয়ে উঠল তার স্বল্প-পরিসর বসতি।

পূর্ববঙ্গ থেকে পলাতক উদ্বাস্তুদের যে-বন্যা যে-জনস্রোত বছরের পর বছর চোখের সামনে দেখে আসছি—সেদিনকার উদ্বাস্তুরা তার কাছে হয়তো অনেক ম্রিয়মান মনে হবে। কিন্তু আজকের তুলনায় সেদিনকার কলকাতাটা মাপে-জোপে ছিল এর সিকিভাগেরও অনেক কম।

মারাঠা আক্রমণের ফলে কলকাতায় ভিড়ই বাড়ল শুধু। চিড় খেল না কিছু। ইংরেজরা তবু নিঃশঙ্ক হতে পারেনি। কেননা এই তো মাত্র ক-বছর আগে ১৭৩৭ সালে প্রবল ঝড়ে, বজ্রাঘাতে, ঘূর্ণীর ঘায়ে কী নিদারুণ ক্ষয় ক্ষতি হয়ে গেল। জীবনে ভোলবার নয় সে প্রলয়। গঙ্গার জল ৪০ ফিট উঁচুতে ঘাড় তুলে দাঁড়াল। গর্জন শুনে মনে হয়—পৃথিবীকে এক নিমেষে গ্রাস করবে বুঝি সে এখনি। বৃষ্টি আর বন্যায় পথ-ঘাট বাড়ি-ঘর ডুবুডুবু। মাটির দেয়াল কাদা হয়ে মিশে গেছে নদীর ঘোলা জলে। পাকা বাড়ি কাটা-সৈনিকের মত চৌচির হয়ে জলে কাদায় লুটিয়ে পড়ে আছে। এদিক দিয়ে মরা হরিণ, হাঁস, মুর্গি, ওদিক দিয়ে বাঘ, ভাল্লুক, শুয়োর, কুমীর ভেসে চলেছে পচে, পেট ফুলে, দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে। নোঙ্গর ফেলা জাহাজের নোঙ্গর পড়ে আছে। জাহাজ নেই। পানসি ডিঙি কুটোর মত তলিয়ে গেল নদীর তলায়। জাহাজ বলতে এক আধটা নয়। ছোট বড় মাঝারী মিলিয়ে

২৯টা। শুধু টিকে গেল একটা। ডিউক অফ ডর্সেট। সেণ্ট অ্যান গির্জার আকাশস্পর্শী চূড়োটাও ভেঙে তছনছ।

সেই ভাঙা, নড়বড়ে, নিস্তেজ কলকাতাকে কত কষ্টে, কত দান খয়রাৎ করে মেরামত করতে হয়েছে। আবার যদি ধ্বংস হয় এই মারাঠা আক্রমণে—তাহলে কোম্পানীর ব্যবসা গুটোতে আর বেশী দিন লাগবে না।

তাড়াতাড়ি একটা উপায় ঠাওরাও। কিসে শহর বাঁচে মারাঠার মারের হাত থেকে।

উপায় বেরুলো। পয়লা নম্বর উপায় হচ্ছে শহরের চারপাশে একটা গভীর খাদ খোঁড়া হোক। শত্রুরা সহজে টুঁ মারতে পারবে না। সবাই বললে, বহুৎ আচ্ছা।

দ্বিতীয় নম্বর প্ল্যান হল, শহরের ভেতরে শত্রুরা যে যে পথ দিয়ে মাথা গলাবে—সেই সেই জায়গায় কামান-ঘাঁটি বানানো যাক্। একদিকে রইল ঝোপ। আর এই জলপথ বা নদীপথের দিকে থাক তোপ্। সবাই বললে—সাবাস্ কিয়া।

তৃতীয় নম্বর বুদ্ধি বাতলালেন একজন, গোটা সাহেব পাড়াটাকে শক্ত কাঠের রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া যাক্। দেশী লোকদের কি দশা হবে সেকথা ভেবে আমাদের কি লাভ? আমরা বাঁচলেই কলকাতা বাঁচবে।

এইবার একে একে প্ল্যান-মাফিক কাজ শুরু হয়ে গেল। সেই সঙ্গে নবাব আলিবর্দীর কাছে একটা আর্জিও পাঠান হল। তাতে ইংরেজদের পুরনো কেল্লাটাকে যাতে আরেকটু মজবুত করা যায় তার জন্যে বিনীত প্রার্থনা।

আলিবর্দী খাদ্ খুঁড়তে অনুমতি দিলেন। কিন্তু দুর্গের দুর্গতিনাশের ব্যাপারে চোখ রাঙালেন। দিনরাত তোমাদের এত দুর্গ দুর্গ করে চেঁচানো কিসের হে! আমার দেশ। আমার রাজত্ব। আমি থাকতে তোমাদের খুব বেশী না ভাবলেও চলবে। ইংরেজরা চুপ করে গেল।

খাদ খোঁড়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। মোট পরিধি হবে সাত মাইল। চওড়া হবে একুশ হাত। টাকা লাগবে কম পক্ষে পঁচিশ হাজার। টাকা আসবে কোথা থেকে? কেন দেশী লোকদের ট্যাঁক থেকে। আপাতত কাউন্সিল টাকা দেবে কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্যে। দেশীয় লোকদের তিন মাস পরে কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিতে হবে টাকাটা।

খাদ খোঁড়ার কাজ বেশী দূর এগোয়নি। অর্ধেকটা হয়েছে। এমন সময়

মারাঠাদের দাপাদাপিটা আলিবর্দীর দাপটে যেন খানিকটা নিভে এল। উত্তর দিকের বাগবাজার থেকে দক্ষিণ দিকের হেস্টিংস স্ট্রীট, তখনকার কুলিবাজার,—পর্যন্ত খালের বিস্তৃতির পরিকল্পনা ছিল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিন মাইল খোড়া হবার পর এণ্টালির কাছ বরাবর গিয়ে কাজ বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম দিকে ঠিক ছিল যে এই খাদ একেবারে নাকের সিধে ধরে এগোবে। কিন্তু হালসী বাগানের উমিচাঁদ আর ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দ-রাম মিত্রের বাগানবাড়ির সামনে পর্যন্ত এসে খাদটা পেট-বাঁক নিল। এঁরা দুজন তখন দেশীয়দের মধ্যে সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইংরেজদের দরদী-মরমী। যাকে বলে আঁতের লোক।

এই খাদকেই সেকালে বলা হত 'মারাঠা ডিচ'। এই ডিচকে কেন্দ্র করেই সেকালের কলকাতার সীমানা ছিল—পূর্বদিকে মফস্বল। পশ্চিমে শহর।

খাদ খুঁড়তে খুঁড়তেই বর্গীর হাঙ্গামা থিতিয়ে এল। খাদও আর এগোলো না। তারপর বহু বছর ধরে ঐ খাদের ভেতরেই শহরের যাবতীয় ময়লা, আবর্জনা ফেলা হত। লর্ড ওয়েলেসলীর সময়ে এই খাদ বুজিয়ে ফেলার হুকুম হল। খাদের ওপর মাটি ফেলে ভরাট করতে করতে দেখা হল দিব্যি চওড়া ছাতিওলা এক রাস্তা হয়ে গেল যে! সত্যি সত্যিই রাস্তা হয়ে গেল সেটা। নাম হল সার্কুলার রোড। আপার আর লোয়ার।

এর পর আসছে দু-নম্বর প্ল্যান। কামান-বন্দুকের পাহারা। শহরের একেবারে উত্তর দিকে বসল একটা ঘাঁটি; চার কামানের। পেরিন সাহেবের বাগান সেখানে। সাহেবদের হাওয়া খাওয়ার জায়গা। আরেকটা ঘাঁটি বসলো জোড়াবাগানে। ছ-কামানের।

দক্ষিণ দিকে গোবিন্দপুর আর কলকাতার মাঝামাঝি জায়গায় ঘাঁটি বসল আরেকটা। সেটা চার কামানের।

এত করেও ভয় যায় কই? তার চেয়ে বাবা সাবধানের মার নেই। একটু বেশী করেই সাবধান হওয়া যাক্।

কাঠ এল রাশি রাশি। সাহেব পাড়া রণরণিয়ে উঠল কোদাল, কুড়ুল, করাতের কোরাসে। কি হচ্ছে? না কাঠের রেলিং বানানো হচ্ছে।

পলাশী যুদ্ধের আগে সাহেব পাড়া বলতে বোঝাতো ডালহাউসী স্কোয়ারকে কেন্দ্র করে যে অঞ্চলটুকু। চৌরঙ্গী তখনো যে জংলীকে সেই জংলী।

তখন মিশন রো-র কাছে একটা থিয়েটার ঘর। রাইটার্স বিল্ডিং-এর পেছন

দিকে আরেকটা।

তখন লাল দিঘীর পাশে আরেকটা ছোট্ট পুকুর ছিল। তার পাড়ে ছিল কোম্পানীর কর্মচারী কালিকো-প্রিণ্টারদের কোয়ার্টার। কোয়ার্টার মানে ছোট্ট ছোট মেটে কি কোঠা বাড়ি। এই সব কোয়ার্টার পেরিয়ে দু-পা বাড়ালেই যে বাড়িটা—সেটা পলাশী আমলের পাদ্‌রি বেলামী সাহেবের। আরেকটু এগোলেই একটা খোলা-মেলা জায়গা। সেটার শেষেই কোম্পানীর আস্তাবল। আস্তাবল আর হাঁসপাতাল প্রায় গায়ে গায়ে। হাঁসপাতালের গায়ে গায়ে পাউডার-ম্যাগাজিন। অর্থাৎ বারুদ-ঘর। বারুদ-ঘর ছাড়িয়েছ কি গোরস্থান। কলকাতার সবচেয়ে আদি গোরস্থান। এরই পাশের জমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সেণ্ট জন গির্জা।

এরই কাছাকাছি বাড়ি হলওয়েলের। মেটকাফ থাকেন তারই পাশে। মেটকাফের বাড়িটা আগে ছিল শেঠেদের। কোম্পানীর সবচেয়ে প্রিয় দালালের। তাই সাহেব পাড়ায় তাঁকে মাথা গলাবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই সুযোগ বা সম্মান পেয়েছিল আরেকজন। তিনি উমিচাঁদ। চীনে বাজারের কাছে লিয়ন্স রেঞ্জের গাষেই তাঁর বাড়ি। বাড়ি তো নয় অট্টালিকা। একটা নয় তাও। তিন তিনটে।

লালদিঘীর উত্তর দিকে সেণ্ট অ্যান গির্জা পেরোলে মিঃ এডওয়ার্ড আয়ার-এর বাড়ি। তার পিছনে মিঃ কুকের। এই মিঃ কুকই ঐতিহাসিক অর্মি-সাহেবকে অন্ধকূপ হত্যার (?) অনেক তথ্য সরবরাহ করেন।

ওয়াটস্‌ সাহেব একটু স্বতন্ত্র। তিনি থাকেন নদীর দিকে। ফাঁকায় ফাঁকায়। ভিড়-ভেজালটা তাঁর মেজাজে সয় না।

আজকাল আমরা যে স্ট্রাণ্ড রোড দেখি—যার মাথার ওপর দিয়ে নতুন হাওড়া ব্রীজের চুড়োটা দু-চোখের লাল তারা মেলে কলকাতার রাত্রের অন্ধকারে কি যেন দেখে অবাক হয়, যার পায়ের তলায় গঙ্গার ঢেউ জাহাজের পেটে কাতুকুতু দিয়ে, ডিঙি নৌকার গায়ে আচমকা ঠেলা মেরে খলখল হেসে ছুটে পালায়—সেই স্ট্রাণ্ড রোড তখন ভাগিরথীর গর্ভে। কলকাতার প্রাচীন দুর্গের পাশ দিয়ে আর গঙ্গার ধার ঘেঁষে সরু একফালি রাস্তা ছিল বটে, কিন্তু সেটা স্ট্রাণ্ড রোড নয়। সেই রাস্তার পেছনে ইংরেজদের বাগানবাড়ি, দুর্গের মাল গুদামের একাংশ, জাহাজ মেরামতের ছোট্ট একটা ডক্ ছিল। হেস্টিংস স্ট্রীট তখন খাল। খাল মানে যেমন তেমন নয়। ১৭৩৭ সালের ঝড়ে এই খালেই একটা

প্রকাণ্ড জাহাজ ডুবে গিয়েছিল।

ফ্যান্সী লেন আর ওয়েলেসলী স্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই ফ্যান্সী লেনের জন্ম কাহিনীটা বড় মর্মান্তিক। মুসলমান রাজত্বে ফাঁসীর দড়ি দিয়ে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হত না। ইংরেজ রাজত্বেই এর শুরু। আর ওয়েলেসলীর বটগাছটাই ছিল তখন ফাঁসী-কাঠ। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই ফাঁসী কথাটা থেকেই ফ্যান্সী নামটার উৎপত্তি হয়েছে।

সেকালে 'মিশন রো'র নাম ছিল Rope-walk. ১৭৭৫ সালে এখানে একটা গির্জা তৈরি হয়। তারপর থেকেই ঐ নাম।

ইংরেজি আওতার কলকাতায় নবাবী আমলের কায়দা-মাফিক ফৌজদারী বালাখানাও ছিল একটা। লোয়ার চিৎপুর আর কলুটোলার মোড়ে। ফৌজ-দারী বালাখানা মানে হুগলীর ফৌজদারের কাছারী। দেশীয়দের মামলা মোকর্দমার বিচারক তিনিই। বিরাট জমজমাট, জাঁকাল ধরনের কাছারী। হুগলী থেকে একজন ফৌজদার এলে ইংরেজদের মধ্যে সোরগোল পড়ে যেত কেমন করে এই দেশীয় প্রভুর মনোরঞ্জন করা যায়। উপহার—উপঢৌকনের নৈবেদ্য আর নগদ টাকার দক্ষিণায় সে যেন এক ষোড়শপচারের পুজো।

মোটামুটি ভাবে ইংরেজি পাড়া বা ইংরেজি টোলার শেষ এইখানে। এর পরেই পর্তুগীজ আর আর্মানী-টোলার শুরু। এদিকে মুর্গিহাটার কাছ থেকে ওদিকে বড়বাজার আর তারই আওতায় গোরস্থান পর্যন্ত বিরাট জায়গা জুড়ে পর্তুগীজ আর আর্মানীদের ভিটে-মাটি। এরই ভেতরে তখন অনেকগুলো সাধারণের ব্যবহারের জন্যে স্নানাগার ছিল। এই স্নানাগারকে বলা হত হামাম। সেই থেকেই হামাম গলির জন্ম। তাদের বাণিজ্য বা জীবিকার্জন সব কিছুই ইংরেজদের সঙ্গে বা ইংরেজদের অধীনে। বেশীর ভাগ পর্তুগীজ বা আর্মানী তখন ইংরেজ বাড়িতে ঝি-চাকরের চাকরি নিয়ে জীবন কাটাতো।

এ তো গেল শুধু সাহেবদের কথা। দেশীয়দের কি দশা হল দেখা যাক।

কি আর হবে? কিছুই না, সব যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল। মারাঠারা তো কোনদিনই কলকাতা আক্রমণ করেনি। তারা নিরীহ প্রজাপাঠকদের ওপর যতই তলোয়ারের ধার পরখ করুক, এটা বেশ হাড়ে হাড়েই বুঝতো ইংরেজদের একটা কামান যদি একবার নাক ঝাড়া দেয়—নস্যির মত উড়ে

যাবে তারা দশ-বিশ-পঞ্চাশটা। সুতরাং কাজ নেই শক্ত ঘাঁটিয়ে। ঘাঁটির ঠেলা এমনিই।

মাঝখান থেকে হল কি দেশীয় পাড়ায় আর লোক ধরে না। বসবাসের জায়গা নিয়ে দর-কষাকষি, মন-কষাকষি। বসবাসের না হোক্ বনবাসের মত একটু আশ্রয় পেলেই প্রাণ বাঁচে অনেকের।

বড়বাজার লোকে লোকে গাদাগাদি। সুতানুটির দিকটাও ক্রমশ ভরে যাচ্ছে। গঙ্গার ধারে কাছে আদিবাসী বাসিন্দের পাড়া। জেলে-জোংলা চাষাভুষোদের ঘর গেরস্তালি। জনস্রোত সেই দিকেই ঠেলা মারল। জনমানবহীন শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে উঠল জনপদের পদমর্যাদায়। জোড়াবাগান, কুমারটুলী, হাটখোলা, বাগবাজার, জোড়াসাঁকো, এমনি আরও নানা অঞ্চল দেখতে দেখতে দু-দিনেই চেহারা পাল্টে ধোপ-দুরস্ত পরিবেশে ঝলমলিয়ে উঠল। এক এক অঞ্চলে এক একটা বাজার। শ্যামবাজার, বাগবাজার, শোভা বাজার, নতুন বাজার, হাটখোলা বাজার, চার্লস বাজার, বেগ বাজার, ঘাসতলা বাজার।

পাড়াগুলোর নাম হয় যে পাড়ায় যে সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে তাদের ভিত্তি করে। তেলের ব্যবসায়ীরা যেখানটায় জোট বেঁধে বাস করে তার নাম কলুটোলা। মুচিদের পাড়াটা মুচিপাড়া। কুমোররা হাঁড়ি গড়তে গড়তে কুমোর-টুলী গড়ল। এই ভাবে এল দাইপাড়া, আহিরীটোলা, জেলেটোলা, পটুয়াটোলা, কাঁসারীপাড়া, ঢুলীপাড়া, তাঁতীবাগান, নাথবাগান, কসাইটোলা আরও অনেক।

ক্রমশ কেতাদুরস্ত হচ্ছে কলকাতা। গ্রামের গন্ধ গা থেকে একটু একটু করে মুচছে। শহরের সৌখিনতা বেদখল করছে সেই খালি জায়গা। নাচ গান, উৎসব, পুজো-আচ্চার ধুমধাম রোজই লেগে আছে। দোল, দুর্গোৎসব চড়ক, রাসযাত্রা ইত্যাদি যে সময়ের যে পার্বণ—সে সময়ে সেটির কমতি নেই। কেনই বা হবে! টাকার জন্যে ভাবতে হয় না। কোম্পানীর রাজত্বে খাটতে জানলে আর খুঁটতে জানলে ভাতের অভাব নেই। টাকা আপনি এসে হাতের মুঠোয় ধরা দেয়। টাকা হলে কি হবে ইংরেজ বেটাদের ভারী কড়া শাসন। যা ইচ্ছে তা করবার জো নেই। পাকা বাড়ি তুলবে? তার জন্যে কোম্পানীর অনুমতি চাই। আবার পাকা বাড়ি উঠলেও নিস্তার নেই। চোরে ডাকাতে অমনি নজর দিতে শুরু করবে। তাদের মরচে

পড়া সিঁদকাঠিতে লালসার শান পড়বে সঙ্গে সঙ্গে। আরেকদিকে ইংরেজ। ট্যাক্স দাও। তোমার তো বেশ টাকা-পয়সা হয়েছে হে।
মুর্শিদকুলীর আমলে কলকাতায় খাজনা উঠত চার হাজার। কোম্পানীর আমলে হল সতেরো হাজার। এ ছাড়া ট্যাক্স বা অন্যান্য কর থেকে আরো নব্বুই হাজার বাড়ল। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কলকাতার বাসিন্দেরা কি রকম পয়সা কামাতো।
পয়সা যে সব সময় সৎ-পথ দিয়ে সোজাভাবে আসতো তা নয়। ঘুষ-ঘাষ, উপরি পাওনা, দালালী এমনি আরও কত আঁকা বাঁকা গলি ঘুঁজি ডিঙিয়ে উড়ো খৈ-এর মত উড়ে উড়েও আসতো। এই সব উড়ে-খৈ কিছুটা গোবিন্দায় নমঃ না করলে কি হয়। তাই আনন্দ-উৎসবের এত আড়ম্বর।
কলকাতায় তখন যে রথের মেলা বসতো সে এক দেখবার জিনিস। রথ কি আবার এক রকমের। রকমারী, রংদারী। বৈঠকখানার রথের উচ্চতা ছিল ৭০ ফিট। লালদিঘী থেকে বৌবাজার-এর সোজা সড়ক ধরে এই রথ টানা হত। আর বাকী সারা বছর বৈঠকখানার বিরাট বটগাছের তলায় চওড়া বুকে রোদ বৃষ্টি আটকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত অচল অটল।
এই রথের প্রতিষ্ঠাতা কলকাতার শেঠেরা। নাম ছিল গোবিন্দজীর রথ। কেউ বলেন ওটা বসাকদের। কেননা থাকতো চৈতন্য চরণ বসাকের বাগানে। শোভারাম বসাক এই রথের প্রতিষ্ঠাতা।
এই শোভারামেরই এক পুত্রবধূর নামে বৈঠকখানার কাছে একটা বাজার ছিল। তারই নাম বৌবাজার। বৌবাজার স্ট্রীট সেই বধূমাতারই স্মৃতিপথ।
পোস্তার জগন্নাথ দেবের রথ ছিল তিনটে। গরানহাটার কালাবাবুর বাড়ির উঠোনে সারা বছরের আশ্রয়। আকারে ৭০ ফিট না হলেও রথগুলো মাপে জোপে জমকালোই ছিল।
রথ চলেছে আগে আগে। পিছনে চার পাশের গ্রাম-গঞ্জের মানুষ। বামুন পুরোহিত। বাজনা বাদ্যি। সকলের হাতে রং-চঙে পতাকা। কারো হাতে ঝালর-ঝুলোনো ছাতা। ইয়া বড় বড় তাল পাতার পাখা। পাখার গায়ে কত কি কারুকার্য। এদিকে মশাল। কোনটা কাপড়ের, কোনটা নারকেলের শাঁসের। আবার রংমশালও জ্বলছে। ওদিকে চলেছে সংকীর্তন। সপ্তাহব্যাপী উৎসব।

রথের উৎসব অনেক দিন। দোল একদিনেই শেষ। কিন্তু সেই একদিনের দাপটেই সারা শহর দুলে উঠতো। দোলের পিচকিরির কাছে ছোট-বড়, মান্য-অমান্য, স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই। ছুঁড়লেই হল। রং-এর বেলায় ছোঁড়া। আবীর আর কুমকুমের বেলায় ছড়ানো। মিছিল করে দল বেঁধে বেরুত সবাই। সকলের গলাতেই গান। চিৎকারটাই বেশী। দোলের উৎসবটা সবচেয়ে বেশী জাঁকাতো লালদিঘীর কাছে। তার পশ্চিমে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী বাড়ি। শ্যাম রায়ের মন্দির। দোলের দিনে মন্দিরের কাছে দোলমঞ্চ তৈরি হত। উত্তর দক্ষিণ দু-দিকে দুটো। দক্ষিণে শ্যাম রায়। উত্তরে রাধিকা। গ্রামের চাষা-ভুষো, রাখাল ছেলেরা এক পক্ষ শ্যাম আরেক পক্ষ রাধা সেজে পরস্পর আবীর ছোঁড়া-ছুঁড়ি করতো। লালদিঘীর জল এই আবীর মেখে রাঙা হয়ে উঠতো বলেই তার নাম হয় লালদিঘী—সে কথা আগেই বলেছি। পথের চারপাশে আবীরের স্তূপ জমে থাকতো—সেই থেকে লালদিঘীর পাশের রাস্তাটার নাম হল—লালবাজার। আর রাধামাইজীর নাম থেকে রাধা বাজার।

এক যায় আর আসে। দোলের সোরগোল মিটল। দুর্গোৎসব বললে—এ আর এমন কি! আমার চেহারা দেখলে তো চোখ কপালে উঠবে। গোবিন্দরাম মিত্রের তখন রাজার হাল। তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসবের কী ঘটা। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে নবকৃষ্ণের বাড়িতেও নিয়মিত দুর্গোৎসব শুরু হল। এবং গোবিন্দরামকে হারিয়ে তাঁরটাই হল দুর্গোৎসবের সেরা। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলতো নবকৃষ্ণের দুর্গোৎসব হচ্ছে পলাশী যুদ্ধের স্মৃতি-উৎসব।

দোলের খেলা চলতো রক্তের মত লাল আবীর নিয়ে। দুর্গোৎসব তার চেয়ে অনেক বাস্তব। তার খেলা সত্যিকারের রক্ত নিয়ে। জয় মিত্রের বাড়িতে নবমীর দিন অসংখ্য মহিষ, ছাগল, মেষ বলিদান দেওয়া হত। বলিদানের পর পথে পথে বেরুত মিছিল। সারা গায়ে রক্ত মাখা মানুষের নাচ, গান, বাজনা-বাদ্যির মিছিল।

দুর্গোৎসব যেমন রক্ত-মাখার উৎসব, জন্মাষ্টমী তেমনি কাদা-মাখার। শুধু কাদা নয়। দই আর কাদা। এই দধি-কর্দমে গড়াগড়ি দিয়ে সবাই যেতো গঙ্গাস্নানে। নৃত্য গীতের কথা বলা বাহুল্য।

তবে উৎসবের মধ্যে যদি কোনটা রসের উৎসব থাকে তো সেটা রাস। কল-কাতায় রাসোৎসবের প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঠাকুর্দা রাজা

পিতাম্বর মিত্রকে। বাগবাজারের গোকুল মিত্রের বাড়িতেও বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগে আছে। তার মধ্যে রাসলীলাটাই সবচেয়ে সরেস বা সরস ছিল। মিত্রদের ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণে ছিল এক দিঘী। সেই দিঘীতে নৌকোয় চেপে মেয়েদের কবিগান হত। সং-তামাসা, রং-তামাসা রসিয়ে উঠতো কি জলে কি ডাঙায়। রাধাকৃষ্ণের নানারকম চিত্র-বিচিত্র দিয়ে সাজানো হত ঠাকুরবাড়ি।

আহিরীটোলায় নিমু গোঁসাই-এর বাড়ি। তাঁর বাড়িতে রাস হত চৈত্র মাসে। বলরামের রাস। সকলের থেকে আলাদা এ এক অভিনব রাস। একটা লৌকিক ছড়া আছে তাঁর প্রসঙ্গে।

"জন্ম মধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাস।"

পরবের মধ্যে সবচেয়ে সরব হচ্ছে গাজন। গাজন আর চড়কের দিনগুলো ঢাকের বাদ্যিতে সদাসর্বদা রন রন। অন্য সব পরব বড়লোকদের। কিন্তু গাজন বলো কি চড়ক বলো—এ হচ্ছে জনসাধারণের। আর সব উৎসব হয় ধনীদের দালানে। গাজন জমে হাটে বাজারে, অলিতে-গলিতে, পাড়ায় পাড়ায়।

গাজনের দুটো বিশেষ অনুষ্ঠান হচ্ছে—বানফোঁড়া আর ঝাঁপ। বড় বড় মোটা-সোটা বঁড়শী দিয়ে গাজন-সন্নেসীদের ফোঁড়া হত। সন্নেসীরা সূর্য উঠার আগে না খেয়ে, না দেয়ে কালীঘাটে গিয়ে বান ফুঁড়িয়ে আসতো। আর ঝাঁপ ছিল নানা রকমের। কাঁটা-ঝাঁপ, ঝুল-ঝাঁপ, বঁটি-ঝাঁপ। ১৮৮৩ সালের আইনে এই নিষ্ঠুর আমোদ বন্ধ করা হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বেরুত সং। কাঁসারী পাড়ায় তারকনাথ প্রামানিকের উৎসাহে কাঁসারী পাড়ার সঙের মিছিল সেকালে খুব নাম কিনেছিল।

এত সবের পরেও আরো অনেক বাকী আছে। জগদ্ধাত্রী পুজো, সরস্বতী পুজো, গনেশ পুজো, বৃষ্টি আনাবার পুজো, শ্যামা পুজো আরো কত কি। এমন কি যখন আর কোন পুজো নেই তখন কি মানুষ আমোদ-আহ্লাদ হারিয়ে ঘরের কোণে ঘুপটি মেরে বসে থাকবে নাকি? তা কি হয়। কানে এল কোথায় যেন সতীদাহ হচ্ছে। অমনি রব উঠল—চলো, চলো, দেখে আসি চলো।

দাউ দাউ আগুনের চিতার ওপরে একটা পূর্ণ-যৌবনা নারী ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরবে। এ ওর হাত ধরে, ও এর গলা জড়িয়ে, হেসে, ইয়ার্কি-ঠাট্টা

করে সবাই তাই দেখছে। তার মধ্যে সাহেবও আছে, নায়েবও আছে। ছোট-বড়, জাত-বেজাতের ভেদ-সীমা নেই।

কিন্তু ওপরে যা কিছু আমোদ-উৎসবের লম্বা ফর্দ ফাঁদা হল তার সবই হচ্ছে সাময়িক। এক এক ঋতুতে এক একটা আসে। আসে আর ফুরিয়ে যায়। কিন্তু চিরকাল থাকে শুধু একটা। কালী পুজো। আঠারো শতকের কলকাতায় কালী পুজোর মন্দির যেদিকে তাকাবে চোখে পড়বে।

ফিরিঙ্গী পাড়ায় যাও। সেখানে 'ফিরিঙ্গী কালী'র মন্দির। বাগবাজারের গঙ্গার ধারের দিকে এগোও। চিত্রেশ্বরীর মন্দির। এখানকার বনে জঙ্গলে একদল কাপালিক আর সন্ন্যাসীর গুপ্ত ঘাঁটি ছিল। তাদের পেশা ছিল ডাকাতি। নেশা ছিল রোজ প্রহর রাত্রে এই মন্দিরে কালীমায়ের সামনে নর বলি দেওয়া। তারপর সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। হলওয়েলের সময়ে—১৭৩০ সালের কাছাকাছি—গোবিন্দরাম এটা তৈরি করেছিলেন। ১৮২০ সালের ভূমিকম্পে সেটা ভেঙে যায়। এই মন্দিরের উচ্চতা নাকি মনুমেণ্টের চেয়েও বেশী—এমন কথা পুঁথির পাতায় আছে। গোবিন্দরাম মিত্র তখন কলকাতার ব্ল্যাক-জমিদার। তাই তাঁর মন্দিরটারও নাম দিয়েছিল সাহেবরা 'ব্ল্যাক-প্যাগোডা'। এ ছাড়াও আছে পোস্তার কালী মন্দির।

কালী বাড়ির দরজা সব সময়েই খোলা। কালী বাড়ির দালান কোন সময়েই খালি পড়ে নেই। শুধু যে দেশীয়রাই এখানে ভিড় করে তা নয়। ইংরেজরাও একটা কিছু ঘটলেই পুজোর উপচার নিয়ে উপস্থিত। পুরুতরা এই সময়ে সাহেবদের কাছ থেকে মোটা দক্ষিণা বাগিয়েছে।

হিন্দুদের যেমন মন্দির—ইংরেজদের তেমনি গির্জা। আমাদের পুজো, ওদের উপাসনা। পলাশী যুদ্ধের আগের কলকাতায় হিন্দুদের কালী বাড়ির মত ইংরেজদের গির্জাও জাঁকজমকে কম ছিল না। কলকাতার প্রথম খ্রীষ্ট-উপাসনাগার হচ্ছে—সেণ্ট অ্যান গির্জা। ১৭০৯ (১৭১৬ ?) সালে সাধারণ ইংরেজের চাঁদায় আর কোম্পানীর এক হাজার টাকা মিলিয়ে এই গির্জা তৈরি হয়। চলতি কথায় একে বলা হত ফোর্ট উইলিয়মের গির্জা। ১৭৩৭ সালের ঝড়ে তার চূড়ো ভাঙে। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময়ে সেটা ধ্বংস হয়।

আমোদ-উৎসবে, পুজোয় আর উপাসনায় কলকাতা বর্গী আক্রমণের পর বছর চার-পাঁচ বেশ বহাল তবিয়তেই কাটাল। এই কটা বছরে কলকাতার

বরাতে শ্রী সৌষ্ঠব, ধন জন এবং লক্ষ্মী সবই একে একে জুটল। যদিও কলকাতার বাসিন্দেদের মনে তখনও কলকাতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এ যেন পদ্মপাতার জল। টলমল করছে। ঠেলা লাগলেই খসে পড়বে। ইংরেজরা এখন জাঁকিয়ে বসেছে। কাল যদি গুঁতো দেয় নবাব, বাপ্ বাপ্ বলে হয়তো পালাবে সবাই।

অনিশ্চয়তা ঠিকই। তবুও এ যেন এক নতুন রাজ্য। নতুন দেশ। মনের সুখকে এখানে ইচ্ছেমত খেলিয়ে বেড়ানো যায়। নবাবী শাসনের নিষ্ঠুরতা এখানে ছায়া ফেলেনি। সভ্যতার প্যাটার্ন এখানে কত আধুনিক! ইংরেজরা কত ভদ্র! নবাব বাদশা উচ্ছন্নে যাক্। বর্গীরা মরুক। ইংরেজরা দীর্ঘজীবী হোক কেবল।

কিন্তু এই শান্তি, আমোদ-উৎসবের দিন ক-দিন আর! ইতিহাস পাশ ফিরবে যে। সে তো সোজা পথে এগোবে না। আঁকবে-বাঁকবে। ভাঙবে চুরবে। তার অস্থির পায়ের চাপে শান্তি দলা পাকাবে। মোচড় দিয়ে কুণ্ডলী পাকাবে সুখ। চলতি জীবনের পথ ঘাট ঝটপটিয়ে উঠবে ঝড়ে। ইতিহাস এগোবে সময়ের এই করুণ যন্ত্রণার মাঝখান দিয়ে। যন্ত্রণা নয়। ধ্বংস। সেই কালো ছায়া। আব ভয়। আর যুদ্ধ।

ইতিহাসের এক জন্মান্তরের অধ্যায় শুরু হবে এবার।
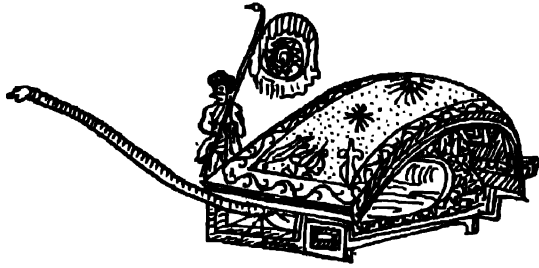
॥ আলিনগর ঃ খালিনগর ॥

নবাব আলিবর্দী খাঁর বড় আদরের দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। আমিনা বেগম তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা। সেই কন্যার সন্তান সিরাজ। নিজের হাতে গড়ে পিঠে মানুষ করেছেন তাঁকে আলিবর্দী। জন্ম থেকেই সিরাজ অকুতোভয়। সাহসী মন। কিন্তু মেজাজটা বড় সৌখিন। বিলাসিতার দিকে নজরটা একটু বেশী। একটু যেন উগ্র—ঔদ্ধত্য মিশে আছে স্বভাবের সঙ্গে। নিজের খেয়াল খুশি মত যা ইচ্ছে তাই করে বেড়ান। আলিবর্দী শাসন করেন বটে। কিন্তু তাতে স্নেহের সুরটাই বাজে বেশী। সিরাজ দাদুকে চেনেন। আর দাদুই যখন তাঁর সহায়—তখন কাকে আর তোয়াক্কা।

মৃত্যুর কিছু আগে আলিবর্দী পড়লেন মহা-ফাঁপরে। মৃত্যুর পর সিংহাসন দিয়ে যাবেন কাকে? বড় মেয়ে ঘসেটি বেগমের ছেলেপুলে কেউ নেই। সিরাজের ছোট ভাই আক্রামউদ্দৌলা তাঁর পুষ্যিপুত্র। তাকে? কিন্তু শৈশবেই আক্রাম মারা গেল বসন্ত রোগে। ছোট জামাই জৈনউদ্দিন—সেও বহুদিন গতায়ু। আক্রামের মৃত্যু-শোক আলিবর্দীর বড় জামাই নোয়াজিশ খাঁ সইতে পারলেন না। বড় জামাইয়ের পিছু পিছু দু-এক মাসের

তফাতে মারা গেলেন মেজ জামাই সৈয়দ আহম্মদ। আছে একমাত্র সেজো মেয়ের ছেলে শৌকতজঙ্গ। কিন্তু সে তো আবার পূর্ণিয়ার নবাব। তাহলে সিংহাসনের ভার কার হাতে তুলে দেবো? সিরাজ—সে তো ছেলেমানুষ। অক্ষম। রাজ-কাজ কিছু বোঝে না। বাঈজীর বাড়ি রাত কাটায়। সিংহাসনের গুরুভার তার হাতে তুলে দেওয়া যায় কি করে? দেশের সাধারণ লোক তার ওপর চটা। তারা বলে সিরাজ অত্যাচারী। সিরাজ কামাতুর। নারীমাংস-প্রিয়। সিরাজ কি সত্যিই অত্যাচারী! আলিবর্দীর বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, অত্যাচারী নয়?

সত্যিই একবার দাদুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছিলেন সিরাজ। দাদুকে লিখলেন—"বালকের ন্যায় আমাকে আর ভোলাতে পারবেন না। আপনি আমাকে অনেক সময়েই বানানো আদরে, বাহ্যিক স্তোকবাক্যে ভুলিয়েছেন। আমার পিতৃব্য-দের রাজপদ দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন। এই বিবাদে হয় আপনার মাথা আমার ঘরে, নয়তো আমার মাথা আপনার পদতলে ঠাঁই নেবে। সেইটেই শেষ মীমাংসা। আমার নিজের বলে নিজের নায্য দাবি আদায় করতে চাই। আপনার বাধা দেওয়া উচিত নয়। সিরাজ"

জ্ঞানোদয়ের পর থেকেই সিরাজের মনে গভীর সন্দেহ ছিল দাদুর এত ভাল-বাসা, এত স্নেহ, ক্ষমার আতিশয্য এ হয়তো তাকে ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করারই একটা কৌশল। তাই সিরাজের যখনই মনে হত ঐ লোকটা দাদুর খুব প্রিয়, তাকেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা করতেন তিনি। হোসেন কুলি খাঁ-র মৃত্যুর পিছনে এই সন্দেহটাই আসল—অনেকে তাই মনে করেন।

সে যাই হোক, সিরাজ একা নন, সসৈন্যে পূর্ণিয়া দখল করতে বেরিয়েছেন। তার আগে দাদুকে এই চিঠি লেখা।

নবাব আলিবর্দী প্রত্যুত্তর দিলেন।—

> "গাজিকে পায়ে সাহাদাৎ আন্দার্ তাগো পোস্ত।
> গাফেল কে শাহীদে এস্ক্ ফাজেল্ তার্ আজ্ দোস্ত।
> ফার্দায় কেয়ামাৎ ইঁ বা আঁ কায়মানাদ্
> ই কোস্তা দুষ্মানাস্ত ওঁ কোস্তায়ে দোস্ত।"

অর্থাৎ—ধর্মের জন্যে যুদ্ধ করে যারা প্রাণ দেয় তারা জানে না যে সংসারের রণক্ষেত্রে স্নেহের সঙ্গে যুদ্ধ করা কত গুরুতর। এই যুদ্ধে যে জয়ী হয়,

সেই সবচেয়ে বড় বীর। নির্বোধ! তুমি ভ্রান্ত, নইলে তুমি অনায়াসেই বুঝতে পারতে যে আমার ক্ষমতার ভেতর থাকলে শুধু বিহার কেন, সারা ভারতবর্ষের আধিপত্য দিতাম তোমাকে। তুমি জানো না যে, শেষ বিচারের দিনে ঐ দুই বীরদের—একজনকে শত্রুর হাতে, আরেকজনকে প্রাণাধিক বন্ধুর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।"

আলিবর্দী যখন সিরাজের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ, তখন তাঁর চিঠির ভাষায় কত স্নেহের ভৎর্সনা! নিজের রাজ্যের ক্ষয়-ক্ষতির চেয়ে আদরের নাতি পাছে যুদ্ধ বিগ্রহে কষ্ট পায় সেই তাঁর বড় ভাবনা।

পূর্ণিয়া জয় করতে গিয়ে সিরাজউদ্দৌলা বন্দী হলেন সেখানকার শাসনকর্তা জানকীরামের হাতে। খবর পেয়েই আলিবর্দী ছুটে এলেন পাটনায়। এবার দৌহিত্র আর দাদামশায়ের সাক্ষাৎ ঘটল শিবিরের ভেতরে। চোখের জলে ধুয়ে গেল পরস্পরের মনের মালিন্য। 'কদমবোসী' অর্থাৎ পদচুম্বন করে সিরাজ শ্রদ্ধা জানালেন দাদুকে।

সিরাজকে মানুষ করতে হবে—এইটেই আলিবর্দীর অষ্টপ্রহরের চিন্তা। খামখেয়ালীপনা আর বিদ্রোহের নেশাকে সরিয়ে দিতে হবে তার মন থেকে।

জাঁকজমক করে সাদী এনে দিলেন সিরাজের অন্দরমহলে। এত জাঁকজমক, ধুম-ধাড়াক্কা যে বাংলাদেশের স্মৃতি থেকে তার ধ্বনি মিলিয়ে যেতে বহু বছর সময় লেগেছিল।

বড় জামাইয়ের জন্যে ছিল মতিঝিল। মতির মত ঝকমকানো বিরাট প্রাসাদ। সিরাজের জন্যে ভাগিরথীর পশ্চিম পাড়ে তেমনি বানিয়ে দিলেন আরেকটা। হীরাঝিল প্রাসাদের সামনে সরোবর। সরোবরের গায়ে ফুলের বাগান। প্রাসাদের দেয়াল গৌড়ের পাথর দিয়ে তৈরি। পাথরে কত রকমের কারু-কাজ। এই প্রাসাদের নাম ছিল 'মনসুরগঞ্জী'। এরই পাশে একটা গঞ্জ। মনসুর গঞ্জ। এর যা কিছু আয় সবই সিরাজউদ্দৌলার।

১৬ বছর রাজত্ব চালিয়ে পিঠ বেঁকে গেছে। যুদ্ধ-আর বিদ্রোহ সামলাতেই কেটেছে জীবনের অধিকাংশ সময়। মাথার চুল পেকে শনের মত সাদা। সারা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোথ রোগের যন্ত্রণা। রোগে ভুগতে ভুগতে ১৭৫৬ সালের ৯ই এপ্রিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জনপ্রিয় নবাব মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে চোখ বুঝলেন। সেদিন রজব চাঁদের নবম দিবস। মৃত্যুর আগেই তিনি জানিয়ে

গেলেন—সিরাজই তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। সিরাজউদ্দৌলার বয়স তখন মাত্র উনিশ বছর। মুখে আবছা আবছা গোঁফের রেখা ফুটেছে। সুন্দর, মনোরম তাঁর দেহ লাবন্য। সারা শরীরে দুধে আলতার রঙ।

বলা বাহুল্য, আলিবর্দীর কথামতই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করলেন তাঁর নাতি নবাব মনস্থরোল্-মোলক-সিরাজউদ্দৌলা-শাহকুলি খাঁ-মীরজা-মোহম্মদ-হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর।

সিরাজ সিংহাসনে বসার পর থেকে মতিঝিল প্রাসাদে দুটি মানুষের চোখ পিলসুজের ওপরে প্রদীপের মত রাগে, ক্রোধে, ঈর্ষায়, হিংসায়, প্রতিহিংসা-পরায়ণতায় থরথর করে কাঁপে। কাঁপে আর ঘোরে এদিক ওদিক। স্থির হয়ে যায় পাথরের মত। আবার দপ্‌দপ্ করে। দেয়ালের গায়ে তাদের দুজনের ছায়া হাজার বাতি লণ্ঠনের ঝাড়ের আলোয় ঘন কালো আর মস্ত বড় হয়ে কাঁপে, ঘোরে, স্থির হয়ে থমকায় পাথরের মত। তাদের একজন ঘসেটি বেগম। আর একজন তাঁর স্বামীর আমলের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ। নোয়াজিশ খাঁর দক্ষিণ হাত। ঢাকার গভর্ণর বলতে কাজে কর্মে তিনিই। ঘসেটি বেগম জানতেন আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসছেন তিনিই। ঘসেটিকে কেন্দ্র করে সিরাজের বিরুদ্ধে একটা রাজ্যলাভের চক্রান্ত আলিবর্দীর জীবিত কাল থেকেই চলে আসছে। বোনপোর দিকে তাঁর চিরকালই বিষ নজর। সিরাজউদ্দৌলা সে কথা বহুদিন থেকেই টের পেয়েছিলেন।

সিংহাসনে বসবার পর সিরাজউদ্দৌলা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের কথা ভুললেন না। মতিঝিলে হঠাৎ একদিন চড়াও হয়ে ঘসেটি বেগমের স্বামীর-অর্জিত ধন-সম্পত্তি রত্ন-ভাণ্ডার সবই নিজের দখলে নিয়ে নিলেন। আর মতিঝিলের প্রাসাদ হারিয়ে তাঁকে বন্দী হতে হল সিরাজের অন্তঃপুরে।

রাজবল্লভ বুঝলেন এবার তাঁর পালা। তিনি বিক্রমপুরের লোক। জাতে বৈদ্য। বুদ্ধিতে বিচক্ষণ। আলিবর্দীর জীবিতকালেই সিরাজউদ্দৌলা একবার তাঁকে বন্দী করেছিলেন সরকারী টাকা গাফ করে দেওয়ার অপরাধে। রাজবল্লভ হিসেব দেখাতে পারেননি। তবু আলিবর্দী তাঁকে ক্ষমা করে-ছিলেন। রাজবল্লভকে শুধু বলেছিলেন—হিসেবটা বুঝিয়ে দিতে।

সেই সিরাজ এখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি। আগের বারে মাথা বেঁচেছে। মান খোয়া গেছে। এবারে হয়তো আস্তো মাথাটাই উড়ে যাবে নবাবের রোষদৃষ্টিতে।

রাজবল্লভের টাকাকড়ি বিস্তর। তাঁর বড়লোকী চাল সেকালের পূর্ববঙ্গে প্রবাদবাক্য হয়ে গিয়েছিল। রাজবল্লভ ভাবলেন এই টাকা যদি নবাবের রাহু-দৃষ্টির আওতায় এসে যায় তাহলে সবই গ্রাস করে বসবেন। তার চেয়ে আগে ভাগে সরিয়ে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সাবধানের মার নেই। কাশিমবাজারে তখন ইংরেজদের কুঠির সর্দার ওয়াট্‌স সাহেব। রাজবল্লভের সঙ্গে তাঁর আঁতাতটা বহুদিনের। চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগা-যোগ হয়। তিনি নৌকো বোঝাই টাকা ছেলে কৃষ্ণদাসের হাত দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। ওয়াট্‌স কলকাতায় ইংরেজ হর্তাকর্তা ড্রেক সাহেবকে জানিয়ে দিলেন—কৃষ্ণদাস ইংরেজদের হিতৈষী। তাকে যেন কলকাতা শহরে ঠাঁই দেওয়া হয়।

ড্রেক সাহেব বেশ কিছু মোটা টাকা খেয়ে কৃষ্ণদাসকে নিজের পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় দিলেন। এদিকে রটে গেল কৃষ্ণদাস পুরী গেছে তীর্থ দর্শনে। সিরাজউদ্দৌলা রাজবল্লভের গচ্ছিত ধনে আঙুলও ছোঁয়াতে পারলেন না। কিন্তু গুপ্তচরের মারফৎ সমস্ত ঘটনাই তাঁর কানে এল। সেই সঙ্গে গুপ্তচর সর্দার রাজা রাম রাম সিং আরও জানালেন যে, ইংরেজরা কলকাতায় গড় গড়ছেন নতুন করে।

সিরাজউদ্দৌলা তখন তোড়জোড় করছেন পূর্ণিয়া দখলের। মাসতুতো ভাই শৌকতজঙ্গকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে। কেননা শৌকত তাকে সিংহা-সনচ্যুত করার জন্যে ইংরেজদেব সঙ্গে অল্পস্বল্প মেলামেশা করছে বলেই সন্দেহ। ইংরেজদের তরফ থেকে মাসে মাসে ভেট আসে, উপঢৌকন আসে তাঁর রাজদরবারে।

সময়ের অভাবে সিরাজউদ্দৌলা তাই ইংরেজদের একটা চিঠি লিখে পাঠালেন। তোমরা কলকাতায় নতুন করে গড-বন্দী তৈরি করছ। পত্রপাঠ সে সব কাজ বন্ধ করো। আর রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাসকে তার সমস্ত ধনরত্নাদিসহ মুর্শিদাবাদে পাঠাবে। ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে পত্রবাহক হয়ে গেল মেদিনীপুরের ফৌজদারের ভাই নারায়ণ সিং উমিচাঁদের কাছে। এবং উমিচাঁদ সেই চিঠিকে যথাস্থানে অর্থাৎ কলকাতার প্রেসিডেণ্ট ড্রেক সাহেবের হাতে পৌঁছে দিলেন।

কিন্তু কলকাতা-কাউন্সিল সে চিঠি মিথ্যা সন্দেহ করে গ্রহণ করলেন না। উপরন্তু গুপ্তচর বা ছদ্মবেশী দূত নারায়ণ সিংকে শহর থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবার হুকুম দিলেন ড্রেক সাহেব। তাঁর তালিম দেওয়া

পাইক বরকন্দাজরা এসব কাজে খুবই করিৎকর্মা।

নারায়ণ সিং মুর্শিদাবাদে ফিরে নবাবকে সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানাল। ১৭৫৫ সালে বিলেত থেকে চারজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এসেছে। পুরনো দুর্গের সংস্কার ও নতুন ভাবে কিছু জুড়ে-জাড়ে নেওয়ার কাজ চলেছে।

এদিকে পূর্ণিয়া যাত্রার পথে রাজমহলে বসে নবাব ড্রেক সাহেবের কাছ থেকে চিঠি পেলেন একটা। তাতে লেখা—

আমরা তো নতুন করে কিছু করছি না। নদীর ধারের পোস্তাটা ভেঙে যাওয়ায় সেটাকেই একটু আধটু মেরামত করছি মাত্র। মারাঠা-ডিচ ছাড়া আর কিছুই তো নতুন করে হয়নি। বর্তমানে ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের আশঙ্কা প্রতিমুহূর্তে। এই যে মেরামতি-পর্ব সেটা সেই জন্যেই। আর কৃষ্ণদাস স্বইচ্ছায় না গেলে আমরা তাকে পাঠাতে পারি না।

ড্রেক সাহেবের উত্তরে সিরাজের মনের ভেতরের চাপা রাগ হঠাৎ দবদবিয়ে উঠল। পূর্ণিয়া আক্রমণ হল না। তার আগেই ঠিক করলেন কলকাতা অধিকার করতে হবে। ইংরেজ জাতটার খুব বাড় বেড়েছে। ভেবেছে তারাই বুঝি এই মুলুকের মালিক। নবাব বাদশার ওপর ভক্তি শ্রদ্ধা বিনয়ের তোয়াক্কা রাখে না!

সিরাজউদ্দৌলার চোখে অতীত দিনের কিছু ছবি ভেসে উঠল। মনে পড়ল যখন তিনি হুগলীর ফৌজদার সেই সময়ের কথা। ফরাসী আর ওলন্দাজরা তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে প্রায়ই নানা উপঢৌকন পাঠাত। ইংরেজরা দেখাদেখি তাদের ওপর টেক্কা মারতে এগিয়ে এল। তারা সেদিন নবাব আলিবর্দীর দৌহিত্রকে যে উপঢৌকন দিয়েছিল সিরাজউদ্দৌলার আজও তা স্পষ্ট মনে পড়ছে।

৩৫ থান মোহর, নগদ টাকা ৫৫০০৲, মোমের বাতি ১১০০৲, ঘড়ি ৮৮০৲, ২ জোড়া আরসি ৫৫০৲, ২ খণ্ড শ্বেতমর্মর ২২০৲, ১টি পিস্তল ১১০৲, ১টি হীরার আংটি ১৪৩৬৲, আলিবর্দীর বেগমের নজর বাবদ ২৬ থান মোহর, ইত্যাদি।

আরও মনে পড়ছে ইংরেজদের এই উপঢৌকনের বিনিময়ে তিনি তাদের শিরোপা আর হাতী উপহার দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন।

একবার বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদের সঙ্গে বাধল ইংরেজদের গোলমাল। অপরাধ করেছে কে একজন রামজীবন কবিরাজ। তিনি বেহালার বর্ধমান

রাজ বাড়ির গোমস্তা। মিঃ উড্ নামে একজন সাহেব তাঁর বিরুদ্ধে ডিক্রি জারী করে রাজবাড়িতেই ক্রোকী পেয়াদা বসিয়ে দিলেন। বর্ধমান রাজবংশ ইংরেজ আগমনের দিন থেকেই এই জাতটার ওপর চটা। তার ওপরে এমন নিদারুণ অপমান! তিলকচাঁদ তেলে বেগুনে জলে গিয়ে তাঁর এলাকায় ইংরেজদের যত-গুলো আড়ত ছিল সব কটার ওপর মাশুল আদায়ের চৌকি বসিয়ে দিলেন। আড়তদারদের ধরে ধরে আটকানো হল কয়েদে। ইংরেজরা না পারে মাল বের করতে, না পারে রপ্তানি করতে। ব্যবসা বুঝি সিকেয় ওঠে।

আলিবর্দী মিঠে-কড়া স্বভাবের নবাব। তিনি ইংরেজদের ওপর চটা। আবার তাদের আবেদন নিবেদনে সদয় হতে তাঁর সময় লাগে না বেশী। কিন্তু এবারেও যে সেই ঘটনাই ঘটতো এমন কোন প্রমাণ ছিল না। তবুও যে ঘটল তার কারণ সিরাজ। আলিবর্দীর নয়নমণি। সিরাজ বললেন—দাদু, ইংরেজরা ভারী ভালো জাত। বন্ধুত্বের মূল্য দেয়। যোগ্যকে সম্মান জানাতে কুণ্ঠা করে না। এই দেখ না আমাকে কত কি উপহার উপঢৌকন দিয়েছে। নাতির কথায় দাদু ভুললেন। আলিবর্দী বর্ধমানরাজকে একটু কড়া সুরেই জানিয়ে দিলেন যে, আশ্রিত ইংরেজকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করাটা খুবই অন্যায়। চৌকি উঠিয়ে নাও।

সিরাজউদ্দৌলার মন থেকে সে-সব স্মৃতির রং একটুও ফিকে হয়নি। অবশ্য আলিবর্দীর প্রভাবে পড়ে ও ঘটনা-পরম্পরায় সিরাজ সিংহাসন লাভের বেশ কিছু আগে থেকে ক্রমশ ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে উঠছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা ভাবতে লাগলেন আজকের ইংরেজদের কথা। তারা এখনো একে ওকে তাকে ভেট দেয়, উপঢৌকন পাঠায়। কই আমি যেদিন সিংহাসনে বসলাম সেদিন তো কোন উপঢৌকন পাঠাল না? অভিনন্দন জানাল না? কেন? অথচ শৌকতজঙ্গের সঙ্গে তাদের কি মেশামেশি!

নবাবের শরীরের ভেতরে রক্তে রক্তে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে একটা উত্তপ্ত আবেগ। আবেগ নয়। আক্রোশ। আশৈশব-যৌবনকাল যে কখনো কারো কাছে মাথা নীচু করার আগে ধুলোয় কিংবা রক্তে তার মাথাকে লুটিয়ে দিয়েছে—দু-দিনের ব্যবসায়ী পরদেশী ইংরেজ তাকে পরোয়া করে না! নবাবের দিকে নজর নেই। নবাবীর নজরানা নেই। বাংলাদেশে ব্যবসা করছে। বাংলাদেশের আইন-কানুন শৃঙ্খলা মানবে না। কেল্লা বাড়াতে হলে, গড়-বন্দী করতে গেলে নবাবের অনুমতি চাই—সেটাও বোঝে না বুঝি!

মনসুরগদীর বিলাস প্রাসাদে আলিবর্দীর অনেক আদরের সুখের পায়রা হঠাৎ পালক পাল্‌টে কেশর নাড়া দিয়ে সিংহের মত গর্জন করে উঠল।

মুর্শিদাবাদে পৌঁছবার আগে দেওয়ান রায়দুর্লভকে তিনি পাঠালেন কাশিম-বাজার কুঠি অবরোধ করতে। দুর্লভরাম এসে কুঠি-সর্দার ওয়াট্‌স-এর কানে ফুস-মন্ত্র ঝাড়লেন।

এখনো সময় আছে। কিছু টাকা কড়ি ট্যাঁকে গুঁজে নবাবের কাছে গিয়ে একটু চোখের জল ফেল, অনুনয়-বিনয় করো, একটু খাটো হয়ে সেলাম-কুর্নিশ ঠোকো—দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

ওয়াট্‌স দুর্লভরামের পরামর্শে শহর ছেড়ে মুর্শিদাবাদে চললেন। দরবারে পৌঁছবা মাত্রই নবাব তাদের অনেক ভৎর্সনা (বন্দী ?) করলেন। এদিকে দুর্লভরাম নবাবের মেজাজের আঁচটা ধরতে পেরে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কাশিমবাজাব কুঠির যাবতীয় মালপত্তর, টাকাকড়ি, কামান-বন্দুক নবাবের দখল-জাত করে নিলেন। কাশিমবাজারেব কুঠি ছেড়ে সবাই পালাল এদিক ওদিক। বেশীর ভাগ ফলতায়। অনেকেই বন্দী হল।

শেষ পর্যন্ত কাশিমবাজারের কুঠিয়ালরা নবাবের কাছে এক মুচলেকা-পত্রে স্বাক্ষর করে ব্যাপারটাব নিষ্পত্তি করলেন। সেই মুচলেকা-পত্রের প্রথম সর্তটি লেখা হল এইভাবে যে, নবাবের দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে কেউ যদি কলকাতায় পালিয়ে আসে, নবাবের আজ্ঞা মাত্রই তাঁকে নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় সর্ত হল, গত ক-বছরে বাণিজ্যের দস্তকের হিসাব ও তার অপব্যবহারের ফলে নবাবের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পুরণ করতে হবে। তৃতীয় সর্ত হল, পেরিন পয়েন্টের (বাগবাজারের কাছে) দুর্গ প্রাকার ও কেলশাল সাহেবের বাগানের গড়বন্দী ভেঙে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে হলওয়েল সাহেবের ক্ষমতাকেও কিছুটা কমাতে হবে। প্রজাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি কমবে তার ফলে।

ওয়াট্‌স্‌ স্বাক্ষর করলেন এই মুচলেকা-পত্রে।

এবং কলকাতার ইংরেজদের ভয় দেখাবার জন্যেই ওয়াট্‌স ও তাঁর সঙ্গীদের মুর্শিদাবাদে বন্দী করে রাখা হল।

সমস্ত ব্যাপারটা এইখানেই মিটে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ক্রমশ সিরাজ-উদ্দৌলার কানে আসতে লাগল যে ইংরেজরা তাদের নিজেদের সই-স্বাক্ষর করা মুচলেকা-পত্রের প্রতিশ্রুতি মানছে না। ইংরেজরা কোম্পানীর নাম করে যাকে

তাকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার পরোয়ানা বিক্রি করে নিজেদের উদর ভর্তি করছে। এতে রাজকোষের ক্ষতি হচ্ছে বিস্তর। আর এদিকে নবাবের পারিষদ-বর্গ তাঁকে বরাবর বোঝাচ্ছেন যে—কলকাতা একটা সোনার রাজ্য। তার ধুলো-কাঁকরে সোনার ছড়াছড়ি। ওটা আপনি দখল করুন। নইলে ইংরেজরা আমাদের ঠকিয়ে ক্রমশ বড়লোক হয়ে উঠবে। ওরা ভারী বিষাক্ত সাপ। আপনার দুধ-কলা খেয়ে আপনাকেই কামড় দেবে একদিন। কল-কাতাটা দখল করে নিন।

কলকাতা দখল করতে হবে। সত্যিই করতে হবে। ইংরেজদের এত বাড়াবাড়ি আর সহ্য হয় না।

১৭৫৬ সালের ৫ই জুন। ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মহা আড়ম্বরে কলকাতা আক্রমণের জন্যে এগোতে লাগলেন। সঙ্গে কামান বন্দুকও যথেষ্ট। ফরাসীরা নবাবকে বারুদ যুগিয়েছিল প্রচুর। সৈন্যদের বুকে ইংরেজ আক্রমণের উৎসাহও সেদিন প্রবল। ইতিহাসের পাতায় তাদের সেদিনকার কুচকাওয়াজের-তালে-তালে-গাওয়া গান অক্ষরে অক্ষরে ফুটে আছে।

"নবাব বাহাদুরকা ফৌজ,
যৈসি খোলা তলোয়ার।
ঘড়ি ভরমে জিত লিয়া
কেল্লা কলকাতা বাজার।"

নবাব যে কলকাতা আক্রমণ করবেন এবং অমুক দিন করতে আসছেন এ খবর উমিচাঁদ আগে থাকতেই জানতেন। ইংরেজরাও জেনে ফেললে ক্রমে ক্রমে। আতঙ্কের একটা কালো ছায়া নেমে এল সারা শহরের বুকে। ইংরেজরা এখানে ওখানে খাদ খুঁড়তে লাগল। কামান বসাতে লাগল বড় বড় বুরুজের ওপর। লালদিঘীর চারপাশের নালা-নর্দমা বোজাতে লাগল। কিছু কিছু বাড়ি ঘরও ভাঙা হল প্রয়োজন মাফিক। তারপর আক্রমণের দিন যত এগিয়ে আসে ভীত-বিহ্বল, প্রাণভয়-কাতর কলকাতায় কি ইংরেজ কি বাঙালী সকলেই যে যে দিকে পারে পালাবার পথ দেখতে লাগল। জনতার ভিড়ে পথ ঘাট, নদী, বন-বাদাড় ভরে উঠল। সাহেব-সাজা ফিরিঙ্গীরা একবার নিজেদের গায়ের কালো রঙ আরেকবার নিজেদের ইংরেজি পোশাক পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর আশঙ্কায় মুহূর্ত গুনতে লাগল। তবে পালাল সবচেয়ে

বেশী। অসংখ্য তারা। দু-দশ হাজার নয়। পুরো পঞ্চাশ হাজার।

কলকাতায় ইংরেজদের হাতে কোম্পানীর টাকা তখন খুব ছিল না। তার চেয়েও অস্ত্রশস্ত্র বা আত্মরক্ষার অবলম্বন ছিল খুব কম। কামানগুলো পুরনো মরচে ধরা। তোপগুলোতেও গোলাবারুদ সামান্য। ইংরেজ ফৌজ বলতে সাকুল্যে ২৭৫ জন। ৭০ জনের অসুখ। আর ২৫ গেছে মফস্বলে।

ডাচদের কাছ থেকে কি ফরাসীদের কাছে সাহায্য-প্রার্থনা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। নবাবের ভয়ে তারা সাহায্য করলো না। শেষ পর্যন্ত এখান ওখান সেখান থেকে একে ওকে তাকে টেনে হিঁচড়ে, জোরজবরদস্তি করে দলে টেনে সৈন্য-সংখ্যা দাঁড়াল মোট ৫১৫ জন। তাদের মধ্যে বন্দুক ধরতে জানে না এমন নিধিরামের সংখ্যাই বেশী।

এসব বন্দোবস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তারা আরেকটা কাজ করলে। খবর পেলে চরের মুখে যে এই আক্রমণের পিছনে আছে উমিচাঁদ। গভর্ণর ড্রেক উমি-চাঁদকে আর যত নষ্টের মূল কৃষ্ণদাসকে সোজাসুজি হাজতে আটকে রাখতে হুকুম দিলেন।

এদিকে নবাবের সৈন্য-সামন্তের জোরটাও যেমন জবর, টাকাকড়ির বহরটাও তেমনি জাঁকের। ঘসেটি বেগমের মতিঝিল দখল করার ফলে যা কিছু ধন-সম্পত্তি পেয়েছিলেন সেগুলো কলকাতা অধিকারেই সব খরচ করবেন ঠিক করেছেন নবাব।

ইংরেজরা বেগতিক দেখে মাদ্রাজে চিঠি লিখলেন অবিলম্বে সৈন্য পাঠাবার জন্যে। কিন্তু তাদের আসতেও তো সময় লাগবে দু-মাস। ইতিমধ্যে বাঁচা যাবে কি করে।

শেষ পর্যন্ত দু-মাস টিকে থাকার মত রসদ, খাবার-দাবার মজুদ করে কেল্লার ভেতরে গিয়ে উঠলেন সবাই। ছেলে পিলে, বাচ্চা-কাচ্চা, ফিরিঙ্গী ক্রীতদাসীর দল, সৌখিন মেমসাহেব তারাও ঐ কেল্লায় এসে একসঙ্গে গাদাগাদি করে আশ্রয় নিলে।

হুগলীর কাছের গঙ্গা পেরিয়ে দেখতে দেখতে চিৎপুরের খালের কাছ বরাবর এসে পড়ল নবাবের সৈন্য-সামন্ত। পেরিন পয়েণ্টের সামনে ইংরেজরা আক্রমণ করল নবাবকে। নবাবের সৈন্য বেশ কিছু মরল। খাল না ডিঙোতে পারলে কলকাতা অধিকার করা যে রীতিমত দুঃসাধ্য নবাব সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন।

হটতে হটতে নবাবের সৈন্য দমদমের কাছে গিয়ে থামল। এখন মারাঠা ডিচটা পার হওয়া যায় কি উপায়ে?

নবাব যখন চিন্তায় দিশেহারা এমন সময় উমিচাঁদের জমাদার জগন্নাথ সিং নবাবকে একটা গুপ্তপথের সন্ধান জানাতে এল। টালার কাছে গোরু ঘোড়া চরতে চরতে একটা ছোট্ট রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেইখান দিয়েই নবাবের সৈন্য শহরে মাথা গলাল। আর বাকী কিছু শিয়ালদার কাছে মারাঠা ডিচ ডিঙিয়ে। পথে পড়ে বড়বাজার। সেটা লুঠপাট করে, ঘর দোরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। নবাব সসৈন্য ছাউনি ফেললেন হালসীবাগানে উমিচাঁদের বাগান বাড়িতে। তাঁর আস্তানায় আশে পাশেই তৈরি হল হাতী ঘোড়া রাখার আস্তাবল। যেখানটায় নবারের হাতী থাকতো সেটাকেই এখন বলা হয় হাতীবাগান।

১৮ই জুন। শুক্রবার। সকাল থেকে শুরু হল লালদিঘীর যুদ্ধ। নবাবের সৈন্যরা লালবাজারের পরিত্যক্ত বাড়িগুলো দখল করে তার ভেতর থেকে আক্রমণ চালাচ্ছে। ইংরেজদের কামান তাদের কিছুই জখম করতে পারছে না। আর ইংরেজদের কামানঘাঁটির চারদিকটাই খোলা। ফলে লোক মরতে লাগল তাদেরই বেশী। কামানঘাঁটি ছেড়ে মেয়র্‌স্ কোর্টে ঢুকে পড়ল সবাই। নবাবের সৈন্যরা তাদের কামানগুলো দখল করে তাদেরই বিরুদ্ধে ছুঁড়তে লাগল। সন্ধ্যের দিকে সেদিনকার মত যুদ্ধ থামল।

পরের দিন সকাল হতে না হতেই আবার আক্রমণ। এদিকে ইংরেজদের গোলা-গুলিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফোর্টের ভেতরে উঠেছে আর্ত স্বর। মৃত্যুর ভয়ে উন্মত্ত চিৎকার।

একে একে গঙ্গায় নৌকো ভাসতে লাগল। তাড়াতাড়িতে কেউ ডুবল। কেউ পা পিছলে আহত হল। জায়গার অভাবে এমন ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হল যে ২০০ জন আরোহীর একটা নৌকো হঠাৎ উল্টে গেল গঙ্গায়। তাতে ছিল ফিরিঙ্গী মেয়েরা আর বাচ্চা-কাচ্চার দল। সকলেই প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ব্যস্ত। কারো দিকে কারো নজর নেই। সেই ফাঁকে ফোর্ট থেকে লুকিয়ে গভর্নর রোজার ড্রেক সাহেব পালালেন নৌকোয় চেপে।

গভর্নর যখন পথ দেখিয়েছেন তখন আমরা আর কেন পড়ে পড়ে মার খাই—এই এই ভেবে সেনাপতি, সেনাদল, মাথাওলা মস্ত মস্ত নেতা সকলেই পালাতে লাগলেন। রইলেন হলওয়েল সাহেব। দু-চারজনকে নিয়ে তখনো তিনি

জিতবার জন্যে লড়ে চলেছেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই ইংরেজদের মারল। একদল ডাচ পল্টন ফোর্টের ভেতর দিয়ে গঙ্গার দিকে যাবার যে রাস্তা ছিল—তার ফটক ভেঙে প্রাণভয়ে পালাতে লাগল। আর সেই ভাঙা ফটক দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকতে লাগল নবাবের সৈন্য।

হলওয়েলের সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন। গোলা-বারুদ নিঃশেষ। কি করা যায়? পালাবেন? সে তো আগে হলে হত। এখন যে কেল্লাটা চারদিক দিয়েই ঘেরা। হঠাৎ মনে পড়ল উমিচাঁদের কথা। হ্যাঁ, তাঁকেই ধরা যাক্। নবাবের ওপর যথেষ্ট আধিপত্য আছে তাঁর। যদি তাঁর মধ্যস্থতায় সন্ধির ব্যবস্থাটা করতে না পারা যায়—তাহলে মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর নেই। কলকাতার জমিদার (কালেক্টর) এবং কলকাতা অধিকারের দ্বিতীয় দফার যুদ্ধ-কালে রাতারাতি হওয়া গভর্নর আর যুদ্ধের কমাণ্ডার-ইন-চীফ—একাধারে এতগুলি পদে হলওয়েল একাই। তিনি ফোর্টের কয়েদখানায় ঢুকে বন্দী উমিচাঁদের হাত দুটো জাপটে ধরলেন। এই মহা বিপদে তুমিই একমাত্র রক্ষাকর্তা। বাঁচাও ভাই।

হলওয়েলের ওপর উমিচাঁদের তত রাগ নয়, যতটা ড্রেক-এর ওপর। সেই ড্রেক সাহেব নবাবের ভয়ে নদী পার হয়ে পালিয়েছেন শুনে উমিচাঁদের রাগ পড়ল কিছুটা। আর হলওয়েলের মত এমন একজন মান্য-গণ্য লোকের এতটা অনুনয় বিনয়। উমিচাঁদের মন ভিজল। নবাবকে তিনি সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। মানিকচাঁদ দূত হলেন এই সন্ধি-স্থাপনের।

চতুর্দোলায় চড়ে নবাব এলেন হলওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে। রক্ত মাখা হাত মুছে দুজন দুজনের প্রতি প্রীতি নমস্কার জানালেন। জেলের ফটক খুলে মুক্তি দেওয়া হল উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাসকে। নবাব তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কলকাতা আক্রমণের আগে রাজবল্লভের সঙ্গে একটা আপস হয়ে গিয়েছিল নবাবের। তাই কৃষ্ণদাসের বরাতে এই আলিঙ্গন।

যুদ্ধ-টুদ্ধ তো চুকল। এবার মুর্শিদাবাদে ফিরে যেতে হবে। তার আগেই অনেকগুলো বিধি-ব্যবস্থার কাজ সেরে নিলেন নবাব। ইংরেজদের টাকাগুলো কোথায়? টাকা এল। কিন্তু তা যৎসামান্য। মাত্র পঞ্চাশ হাজার। আর কই? গুপ্তধন নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে। পাত্র-মিত্র সেনা-সামন্ত চারপাশ তোলপাড় করে খোঁজে। কিন্তু কিছুই পায় না। পাবে কোথা

থেকে ?

টাকা কি তখনো কলকাতায় মজুত আছে ? বর্ষার আগে সব পাঠানো হয়ে গেছে বিলেতে। রাগে নবাব বাড়ি ঘর জ্বালাবার হুকুম দিলেন। ড্রেক সাহেবের বসত বাড়িটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন ধুলোয়। মসজিদ গাঁথলেন ইংরেজদের কেল্লার ভেতরে।

শেষ পর্যন্ত কলকাতার নামটাকে পালটে অক্ষয় করতে চাইলেন চির-শ্রদ্ধেয় দাদুর স্মৃতিকে। কলকাতার নাম হল আলিনগর। তখনো রাগ যায়নি। মীরমদনকে ডেকে হুকুম করলেন—হলওয়েল সাহেবকে তুমি বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাবে।

হলওয়েলকে হুকুম দিলেন—রাতারাতি বাকী ইংরেজদের কলকাতা ছেড়ে সোজা পথ দেখতে বলো। নইলে সব কচু-কাটা করা হবে।

আর ডাক পড়ল মানিকচাঁদের। তাঁকে বললেন—দেখ, এই রইল তিনশ সৈন্য তোমার অধীনে। আজ থেকে তুমিই হলে আমার আলিনগরের গভর্নর।

নবাব যখন এই সব কাজে ব্যস্ত হলওয়েল সেই সময় তাঁকে এক করুণ কাহিনীর বর্ণনা দিলেন। গতরাত্রে গারদখানায় ১২৩ জন মারা গেছেন। মারা গেছেন কথাটাকেই একটু ঘুরিয়ে বললেন হলওয়েল। হত্যা করা হয়েছে। নবাব এর কিছুই বুঝতে পারলেন না। কে কাকে কখন এবং কেন যে গারদে পুরল এবং কিভাবে যে হত্যা করল তার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানেন না। খবর নিয়ে জানা গেল একদল মাতাল ইংরেজ নবাবের পাহারাওয়ালাদের মারধোর লাগায়। তারই ফলে পাহারাওলা একধার থেকে যত ইংরেজকে পেয়েছে সবাইকে পুরেছে ফটকে। কিন্তু সে তো জনা পঞ্চাশ-ষাট হবে, কি তার চেয়েও কম।

যাই হোক্—নবাব সব শুনে প্রহরীদের হুকুম দিলেন—সমস্ত বন্দীকে খালাস করে দাও।

আর শোকাতুর হলওয়েলকে নবাব নিজে সান্ত্বনা দিলেন। আসন, জল দিয়ে সুস্থ করে তুললেন। এ সবই দৈব-দুর্বিপাক। কারো ইচ্ছায় বা আদেশে তো এ সব ঘটেনি।

সিরাজউদ্দৌলা এবার রাজধানীমুখো এগোতে লাগলেন কলকাতা ছেড়ে। পথেই পড়ে হুগলী। নবাবের পথশ্রম দূর করার জন্যে সেখানে ছাউনি ফেলা

হল। হুগলীর বিরাট পটমণ্ডপে অভ্যর্থনার সমারোহে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। দেখতে দেখতে নবাবের ছাউনির চারপাশে যেন একটা ছোটখাট রাজধানী গড়ে উঠল আকস্মিকভাবে। সেই পটমণ্ডপে বসল নবাবের দরবার। গললগ্নবস্ত্র হয়ে এল ওলন্দাজ আর ফরাসী বণিকরা। নবাবকে নজরানা দিলে ৮ লক্ষ টাকার। ওলন্দাজরা সাড়ে ৪ লাখ। ফরাসীরা সাড়ে ৩। নবাবের হুগলীর দরবারে এও জানিয়ে দেওয়া হল যে, যদি কোন পলাতক ইংরেজ শুধু মাত্র ব্যবসার জন্যে কলকাতায় এসে বসবাস করতে চান, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন।

১১ই জুলাই নবাব ফিরলেন রাজধানীতে। মীরমদন মুর্শিদাবাদের কারাগারে হলওয়েলকে বন্দী করে রেখেছে। সমস্ত নগর জুড়ে বিজয়োৎসবের বাজনা। কামানের মুহুর্মুহুঃ গর্জন। নাচ, গান, মঙ্গলবাদ্য। নবাব হঠাৎ কি মনে করলেন। চতুর্দোলায় চড়ে মতিঝিল যাওয়ার পথে হলওয়েলকে কারামুক্তির আদেশ দিলেন।

পাত্র-মিত্র সভাসদ্দের ডেকে আসর জাঁকিয়ে বসলেন নবাব। মদের রঙিন গেলাসখানা ঠোঁটে ছোঁয় কি ছোঁয় না এমনি ভাবে ধরে, সারা মুখে মদির হাসির একটা ঢেউ জাগিয়ে তিনি বললেন—ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে অত-শত অস্ত্র-শস্ত্রের কিছু প্রয়োজন নেই। আমার এক জোড়া চটি জুতো হলেই সাগর পারে খেদিয়ে দেওয়া যায় তাদের।

এর দু-মাস পরের ঘটনা।

মাদ্রাজের কুঠিতে এক এক করে সমস্ত খবর গিয়ে পৌঁছল। কিছুটা চিঠির মারফৎ। বাকিটা পলাতক রণবীর মানিংহামের মুখে। কাশিমবাজার, কলকাতা, কলকাতার দুর্গ সবেরই অধিকার হারিয়েছে ইংরেজ। ইংরেজরা সব কলকাতা ছেড়ে আস্তানা গেড়েছে ফলতায়। সেখানে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন যন্ত্রণা। নিদারুণ গ্রীষ্মতাপ। তারপর নিত্য নতুন রোগের আক্রমণ। জাহাজে খাদ্য নেই! টাকার তহবিল ফাঁকা। হাট-বাজারের লোকে ইংরেজ দেখলে মানিকচাঁদের ভয়ে মাল বিকোয় না। এক বস্ত্র। এক বেলা আহার। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ গেছে। আছে কেবল ফোর্ট উইলিয়ম জাহাজখানা। ড্রেক সাহেব সেটাকেই তাঁর গভর্নর হাউস বানিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক চালাচ্ছেন।

মাদ্রাজের কুঠিতে কলকাতা উদ্ধারের আলোচনা তুমুল তর্ক বিতর্কের ঝড়

তুলল। একদিকে তাদের চিরশত্রু ফরাসী। অন্যদিকে নবাব। এই রকম একটা সময়ে মাদ্রাজের এই মজুত করা অল্প সৈন্যকে বিদেশে পাঠানো কি ভালো হবে? কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই একমত হলেন যে, কলকাতাকে আগে উদ্ধার করতে হবেই। নইলে ইংরেজদের 'মহতী বিনষ্টি'।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল নতুন। এই যুদ্ধ পরিচালনার সেনাপতি হবে কে? মাদ্রাজের গভর্নর পিগট সাহেব? তাঁর অভিজ্ঞতা নেই। কর্নেল আণ্ডারক্রন? তিনি যুদ্ধ-টুদ্ধ সবই বোঝেন বটে তবে এখন তো হাঁপানীতে ভুগছেন। তাহলে? তাহলে কি ক্লাইভ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক যোগ্য নামই পাওয়া গেছে।

তিনি তো আর এখন কেরানী ক্লাইভ নন। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে এখন হয়েছেন কর্নেল। ফরাসী গভর্নর ডুপ্লের মত দুঁদে যোদ্ধাকে হারানোর গৌরবে ইংরেজ মহলে তাঁর সুনাম কত।

১৭৫৬ সালের ১৬ই অক্টোবর।

কর্নেল ক্লাইভ আর ইংরেজদের নৌ-সেনাপতি অ্যাডমিরাল ওয়াটসন যুদ্ধ জাহাজে চেপে বসলেন। সঙ্গে কোম্পানীর মালবাহী পাঁচখানা জাহাজ। ৯০০ গোরা সৈন্য। ১৫০০ কালা সিপাহী।

প্রায় দু-মাস পরে জাহাজ এসে ঠেকল কলকাতায়।

আবার শুরু হল তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা। সলা-পরামর্শ চলল কি ভাবে কলকাতাকে উদ্ধার করা যায়। এখন আর কাউন্সিল নেই। তৈরি হল সিলেক্ট কমিটি। প্রেসিডেণ্ট হলেন রোজার ড্রেকই। আর দুজন বিশিষ্ট সদস্য হলেন ক্লাইভ ও ওয়াটসন।

১৭৫৬ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। কর্নেল ক্লাইভ, মেজর কিলপ্যাটরিক স্থলপথে আর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন জলপথে বজবজের মুখে এসে দাঁড়ালেন। তার আগেই মানিকচাঁদ সসৈন্যে বজবজে ঘাঁটি গেড়েছেন। দু-দলে লাগল সংঘর্ষ।

কিন্তু বেশীক্ষণ যুঝতে হল না। ক্লাইভের দুটো কামান আর ওয়াটসনের দুটো বোমার আওয়াজে মানিকচাঁদ দুর্গ ছেড়ে সোজা দৌড়।

ইংরেজ সৈন্যবাহিনী বজবজ দুর্গ জয় করে কলকাতার দিকে এগোতে লাগল। পথিমধ্যেই একে একে দখল হল মেটেবরুজের মাটির কেল্লা আলিগড়, শিবপুরের থানা দুর্গ মকওয়া।

বজবজ দুর্গ জয় করতে তবু গোলা ফাটাতে হয়েছিল দু-চারটে। কলকাতার বেলা সে সব কিছুই দরকার লাগল না। কামানের দু-চারটে ফটাফট্

আওয়াজেই নবাব সেপাইয়ের দল কেল্লা ছেড়ে পালাল। কলকাতার কেল্লার চুড়োয় উড়তে লাগল ইংরেজদের বিজয় নিশান।

এত সহজে বজবজ বা কলকাতা জয় করায় পিছনে একটা গোপন ব্যাপার আছে কিন্তু। সিরাজের কলকাতা আক্রমণের পর থেকে উমিচাঁদ বা মানিকচাঁদ একটু একটু করে নবাবের পক্ষ থেকে সরে আসতে থাকেন। নবাবের প্রচণ্ড শত্রু তাঁর ভাই পূর্ণিয়ার শৌকতজঙ্গ। মীরজাফর, জগৎ শেঠ এবং ইংরেজদের মত এঁরাও বিশ্বাস করতে লাগলেন যে পূর্ণিয়ার যুদ্ধেই নবাবের ইহলীলা শেষ হয়ে যাবে। তাই তাঁদের মগজে একটা চিন্তা এল যে ভবিষ্যৎ-এর ভাগ্যবিধাতাকে এখন থেকেই একটু তোয়াজ করা ভালো। উমিচাঁদ গোপনে গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে চিঠি চালাচালি লাগিয়ে দিলেন। আর তারই প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হলেন মানিকচাঁদ। বজবজ বা কলকাতা আক্রমণের সময় মানিকচাঁদ যে কেবল ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার একটা ভান করবে এটা ইংরেজরা আগে থেকেই জানতো।

কলকাতা ইংরেজরা জয় করল বটে। কিন্তু তার কর্তা কে? এত বড় দুর্গের অধিকার কার হাতে? এই নিয়ে লাগল লড়াই ক্লাইভ আর ওয়াটসনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ওয়াটসনের সঙ্গে বহু বাদ-বিসম্বাদ, ও আত্মকলহের পর ক্লাইভের হাতে এল দুর্গের অধিকার। ড্রেক-সাহেব আবার কলকাতার গভর্নর হলেন। ইংরেজ সেনাদল মেজর কিলপ্যাটরিকের নেতৃত্বে মহোল্লাসে ছুটল হুগলীর দিকে। বাণিজ্যপ্রধান জায়গা। বাংলার ধনরত্নের ভাঁড়ার ঘর বললেই চলে। ওটা লুঠপাট করে কোঁচড় ভরাতে না পারলে—এত বড় যুদ্ধ জয়ের বিনিময়ে আমরা কি পেলাম! জ্বালাও ঘর বাড়ি। হুগলী থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত যেখানে যা আছে, খামার, গোলা, দোকান দানি, হাট বাজার সব লোটো।

হুগলী লুঠপাটের খবর গিয়ে পৌঁছল নবাবের কানে। এর আগেই ওয়াটসনকে পত্র-প্রত্যুত্তরে নবাব শান্তি-স্থাপনের কথা জানিয়েছিলেন। হুগলীর এই লুণ্ঠন আর অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ শুনে নবাব ওয়াটসনকে লিখলেন "তোমরা হুগলী লুঠপাট করেছ এবং আমার প্রজাদের সঙ্গে লড়াই করেছ;—এটা নিশ্চয়ই সওদাগরের উপযুক্ত কাজ হয়নি। অগত্যা, আমাকে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে হুগলীতে যেতে হচ্ছে। আমি সেনাদল নিয়ে নদী পার হচ্ছি। সেনাদলের একভাগ তোমাদের ঘাঁটির দিকে এগোতে

শুরু করে দিয়েছে। এখনও যদি কোম্পানীর বাণিজ্যকে আগের মত চালাতে চাও তাহলে এখনি তোমাদের একজন মাতব্বর-মোড়ল গোছের লোককে পাঠাও। সে যেন তোমাদের দাবি-দাওয়ার কথা বুঝিয়ে বলতে পারে। তাহলে সন্ধির সম্ভাবনা আছে।"

ঠিক এমনি সময়ে বিলেত থেকে খবর এল—আবার ইংরেজ-ফরাসী দাবানল জ্বলে উঠেছে সেখানে। কলকাতার ইংরেজরা প্রমাদ গণলে। একে নবাবের ফৌজ-বাহিনীর সংখ্যা বিস্তর। সেদিকেও এক ভয়। আরেক ভয় যদি এদেশের ফরাসীরা নবাবের হাতে হাত মিলোয়। অগত্যা সন্ধির একটা সুবন্দোবস্তের চেষ্টা করতে লাগলেন ইংরেজরা।

কলকাতায় উমিচাঁদের বাড়িটা সেকালের কলকাতার একটা দর্শনীয় বস্তু। নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবার বসল সেইখানেই।

ক্লাইভ পক্ষের শান্তিদূত হয়ে এল দুজন কুঠিয়াল সিভিলিয়ান। সঙ্গে আরেকজন। তিনি বাঙালী। মুন্‌শী নবকৃষ্ণ। নবাব তাঁদের দেওয়ানের পটমণ্ডপে সন্ধিপত্রের চুক্তি ইত্যাদি প্রস্তুত করার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে গেলেন। ঠিক সেই সুযোগে উমিচাঁদ এসে কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললেন তাঁদের। কোথায় পড়ে রইল পটমণ্ডপ। পড়ি কি মরি করে রাত্রির অন্ধকারে গা লুকিয়ে ছুটতে লাগলেন তাঁরা বরানগরে ক্লাইভের শিবিরের দিকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন ক্লাইবের ঘুম ভেঙে গেল ডাকাডাকিতে।

কি ব্যাপার, তোমরা এমন সময়ে এখানে? কি হয়েছে!

হয়েছে সর্বনাশ। উমিচাঁদ খবর দিলেন যে, নবাবের কামানগুলো কলকাতায় এসে পৌঁছয়নি এখনো। তাই দুর্বল নবাব সন্ধির ছল করে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে সময় নিচ্ছেন। যদি আমাদের বাঁচতে হয়—তাহলে এখনই নবাবকে আক্রমণ করতে হবে। নইলে আমাদের মরণ।

গভীর নিশুতি রাত। নবাবের শিবিরে ঘুমের রাজত্ব। ৬,০০০ হাজার সিপাই, ১৮০০ হাজার অশ্বারোহী, ৪০টা কামান সব ঘুমন্ত। এমন সময় শীতের রাত্রির নিস্তব্ধ, নিঃঝুম, অবসাদে ভাঙা কলকাতা কামানের ঘন ঘন গর্জনে কেঁপে উঠল। আতঙ্কগ্রস্ত নবাব শিবিরের সেনারা ঘুমের ঘোর একটু কাটতেই বুঝে নিল, ইংরেজরা তাদের আক্রমণ করেছে। বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে তারাও এসে দাঁড়াল কামানের গোড়ায়।

ভোর থেকে ভীষণ কুয়াশা, আকাশ থেকে ধুলোর কণা পর্যন্ত যেন একটা

পুরু ধূসর চাদরে ঢাকা। কোথায় যে কি কিছু দেখবার উপায় নেই। প্রথম দিকটায় ইংরেজরা খুব এক প্রস্থ আক্রমণ চালালেও সকাল হতেই লড়ায়ের মোড় ঘুরল। নবাবের সৈন্যেরা কুয়াশার অন্ধকারে এলোপাথাড়ি কামান চালালে। ইংরেজদের বারুদের গাড়িতে আগুন লেগে বারুদ ফাটতে লাগল ফটাফট্। ইংরেজের সেনারা পালাতে শুরু করল ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে। আর তারই পিছনে তাড়া করেছে নবাবী-ফৌজ।

দলে দলে সৈন্যক্ষয় দেখে ক্লাইভের এবার টনক নড়ল। জগৎ শেঠের উকিল রঞ্জিৎ রায় ও উমিচাঁদ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে নবাবের কাছে চললেন ইংরেজ পক্ষ থেকে। নবাব তখন গোবিন্দ মিত্তিরের বাগান বাড়িতে। ইংরেজ দূতদের আকস্মিক পলায়নের ব্যাপারে একটা অশুভ কিছুর ইঙ্গিত পেয়ে তিনি আগে থেকেই পারিষদবর্গের পরামর্শে উমিচাঁদের বাগান থেকে সরে গিয়েছিলেন।

১৭৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুআরি। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর শীলমোহর পড়ল। এটাকেই বলা হয় আলিনগরের সন্ধি।

এই সন্ধির ফলে বাদশা ফারুকশিয়র ইংরেজদের যে ফরমান দিয়েছিলেন, তার সর্তগুলো পুরোপুরি বজায় রইল। কলকাতা লুণ্ঠনের সময় ইংরেজদের যা যা ক্ষতি হয়েছে তার খেসারৎ দেওয়া হবে। কলকাতায় কেল্লা বানাবার স্বাধীনতা ইংরেজদের। কলকাতাতেই একটা টাঁকসাল বসিয়ে ইংরেজরা বাদশাহের নামে সিক্কা টাকা তৈরি করতে পারবে। এই সঙ্গে আরও ব্যবস্থা হল যে এখন থেকে নবাব দরবারে একজন করে ইংরেজ প্রতিনিধি থাকবে। ওয়াটস্‌কে প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করলেন নবাব নিজে।

॥ লক্ষবাগের আগুন ॥

সবাই ভেবেছিল,—এবার বোধ হয় শান্তি। আর যুদ্ধ নয়। ইংরেজরা রাজত্বলাভের রাস্তা ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের সেরেস্তাখানায় মুখ লুকোবে। নবাব মন দেবেন প্রজানুরঞ্জনে। শোভাসিংহের বিদ্রোহ, বর্গীর আক্রমণ, ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ—একটার পর একটা ঝড়-ঝাপটায় ক্ষতবিক্ষত, ত্রস্ত, বিত্রস্ত বাংলাদেশ বুকের ক্ষতগুলোকে সারিয়ে সুস্থ, সুন্দর সমৃদ্ধিময় হয়ে উঠবে আবার। শুরু হবে শান্তি পর্ব।

কিন্তু ইতিহাস রমণীর চলনটি বড়ই বাঁকা। আর এইটেই তাঁর মস্ত গর্ব। যেদিকে ঝোপ-ঝাড়, নদী-নালা, পাহাড়-পাঁচিল, যুদ্ধ-গোলযোগ, হত্যা আর ধ্বংস তাঁর যত টান সেই দিকে।

'আলিনগরের সন্ধি-'র পর কটা দিন যেতে না যেতেই—আবার একটা ঝটকা হাওয়া উঠল ডানা ঝাপটে। মাদ্রাজ থেকে চিঠি এল কলকাতায়। ইংলণ্ডে আর ফ্রান্সে আবার যুদ্ধ বেধেছে। তুমুল লড়াই। তোমরা যারা কলকাতার ইংরেজ—তারা এখনি চন্দননগর দখল করবার জন্যে কোমর বাঁধো।

অগ্রদ্বীপের কাছাকাছি এসে রাজধানীতে ফিরবার মুখে সিরাজউদ্দৌলা শুনলেন—

তাঁর অনুপস্থিতির এই সামান্য ক-দিনেই ইংরেজরা চন্দননগর লুণ্ঠন আর আক্রমণের জন্যে জামার হাতা গুটোচ্ছে, হাতিয়ার শানাচ্ছে। মাত্র এক সপ্তাহ কাটেনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের পর। এরই মধ্যে এই? রাগে রক্ত মাথায় উঠে এল নবাবের।

ওয়াটস্-এর চোখ-টিপ্‌নী খেয়ে উমিচাঁদ এসে নবাবের সামনে ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে দিব্যি গাললেন—এসবই মিথ্যে খবর, হুজুর। ইংরেজ কখনো সন্ধিভঙ্গ করবে না। তাদের মত সত্য-প্রিয় জাত ভূ-ভারতে নেই।

রাগের চোট কমে আসতেই চট্ করে এক চিঠি লিখে বসলেন ওয়াটসনের কাছে, কলকাতায়। আমার মনে হচ্ছে হুগলীর কাছের ফরাসী কুঠি আক্রমণ করে দেশময় একটা যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চাও তোমরা। এই তো সবে সেদিন সন্ধি হয়েছে। এরই মধ্যে যুদ্ধ?

সামান্য চিঠিতে কি চিরকুটে কুটিল ইংরেজের যুদ্ধচক্রান্ত যে বন্ধ বা বাতিল হবে না—নবাব সেটা বেশ ভালো করেই বুঝতেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে নন্দকুমার রায়কে, পরে মহারাজা, হুগলীর ফৌজদার করে হুগলী, অগ্রদ্বীপ, আর পলাশীতে সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। কিন্তু নবাবের মুর্শিদাবাদে না পৌঁছতে পৌঁছতেই খবর এল—ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করাই স্থির করে ফেলেছে।

সিরাজউদ্দৌলা আবার চিঠি লিখলেন ওয়াটসনকে। বাইবেলের কাছ থেকে ধর্মের পাঠ নিয়ে, পরমেশ্বর আর যীশুর দোহাই দিয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছ তোমরা। অথচ কাজের বেলায় সবই দেখছি ভিন্ন ব্যাপার। মহারাষ্ট্রীয়দের বাইবেল নেই। তবু তারা সন্ধির মর্যাদা দিয়েছে।

ওয়াট্‌সন সত্যি সত্যিই এই যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে মোটে মুখ খোলেননি। যা কিছু হয়েছে সবই একা ক্লাইভের উদ্যমে। হুগলীর ফৌজদার, নন্দকুমারের সঙ্গে উমিচাঁদের মধ্যস্থতায় একটা গোপন বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। ইংরেজ সৈন্য হুগলীতে ঢুকলেই, ফৌজদার তাঁর সৈন্য সামন্তকে অন্য অছিলায় দূরে সরিয়ে রাখবেন। সবই প্রস্তুত। গভর্নর ড্রেক, মেজর কিলপ্যাটরিক, আর বীচার সবাইই একমত। ওদিকে মুর্শিদাবাদ থেকে ওয়াটস্-এর ঘন ঘন চিঠি আসছে—নবাবের মতামতের মূল্য দিও না। তাঁর পায়ের তলায় খুব শক্ত মাটি নেই। রাজকর্মচারীরা রাজদ্বেষী। যা করবে তাড়াতাড়ি করো।

তাড়াতাড়ি হয় কি করে? ওয়াটসন নবাবের অনুমতি না পেলে যুদ্ধে

নামবেন না। আবার ওয়াটসনের অনুমতি না পেলে যুদ্ধ জাহাজগুলো নদীর জল থেকে পা গুটিয়ে ডাঙায় নোঙর গেঁথে একবার যে বসবে আর নড়বে চড়বে না। এযে দেখি ভয়ানক বিপদ!

হঠাৎ মুশকিল আসান হয়ে গেল। নবাব তাঁর শেষ চিঠিতে ওয়াট্‌সনকে লিখলেন—তুমিও তো একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সদাশয় মহাত্মা; তুমিই বিচার করে দেখ যে, পরম শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তবে তাকে প্রাণভিক্ষা প্রদান করো কিনা। তার সরলতায় যদি সন্দেহ না থাকে, তবে তুমি তাকে দয়া করে থাক, সন্দেহ হলে আলাদা কথা—তখন যেমন বোঝো তেমন আচরণ করে যাক।

বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সদাশয় মহাত্মা ওয়াট্‌সন চিঠির শেষ ছত্র ক-টিতে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন নবাবের যুদ্ধের স্বপক্ষে সম্মতিদানের ইঙ্গিত। দীর্ঘ দিনের ইতস্তত ভাবটা কেটে গিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো চড়াও হয়ে যুদ্ধ করার নেশা।

বাজলো রণবাদ্য। কাডা, নাকাড়া, দুন্দুভি। জলপথে ওয়াট্‌সন, স্থলপথে ক্লাইভ সসৈন্যে চন্দননগরের দিকে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

ভাগিরথীর প্রশান্ত উজ্জ্বল স্রোতের ওপর যুদ্ধজাহাজের দৈত্যকায় প্রলম্ব ছায়াগুলো যেন দারুণ উত্তেজনায়, উন্মাদনায় দলবেঁধে নাচতে লাগল। শিকার যাত্রার আগে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অধিবাসীরা যেমন নাচতো দল বেঁধে। আর তার তীরে তীরে ঘন জঙ্গলের চাপ অন্ধকাব ভেঙে প্রকাণ্ড অজগরের মত সারিবদ্ধ ইংরেজ সেনাদল রক্তের, না কি হত্যার, না কি লুণ্ঠনের, কিসের যেন এক লোলুপ আকাঙ্ক্ষায় এগিয়ে চলল অবিশ্রাম।

৭ই ফেব্রুআরি আলিগরের সন্ধি হয়েছিল। ৭ই মার্চ ইংরেজ সেনা চন্দননগরের প্রান্তে এসে যুদ্ধের তাঁবু খাটাল। যুদ্ধের আতঙ্কেই হবে বুঝি বা, ভাগিরথীর উচ্ছলপ্রবাহ ভরে উঠল যেন এক ভীষণ মূর্ছায়, স্পন্দনহীনতায়, স্তব্ধতায়।

> "—গঙ্গা তীরে, নীরে,
> জ্বলিল সমরানল ধরি ভীমসাজ;
> ভয়ে ভীত ভাগিরথী বহিলেক ধীরে!
> নবম দিবস পরে নভঃ আলো করে,
> উঠিল ব্রিটিশ ধ্বজা চন্দননগরে!"

পরাজিত ফরাসীরা বন-জঙ্গল ঝাঁপিয়ে, নদী নালা পেরিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য,

গৃহায়-সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে কোনমতে ইংরেজ আক্রমণের অমানুষিক অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে পালাতে লাগল। আশ্রিত বণিকের এই নিদারুণ দুর্দশায় মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষের চোখে জল এল সমবেদনায়। নবাব নিজে তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দিলেন। জায়গাটা হল কাশিমবাজার।

ব্যাপার দেখে টনক নড়ল ক্লাইভের। এ কি করে হয়? নবাবের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে যে,—যে ইংরেজের শত্রু—সে নবাবেরও শত্রু। তাহলে কাশিমবাজারে ফরাসীরা আশ্রয় পায় কেমন করে?

ক্লাইভ নবাবকে লিখলেন—কাশিমবাজার থেকে ফরাসীদের উচ্ছেদ না করলে, এইটেই প্রমাণিত হবে যে নবাবের সঙ্গে আমাদের সখ্যতা ফুরিয়েছে।

চিঠি পড়ে নবাব কোম্পানীর ঔদ্ধত্যে এতখানি ক্ষেপে গেলেন যে রাজদরবারের প্রকাশ্য জনসমাবেশেই তিনি ওয়াট্‌স সাহেবকে শূলে চড়াবেন—এমনি ধারা উক্তি করে বসলেন।

ওয়াটসন ক্লাইভের নির্দেশে নবাবের মতামত জানবার জন্যে রোজই একটা করে চিঠি লিখছেন। প্রথমটা নরম সুরে লিখলেন। উত্তর নেই। একটু মিঠেকড়া করে লিখলেন। উত্তর এল না। অগত্যা তর্জন গর্জন ছাড়লেন। নবাব নিরুত্তর। শেষে শুরু হল স্তব-স্তুতি, মিনমিনে সুরের মিনতি। জবাব নেই তবুও।

এদিকে পাত্র-মিত্ররা নবাবকে দু-বেলা দু-সন্ধ্যে উঠতে বসতে বোঝাতে শুরু করেছে ফরাসীদের কাশিমবাজারে আশ্রয় দেওয়ার ফলে দেশে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে একটু একটু করে।

কথাটা শুনে নবাবের ভুরু দুটো ছিলায় টান পড়া ধনুকের মত বেঁকে উঠল। শান্তিভঙ্গ! ইংরেজদের ক্ষতিপূরণের টাকার অধিকাংশই শোধ দেওয়া হয়েছে। এমন কি কাশিমবাজার কুঠি আক্রমণের সময় ইংরেজদের 'ফিল্ডপিস' নামের যে-সব ছোট ছোট কামান দখল করা হয়েছিল—সেগুলোও ফেরৎ পাঠান হয়েছে। তবু শান্তিভঙ্গ? অথচ ইংরেজরা যে হুগলী, হিজলী, বর্ধমান, নদীয়ায় যখন যা খুশি অত্যাচার চালাচ্ছে—সেটা শান্তিভঙ্গ নয়? কলকাতার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বলে কালীঘাটকে তারা নিজেদের আয়ত্তে আনার চক্রান্ত আঁটছে সেটা শান্তিভঙ্গ নয়?

শেষ পর্যন্ত পাত্র-মিত্রদের অবিরাম আবেদন নিবেদনের ফলে নবাবের মন

থেকে রাগের আগুন কিছুটা নিভে এল। নবাব বুঝলেন—সন্ধিপত্রের স্বাক্ষর-কাটা জমিতে এই যে সবেমাত্র বন্ধুত্বের চারা ফুটতে শুরু করেছে, একে এখনি-মুড়িয়ে ফেলাটা ভালো হবে না। ইংরেজদের সঙ্গে কলহ বাধলে —ফ্যাসাদ অনেক। অগত্যা ডেকে পাঠালেন ফরাসী অধ্যক্ষ মঁসিয়ে লা-কে। অনুরাগীদের বিচ্ছেদ-বেদনায় হয়তো নবাবের কথাগুলো ঠোঁটের ডগায় এসে কেঁপে কেঁপে উঠছিল বারবার। তবুও আদ্যোপান্ত সব বিবরণই তিনি খুলে বললেন লা-কে। সব শুনে লা নবাবকে জানালেন—আপনার অধিকাংশ মন্ত্রী, সেনানায়ক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী আপনার ওপর আদৌ সন্তুষ্ট নন। ইংরেজদের সঙ্গে মিলে তারা আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র আঁটছে। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে যতদিন আমি এখানে আছি ততদিন আপনার ভয় নেই। যুদ্ধের সময় বিপন্ন মুহূর্তে আপনাকে সাহায্য করবো—আমরা ছাড়া আর কেউ নেই নবাব আপনার।

সব বুঝেও সিরাজউদ্দৌলাকে জানাতে হল, আপাতত দেশের শান্তিরক্ষার জন্যে আপনাদেব পক্ষে এখন পাটনা যাওয়াটাই মঙ্গল। প্রয়োজনের দিনে আমি আবাব ডেকে নিযে আসবো। লা কোন রকম দ্বিধা-দ্বিরুক্তি না করে শ্রদ্ধা-নত নমস্কারে নবাবের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তার আগে কাঁপা গলায় শুধু এই কথা ক-টি নবাবকে জানিযে গেলেন যে, এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। আব দেখা হবে না।

বহুদিন ধরে এই দুটি কথার একটি কাঁটা নবাবের সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে ব্যথিয়ে তুলল। কী নিঃসঙ্গ, নির্জন জীবন! বন্ধু বলে কেউ নেই পাশে। কেউ আর আপন নেই কোনখানে। সত্যিই কেউ নেই নাকি? কেন উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ, মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ—এঁরা সব কোথায়?

এঁরা সবাই গুপ্ত মন্ত্রণাগাবে।

কিসের মন্ত্রণা?

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন-চ্যুতির মন্ত্রণা। মানিকচাঁদ কলকাতা লুণ্ঠনের সময় ভুরি ভুরি টাকা নিজের কুক্ষিগত করেছেন বলে নবাব তাঁকে বন্দী করেছিলেন। শেষে দশ লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড দিয়ে কোনরকমে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর সেই প্রতিহিংসা-কামনার আগুন আজও বুক থেকে নেভেনি।

অভিজ্ঞ রাজা দুর্লভরামের ওপর যদি নবীন মোহনলাল কর্তৃত্ব করে—তিনি তা সইবেন কেন?

মন্ত্রী মীরজাফরের মত মহামান্য ব্যক্তিকেও নবাব সন্দেহ করেন—এ কি কম স্পর্ধার কথা। বয়োবৃদ্ধ জগৎ শেঠকে সামান্য ভুলত্রুটির জন্যে প্রকাশ্য দরবারে অপমান করতে নবাবের বাধে না। সহ্যের একটা সীমা আছে।

আর উমিচাঁদ সার ভেবেছেন যে, নবাবী রাজত্ব তো যায় যায়। ইংরেজদেরই এখন গায়ের জোরটা সবচেয়ে বেশী। অতএব এখন থেকে সেই দিকে না ঝুঁকলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

মন্ত্রণা সভার স্থান জগৎ শেঠের অন্দরমহল। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলার একজন স্বনামধন্য ধনী ব্যক্তি। তিনিও এই মন্ত্রণাসভায় সোনায় সোহাগা হয়ে যোগ দিয়েছেন। ইংরেজদের ওপর তাঁর সোহাগও কম নয়। আর এই সমস্ত কিছুর উদ্যমের পেছনে রয়েছে আরেকজনের উৎসাহ। তিনি ঘসেটি বেগম। সিরাজের মতিঝিল লুণ্ঠনের পরমুহূর্ত থেকেই তিনি আহত-নাগিনীর মত সিরাজের মৃত্যুর ছিদ্রপথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

এদিকের বন্দোবস্ত যখন সব পাকাপাকি, তখন একদিন ওয়াটস-এর কাছে গোপনে দূত এল মন্ত্রণাসভার পক্ষ থেকে। ইয়ার লুৎফ খাঁ। মধ্যস্থ উমি-চাঁদ। পরের দিন আবার এল আরেকজন। খোজা পিত্রু। কথাবার্তা সব পাকাপাকি হয়ে গেল সেই দিনই। ইংরেজরা যোগ দিলে নবাবের বিরুদ্ধে যে কোন মুহূর্তেই বিদ্রোহ ফেটে পড়বে। এখন যদি এতে ইংরেজদের মত থাকে তাহলে যেন ক্লাইভ এই মুহূর্তেই সৈন্য সামন্ত নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন।

হলও তাই। ১লা মে ক্লাইভ কলকাতায় ফিরে এলেন। অর্ধেক সৈন্য চন্দননগরেই গা ঢাকা দিয়েই রইল। বাকী অর্ধেক এল কলকাতায়। চিঠি গেল নবাবের কাছে—আমরা তো সৈন্যদল সরিয়ে নিয়ে এলাম। আপনার সৈন্য কেন এখনও পলাশীতে ছাউনি বেঁধে বসে আছে?

এই চিঠির সঙ্গে গোপনে আরেকটা চিঠি গেল ওয়াটস-এর কাছে। মীর-জাফরকে বলো কিছুতেই তিনি যেন ভয় না পান। জীবনে কোনদিন পিছু হটেনি এমনি পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি যথাসময়ে তাঁর সঙ্গে মিলবো।

ইতিমধ্যে গুপ্তচর মতিরাম মারফৎ সিরাজউদ্দৌলার কানে এল—ইংরেজরা অর্ধেক সৈন্য কাশিমবাজারে লুকিয়ে রেখেছে। নবাবের আদেশে গোটা কাশিম-বাজার উল্টেপাল্টে খুঁজে, বন বাদাড় ঠেঙিয়ে কোথাও কোন সৈনিকের দেখা

মিললো না। তবুও নবাবের মনে সন্দেহ। তিনি মীরজাফরকে হুকুম করলেন পলাশী যেতে। মীরজাফর সরে গেলেই বিদ্রোহীদের ত্রিভুবন অন্ধকার। অথচ না গেলেও নবাবের মনে সন্দেহ বাড়বে—অগত্যা যেতেই হল।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে স্ক্রাফটন নামে একজন সাহেবের সৌজন্যমূলক ব্যবহারে নবাব ইংরেজদের ওপর থেকে সন্দেহের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। মীরজাফর ফিরে এলেন পলাশীর মাঠ থেকে।

মীরজাফরের ফেরার খবর পেয়েই ইংরেজ দরবারে বসল মন্ত্রণাসভা। খসড়া তৈরি হল সন্ধিপত্রের। পাণ্ডুলিপিতে পাওনা-গণ্ডার কথাটাই সব চেয়ে বড়। মীরজাফরের জন্যে আমরা যে এত করবো—তার বিনিময়ে একটা মোটা দক্ষিণা চাই বৈকি! তা ছাড়া সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের ফলে অনেক ক্ষতি হয়েছে। তারও ক্ষতিপূরণ চাই বেশ কিছু। গদী পাওয়া কি মুখের কথা!

১৭ই মে ইংরেজ দরবারে বহু বাদানুবাদের পর ঠিক হল কোম্পানী বাহাদুর পাবে ১ লক্ষ টাকা। ইংরেজ পাবে ৫০ লক্ষ টাকা। দেশীয় বণিকরা পাবে ২০ লক্ষ। আর্মেনীয়রা ৭ লক্ষ। প্রধান প্রধান পাণ্ডাদের পাওনা গণ্ডা আলাদা। এ ছাড়া নৌ-সেনা আর সৈন্য বিভাগের জন্যে ২৫+২৫ মোট ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হল হিসেবে। কোথাও এতটুকু ভুলচুক নেই অঙ্কে।

কিন্তু কলঙ্ক ঘটাল উমিচাঁদ। উমিচাঁদ সেই প্রথম থেকে গোঁ ধরে বসেছেন তাঁর নগদানগদি ৩০ লক্ষ টাকা চাই। নইলে নবাবের কানে সব খবর ফাঁস করে দেবেন। তখন সকলেরই বরাতে ফাঁসীর দড়ি।

উমিচাঁদ ধূর্ত। কিন্তু ক্লাইভ ধূর্তের শিরোমণি। উমিচাঁদকে অর্ধচন্দ্র দেওয়ার ব্যবস্থাটা মাথা খাটিয়ে বার করতে তাঁর খুব বেশী সময় লাগলো না। তাঁর নির্দেশে সন্ধিপত্র তৈরি হল দুটো। একটা সাদা কাগজে। সেটা আসল। আরেকটা লাল কাগজে। নকল। নকলটাতেই রইল উমিচাঁদের ৩০ লক্ষের কথা। সাদাটায় সবই সাদা। জাল সন্ধিপত্রে ওয়াটসনের সইটাও জাল করা হল।

৪ঠা জুন তারিখে মীরজাফর মুর্শিদাবাদে ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। সন্ধিপত্রের প্রথম দু-ছত্রে লেখা ছিল—

"ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যতদিন আমি জীবিত থাকিব, এই সন্ধিপত্রের নিয়ম পালন করিব।"

এর নীচে আরও ১৩ দফা সর্তাবলী। মাঝখানে মীরজাফরের স্বহস্ত লিখিত দস্তখত।

ইতিমধ্যে গুপ্তচরের মুখে নবাব খবর পেলেন যাবতীয় গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ঘটনাবলীর। মীরজাফরকে তিনি সৈন্যদের চোখে চোখে বন্দী করে রাখলেন। পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে ভাবতে লাগলেন কবে তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করা যায়।

এদিকে ১৬ই জুন হাওয়া খাওয়ার ছল করে ওয়াট্‌স সাহেব হাওয়া হলেন মুর্শিদাবাদ থেকে। নবাবের মনে সন্দেহ আর ক্রোধ আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। তিনি ইংরেজদের লিখলেন—এমন যে একটা হবে অনেকদিন থেকেই তা আমার মনে হচ্ছিল। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করেই আমি পলাশী থেকে সৈন্য উঠিয়ে আনতে রাজী হইনি। আমার দ্বারা যে সন্ধিভঙ্গ হল না সে জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

চিঠি লিখলে কি আর হবে। বিদ্রোহী পক্ষের দেহ তখন যুদ্ধের পোশাকে ঝলমল করছে।

সেদিন ২২শে জুনের এক বিকেল। ভাগিরথী ডিঙিয়ে ইংরেজ সৈন্য পলাশীর দিকে পা বাড়াল। প্রবল জল ঝড় বজ্রাঘাত ঘাড়ে নিয়ে ইংরেজ সৈন্য রাত একটার সময় এসে পৌঁছল পলাশীর আমবাগানে। লক্ষবাগে। এর চারপাশে এক বুক মাটির দেয়াল। পাশে খাল।

এরই শ-খানেক হাত দূরে পশ্চিমে নবাবের ইঁটের তৈরি মৃগয়াগৃহ। বৃষ্টিতে ভিজে, ঝড়ের ঝাপটে ক্লান্ত ক্লাইভ সেই মৃগয়াগৃহের ভেতরেই গা এলিয়ে দিলেন বিশ্রামে।

পরের দিন আর পাঁচটা দিনের মতই সূর্য উঠল আকাশ রক্তে রাঙিয়ে। সেদিন "১১৭০ হিজরী পাঁচ সাওয়াল রোজ পঞ্জসোম্বা।" ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন—বৃহস্পতিবার।

যুদ্ধের বাজনা বাজছে ডিম্‌ডিম্‌। লক্ষবাগের গাছে গাছে হাওয়া বইছে শন্‌ শন্‌। মরা ডালের হাড় কাঁপছে খড খড়। পাতাগুলো যেন চিৎকার করে কি বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে বারবার। এমনি সময় বেলা ৮টায় ফরাসী বীর সীনফ্রের কামান একটা প্রবল গর্জনে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলল—গুম্‌—গুউম-গু-উ-উম।

একদিকে ইংরেজ। ৯৫০ জন গোরা। ২১০০ সেপাই। ৮টা কামান। আর ২টো বড় তোপ।

আরেকদিকে নবাব। ৫০ হাজার সৈন্য। ৫৩টা কামান।
কামানে কামানে মাত্র আধ ঘণ্টা যুদ্ধ। তাতেই ইংরেজদের ১০ জন গোরা আর ২০ জন 'কালা আদমী' সেপাই সাবাড়। প্রত্যেক মিনিটে একজন করে ইংরেজ যদি মরতে থাকে তো একদিনের যুদ্ধেই সব কটা ইংরেজকে কবরস্থ হতে হবে এই লক্ষবাগে। সর্বনাশ সমুৎপন্ন দেখে ক্লাইভ আমবাগানের আড়ালে গা ঢাকা দিলেন। এদিকে নবাবের সৈন্য ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ইংরেজরা আমবাগানের পাঁচিলে গর্ত কেটে তারই মুখে কামান বসিয়ে আক্রমণ ঠেকাতে লাগল। যুদ্ধ করছে একা মীরমদনই। অন্যেরা সব পটে আঁকা ছবি। 'এক ঠাঁই রহে চির স্থির'। কিন্তু—

"তীরে তীরে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে,
একেলা মীরমদন বলত কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কোর্তা গায়
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।"

বেলা এগারোটা। আচমকা মেঘ জাঁকিয়ে বৃষ্টি এল ঝম্‌ঝম্‌। বেশীক্ষণ হল না। পশলা খানেকের পরেই চুপ। ইংরেজ সেনাদের মাথার ওপরে আমবাগানের আঁচল। তাই তাদের কামান বন্দুক বারুদ কিছুই ভিজলো না। কিন্তু ভিজে বারুদে বোবা হয়ে গেল নবাবের কামানের মুখ। মীরমদনের উৎসাহ তবুও নেভেনি এতটুকু। জয়ের জন্যে তিনি মহোৎসাহে লড়ছেন। হঠাৎ একটা গোলা এসে বিঁধল তাঁর উরুতে। আঘাত গুরুতর। ধরাধরি করে শিবিরে নিয়ে আসা হল। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর চোখে মুখে নিশ্চিত মৃত্যুর ছায়া দাগ কেটে বসেছে। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি নবাবকে শুধু জানিয়ে গেলেন—প্রধান সেনাপতিরা বিশ্বাসঘাতক।

সিরাজের অদম্য উৎসাহ অর্ধেকেরও বেশী ভেঙে পড়ল এই বীরবাহুর পতনে। একা মোহনলাল যুদ্ধ চালাতে লাগলেন।

সামনে সমূহ বিপদ। নবাব নিজের রাজমুকুট মীরজাফরের পায়ের তলায় লুটিয়ে দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন তাঁর। মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করে শপথ নিলেন—তিনি নবাবকে রক্ষা করবেন। তবে এখন তো দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যে। যুদ্ধ আজকের মত বন্ধ থাক্‌। আর এগিয়ে কাজ নেই।

যুদ্ধ বন্ধ হল। সবাই যে যার শিবিরে। মীরজাফর খাঁও নিজের শিবিরে ফিরে তখনি চিঠি লিখতে বসলেন ক্লাইভকে। রাত্রে আক্রমণ করলেই সব কাজ শেষ

হবে। অবিশ্যি এ চিঠি যথাসময়ে ক্লাইভের হাতে পৌঁছয়নি।

যুদ্ধের জোয়ারে ভাঁটা পড়তেই ক্লাইভ সাহেব ভিজে পোশাক ছেড়ে সবেমাত্র তন্দ্রায় একটুখানি ডুবুডুবু হয়েছেন এমন সময় চিৎকার। কি ব্যাপার? না মেজর কিলপ্যাটরিক কারো মতামত না নিয়েই ফরাসীদের পিছু তাড়া করেছেন। ক্লাইভ প্রথমটায় রেগে অস্থির। পরে ভেবে দেখলেন—মন্দ কি। ভালোই তো!

তারপর আর না ঘুমিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়লেন কিছু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। চন্দননগরের রাগটা ঠিকমত মিটিয়ে নেবার সুযোগ পাওয়া গেছে দেখে ফরাসীরাও মহাবিক্রমে কামান ছুঁড়তে লাগিল। মোহনলাল মরিয়া।

তবু দেখতে দেখতে ইংরেজ সৈন্য নবাব শিবিরের দুশো গজের মধ্যে পৌঁছে গেল। তারপর আরো কাছে। আরো।

সিরাজউদ্দৌলার চোখের সামনে কেবল অন্ধকার। আর উদ্বেগ। উত্তেজনা নিভে আসছে একটু একটু করে। উৎসাহ কামানের বারুদের চেয়েও আরও ভিজে। তিনি একটা দ্রুতগামী হাতীর পিঠে চেপে রাজধানীর দিকে পালালেন।

এর পরও যুদ্ধ চলল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। পলাশীর মাঠে আমবাগানের মাথায়, কামানের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়িয়ে আরো ওপরে পত্‌পত্‌ করে উড়তে থাকল কোম্পানীর নিশান। দেশের লোক অবাক হয়ে দেখতে লাগল এই শোচনীয় দৃশ্য।

"কি হল রে জান
পলাশী ময়দানে ওড়ে কোম্পানী নিশান।"

পরের দিন সকালে সসৈন্যে ক্লাইভ চললেন দাদপুরে। সেখানে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ হবে মীরজাফরের সঙ্গে।

দাদপুর লোকে লোকারণ্য। ভয়ে হাড়ে হাড়ে ঠোকর লাগে ক্লাইভের। মীরজাফর যে এখন তাঁর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবেন তা জানা নেই। আর এই অগণিত মুর্শীদাবাদবাসী যদি এই মুহূর্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শুধু মাত্র একটা করে ঢিল ছোঁড়ে তো বাংলাদেশের সমস্ত ইংরেজ এক জায়গায় জড়ো হলেও তাদের মরতে কয়েকটা মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। ওদিকে মীরজাফরেরও বুক কাঁপছে টিপ্‌টিপ। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে জল। ইংরেজরা যেভাবে সসৈন্যে অস্ত্রে শস্ত্রে সেজেগুজে এসেছে—এখন যে কি

বলতে কি হয় তা কে জানে।

এমন সময় ক্লাইভ নিজে এসে তাঁকে সম্বোধন করলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি বলে। তারপর আলিঙ্গনে বাঁধলেন এই নব-নবাবকে। এক ঘণ্টা ধরে আলোচনা চলল ইংরেজ নায়কের সঙ্গে মুসলমান নবাবের। তারপর ঠিক হল মুর্শিদাবাদ অভিযানের কার্যক্রম।

পথের মাঝখানে মীরজাফরের কানে খবর এল —নবাব পালিয়েছেন রাজধানী ছেড়ে। প্রাণাধিকা লুৎফান্নেসা সঙ্গে আছে। আর কিছু প্রিয়তমা বেগম। কিছু মূল্যবান ধন-রত্ন। ৫০টা হাতী। তখনি মীরজাফরের আদেশে গুপ্তচর ছুটলো দিকে দিকে, দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে, জলে ডাঙায়। নবাব তখন মালদহের মাঝখান দিয়ে মহানন্দা আর কালিন্দী বেয়ে বোড়াল গ্রামের একটা ছোট্ট কুটিরে আশ্রয় নিয়েছেন। রাজমহল থেকে প্রায় কয়েক ক্রোশ দূরে। আর রাজত্ব নয়। সিংহাসন নয়। যুদ্ধ নয়। শুধু বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। পৃথিবী আর প্রেম এই দুয়ের আকর্ষণে বাঁচা।

কিন্তু তার আগেই গুপ্তচরের সাহায্যে মীরজাফরের সৈন্য এসে বন্দী করলো তাঁকে। মীরজাফর-পুত্র মীরণের শোবার ঘরের একটা কামরায় হল তাঁর আশ্রয়। "১৫ সাওয়াল ১১৭০ হিজরীকো আপনে নৌকরুণকি কয়েদমে মুর্শিদাবাদ আয়া।"

সবই তো হল। কিন্তু সিরাজকে হত্যা করতে না পারলে তো সিংহাসনের কাঁটা সরে না। সে কাজটা করবে কে? কেউই রাজী হয় না। উপরন্তু শহরের ওপর দিয়ে ক-দিন ধরে একটা একটানা বিক্ষোভের ঝড় বইছে। মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষের মনে মীরজাফরের অর্থলালসা, রাজ্যলাভের ষড়যন্ত্র, ইংরেজদের শয়তানী সব দিবালোকের মত স্পষ্ট। মুর্শিদাবাদের রাজপথে অলি-গলিতে, দরজা ভেজানো ঘরে, অন্ধকারে, মৃদু আলোর নীচে, বাতাস শুনবে না এমন চাপা গলায় ফিস্‌ফাস চলেছে সিরাজউদ্দৌলার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। মাতালের মত টলমল টলছে সারা শহর—এক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগের আবেগে।

মীরণ যাকে সামনে পান তাকেই শুধোন—খুন করতে পারবে নবাবকে? সবাই বলে—না। একটিমাত্র উত্তর না। নবাব আমাদের নবাব। দেশের রাজা। আমাদের আলিবর্দীর নাতি। দুধের ফেনার মত বিছানায় সে ঘুমিয়েছে। ফুলের পাপড়ির রস নিংড়ে নিংড়ে তার রক্ত। চাঁদের অর্ধেক

আলো তার গায়ের রঙে। তাকে তোমরা বেড়ী পরিয়েছ লোহার। শোবার জন্যে দিয়েছ পাথরের মেঝে। আর আমরা তাকে খুন করবো ?

মীরণ ম্রিয়মান। এত বড় মুর্শিদাবাদে কি একটা ঘাতক নেই। বিশ্বাসঘাতকের দেশে ঘাতক নেই ?

নেই! কে বলে নেই। এই তো আমি রয়েছি। আলিবর্দীর আন্তরিক ভালবাসায় আবাল্য মানুষ আমি। সিরাজের সস্নেহ বন্ধুত্বে শৈশব থেকে এত বড় হয়েছি। দাও, অস্ত্র দাও আমার হাতে।

মীরণের সামনে এসে দাঁড়াল মহম্মদী বেগ।

তারপর একটা নিষ্ঠুর অধ্যায়। বিদ্যুতের মত ধারালো একটা আকণ্ঠ তীক্ষ চিৎকার আর আর্তনাদ। জীবনের আকাঙ্ক্ষা, বাঁচার ইচ্ছা, হৃৎপিণ্ডের শেষ স্পন্দন, শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে পাকিয়ে পাকিয়ে ঘূর্ণীর মত ঘুরতে থাকল ঘরময়।

কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভারী স্তব্ধতা। তারপর কাটা মাংসের গা বেয়ে গল গল রক্তের স্রোত। রাজপথে তেমনি আরেক স্রোত। টুক্‌রো টুক্‌রো করে কুচোনো সুকুমার নবাবের শবদেহখানা—শবযাত্রা নয়, শোভা-যাত্রার আগে আগে—চলেছে হাতীর পিঠে খোসবাগের দিকে। যেখানে আলিবর্দীর কবর।

মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষ, যারা বুক চাপড়ে কাঁদতে পারতো, তারা কাঁদবে কি! নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে চোখ থেকে কান্না শুকিয়ে গেছে তাদের।

"কি হলরে জান,
পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
মীরজাফরের দাগাবাজী নবাব ধরতে পাল্ল মনে
সৈন্য সমেত মারা গেল পলাশী ময়দানে।
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি,
চাঁদোয়া টানায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটি।
কি হলরে জান
পলাশী ময়দানে ওড়ে কোম্পানী নিশান।"

আজ সে পলাশী নেই। পলাশীর আম্রবাগান নেই। লক্ষবাগ ভাগিরথীর লক্ষমুখ তৃষ্ণায় তলিয়ে গেছে কোন্ অতলে। তার্ শেষ আম গাছটা কেবল

গেছে বিলেতে পলাশীর নিদর্শন হিসেবে।

এখন কেবল জায়গাটার নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রস্তর ফলক :

PLASSY

ERECTED BY THE BENGAL GOVERNMENT 1883

ফুলবাগ, খোসবাগ আজ ইতিহাসের খণ্ড-ছিন্ন স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। যতদিন লুৎফান্নেসার চোখের জল ছিল, ততদিন সমাধি মন্দিরের পাশে ফুলের গাছে ফুল ফুটতো, ফুল ঝরতো। লুৎফান্নেসার মৃত্যুর পর সে গাছও চোখ দিয়ে শিশিরের জল ফেলতে ফেলতে শুকিয়ে শেষ।

কিন্তু ইতিহাসের শেষ এইখানেই নয়। তার পথ যেমন বাঁকা, কটাক্ষ তেমনি বঙ্কিম।

সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুতেই পলাশীর শেষ নয়। তার যাত্রা আরও অনেক দূরে। লক্ষবাগের আগুন আরও রক্ত, আরও হত্যা, আরও মৃত্যু চায়। পলাশী যুদ্ধের নেতাদের জীবনে সেই মৃত্যু কী বিচিত্র আর কী হৃদয়বিদারক!

মীরজাফর ইংরেজদের গলগ্রহ হয়ে অপরের অনুকম্পায় তাঁর শেষ জীবনের দিনগুলো কাটিয়েছেন। গলিত কুষ্ঠে সর্বাঙ্গ ভরা। সর্বথা অপমান আর অনাদর। আর শোকের ওপরে শোক।

পুত্র মীরণ মারা গেল বজ্রাঘাতে।

উমিচাঁদ উন্মাদের উন্মাদনায় উন্মত্ত। বোবা, বোকা, পথের ভিক্ষুক হয়ে মৃত্যু হল স্বনামধন্য এই শিখ বণিকের।

জগৎ শেঠ, রাজবল্লভেরও তাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে শেষ জীবনে মুঙ্গের কারা-প্রাচীরে বন্দী হতে হল দেশদ্রোহিতার অপরাধে।

ওয়াটসন আকস্মিক জ্বরে মারা গেলেন। পলাশীর যুদ্ধের কত সফলতা, কত অর্থ প্রাপ্তি, কত খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছুই সইলো না কপালে।

ক্লাইভ অনেক সম্মান, অনেক খ্যাতি, অনেক উচ্চপদ পেলেন। তবু শান্তি এল না জীবনে। কেবল অপবাদ আর সন্দেহ, সন্দেহ আর ঘৃণা। ঘৃণা আর তিক্ত বিস্বাদ দিন যাপন। শেষ পর্যন্ত এত বড় যোদ্ধার মৃত্যু হল অপঘাতে, আত্মহত্যায়।

ছেলেবেলায় শুনেছি কানে হাত চাপা দিলে যে চাপা গম গম হু হু করা শব্দ কানে বাজে—সেটা রাবণের চিতার। আজ মনে হয়—মনে প্রশ্ন জাগে—সে কেন লক্ষবাগের আগুনের সহস্র জিহ্বার শব্দ নয়? হতে পারে না

নাকি ?

> "পলাশীর যুদ্ধ' আজি সহস্র জিহ্বায়
> ঘোষিতেছে জনরব—প্রভঞ্জন গতি ;
> 'পলাশীর যুদ্ধ' আজি মর্মরে পাতায়,
> ধ্বনিতেছে সমীরণ, গায় ভাগিরথী।
> 'পলাশীর যুদ্ধ' শত সহস্র নয়ন
> চিত্রিতেছে অশ্রুজলে সহস্র ধারায় ;
> 'পলাশীর যুদ্ধ' কত প্রফুল্ল-বদন
> হাসিতেছে মনসুখে ; লিখিছে ধাতায়
> 'পলাশীর যুদ্ধ' ওই বসিয়া অম্বরে
> ভারত-অদৃষ্ট গ্রন্থে অমর অক্ষরে।"

তাহলে কি সত্যি নয় এই কবিতা ?

॥ ক্লাইভের কলকাতা ॥

সেদিন ১৭৫৭ সালের ৬ই জুলাই।

ভাগিরথীর বুকে লেগেছে উজানের ঢেউ। ঢেউ-এর ওপর সারে সারে শয়ে শয়ে পাল তোলা নৌকো। আর ঢেউ ছাপিয়ে বাজনার শব্দ। কাড়ানাকাড়া দুন্দুভির দাপট। কে আসে এমন রাজ-সমারোহে ?

মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আসছেন ক্লাইভ। সঙ্গে ওয়াটসন। পলাশী বিজেতার বিজয়োৎসব আজ। কলকাতাকে আর চেনা যায় না। হট্টরোলে অট্টহাসিতে চারপাশ জমজমাট। চারদিকে সাজগোজের ছড়াছড়ি। হাসি-খুশির ডগমগানি। মীরজাফরের মুর্শিদাবাদ থেকে ক্লাইভের কলকাতা পর্যন্ত এক চেহারা।

কি বিদেশী কি স্বদেশী সকলের মুখেই ক্লাইভের জয়জয়কার। হাতের মুঠোয় মদের পেয়ালা। মন ভরপুর আমোদে। সেই থেকেই শুরু হয় আনন্দের সোচ্চার ঘোষণা।

"জিনিয়াছে সবে যেই সিংহ বলে
পলাশীর রণ হাসিতে হাসিতে ;

গাও জয় তার—ধ্বনি কুতূহলে
উঠুক আকাশে ভূতল হইতে !
ঢাল সুরা ঢাল, ঢাল আরবার
সুদীর্ঘ জীবন হউক তাঁহার !
পান কর সুখে ! গাও তিনবার ;
হিপ্ হিপ্,—হুররে !
হিপ্ হিপ্,—হুররে !
হিপ্ হিপ্,—হুররে !"

এত আনন্দ কি এমনি-এমনিই ? না, কোন গূঢ় কারণ আছে তার ? আছে বৈকি।

পলাশী যুদ্ধের পর সৈন্য-সামন্তরা রাজ-ভাণ্ডার লুঠপাট করতে গিয়ে ফিরে এল খালি হাতে। সব ফাঁকা। সিরাজের গুপ্তধনের সন্ধান রয়ে গেল তাদের অগোচরে। এমন কি ক্লাইভও টের পাননি সেটা। জানতো কে ? শুধু মীরজাফর একা। খুব গোপনে মোড়ল সেজে তিনি সেই টাকার ভাগ বাঁটোয়ারাটা সেরে নিলেন নিজেদের একেবারে অন্তরঙ্গ দু-একজনের মধ্যে।

ভাগ বাঁটোয়ারার উটকো টাকায় যাদের উইঢিপির মত বরাত রাতারাতি উঁচু পাহাড় হয়ে উঠল—তাদের মধ্যে একজন হলেন মুন্শী নবকৃষ্ণ। আরেকজন হলেন রামচাঁদ রায়। টাকা হাতে পেয়েই রামচাঁদ রায় আন্দুলে গিয়ে রাজবাড়ি হাঁকালেন। আর নবকৃষ্ণ শুধু রাজবাড়িই হাঁকালেন না। রাজা হিসেবেও তাঁর হাঁক-ডাক ছড়াতে শুরু করল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পালা-গানের প্রথম অঙ্কে তিনি ছিলেন একজন সামান্য একস্ট্রা। তার থেকে কি ভাবে মহারাজা বাহাদুরের একস্ট্রা-অর্ডিনারী মহিমা জীবনে লাভ করেছিলেন তিনি সে এক লম্বা ইতিহাস। সে ফিরিস্তি পরে দেওয়া হবে। এখন পুরনো প্রসঙ্গে ফেরা যাক্।

সিংহাসনে বসে মীরজাফর দেখলেন কলসীর জলের মত রাজকোষের টাকা কবে কোঁটায় ফোঁটায় শেষ হয়ে গেছে। মুর্শিদকুলির সযত্ন-সঞ্চিত মণি-মুক্তো রত্ন-রাজীর অনেকখানি উবে গেছে শুজাউদ্দিনের বিলাসিতায়। আলিবর্দীর আমলে বাদশাহী পেষ্‌কস আর দিল্লীর দরবারে উপহার-উপচারে গেছে প্রচুর। অনেক নষ্ট হয়েছে বর্গীর হাঙ্গামায়। এখন অবশিষ্ট আছে—১ কোটি ৭৬ লক্ষ রূপোর মুদ্রা, ৩২ লক্ষ সোনার মুদ্রা, দু-সিন্দুক সোনার পাত, চার সিন্দুক মণি-

মুক্তোর অলংকার আর দুটি ছোট সিন্দুকে জহরত। মীরজাফর পড়লেন মহা ফাঁপরে। এই রাজকোষে ইংরেজদের প্রতিশ্রুত টাকা মেটাবেন কি করে? অথচ ইংরেজদের রাজরোষে পড়লে আর রক্ষে নেই।

ইংরেজরা ওসব বোঝে না। তারা জানে ভারতবর্ষ সোনার দেশ। টাকা তার মাটিতে ধুলোয়। গাছের পাতায়। টাকা নেই—ওসব মিছে কথা। শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক হল—প্রতিশ্রুত টাকার অর্ধেকটা দিতে হবে। বাকীটা তিন বছরে কিস্তি কিস্তিতে। তবে কোম্পানীর টাকার যাই হোক্, কোম্পানীর কর্মচারীদের পাওনা-গণ্ডাটা সদ্য সদ্য নগদানগদি মিটিয়ে দিতে হবে। মীরজাফর তাতে না বললেন না। ইংরেজ কর্মচারীরা নবাবের কাছ থেকে কে কত পেলেন তার একটা তালিকা এখানে তুলে দেওয়া হল।—

গভর্নর ড্রেক············২,৮০,০০০

কর্নেল ক্লাইভ—

মেম্বার হিসেবে············২,৮০,০০০

সেনাপতি হিসেবে·········২,০০,০০০

বিশিষ্ট দান···············১৭,০০,০০০

ওয়াটসন—

মেম্বার হিসেবে·········২,৪০,০০০

বিশিষ্ট দান············৮,০০,০০০

মেজর কিলপ্যাটরিক···২,৪০,০০০

অতিরিক্ত দান·······...৩,০০,০০০

মানিংহাম·········২,৪০,০০০

বিচার············২,৪০,০০০

অন্য ৬ জন কাউন্সিলের সভ্য···৬,০০,০০০

ওয়াটস······৫,০০,০০০

ক্র্যাফটন······২,০০,০০০

লুসিংটন······৫,০০,০০০

এর ১৫ বছর পরে পার্লামেন্টের বক্তৃতায় ক্লাইভ বলেছিলেন, আমি নিজে ব্যবসা-বাণিজ্যর ব্যাপারে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা না করে চিরজীবন যুদ্ধের নেশায় ছুটে বেড়িয়েছি। দেশের বহু সভ্রান্ত ব্যক্তিই আমাকে উপহার দিতে চাইতেন। তার সব কিছু যদি গ্রহণ করতাম—তাহলে আজ কোটিপতি হয়ে যেতাম আমি।

মুর্শিদাবাদের কোষাগারের চারপাশে যে রাশি রাশি সোনা রূপো মণি মুক্তো, আমি যে তার নাম-মাত্র গ্রহণ করেছি—এটা ভাবতে আমারই আজ আশ্চর্য লাগে।

কলকাতার বিজয়োৎসব মিটতে না মিটতেই মুর্শিদাবাদ থেকে ডাক এল ক্লাইভের। ২৬শে জুলাই। মীরজাফরের রাজ্যাভিষেক উৎসবে। রাজ্যাভিষেকের ফলে নব-নবাবের নতুন নামকরণ হল—সুজা উলমুল্ক হিসামউদ্দৌলা মীরজাফর আলি খাঁ বাহাদুর মহবৎজঙ্গ। তাঁর ছেলে মীরণের উপাধি—সাহামৎজঙ্গ। ভাই কাজেম খাঁ—হাযবৎজঙ্গ। আর সেই সঙ্গে সকল কর্মের পুরোহিত ক্লাইভকেও একটা উপাধি দেওয়া হল—শালাবৎজঙ্গ। জবড়-জঙ্গ 'জঙ্গ' উপাধির হরিলুট চলেছে যেন রাজদরবারে।

উপাধি চলেছে আগে আগে, তার পেছনে খেলাৎ। ক্লাইভ আর ওয়াটসন সব চেয়ে মূল্যবান খেলাৎ পেলেন। ওয়াটসনকে দেওয়া হল একটা ইয়া নধরকান্তি সোনার সাজে সাজানো হাতী, দুটো টগবগে তাগড়াই যোয়ান ঘোড়া, সোনার কাজ করা পোশাক-আশাক, শিরপেঁচ, মণিমুক্তো বসানো চুড়োওলা মুকুট। ঐ রাজ্যাভিষেকের দিনে কলকাতায় ইংরেজদের জাহাজে কামানের গোলা ফাটল। নিশান উড়ল মাস্তুলের মাথায়। ক্লাইভ একাই গেছেন মুর্শিদাবাদে। ওয়াটসন অসুস্থ। তিনি রোগশয্যা থেকে চিঠি লিখে পাঠালেন—লোকসহ প্রেরিত আপনাব মঙ্গলসংবাদ আর বন্ধুত্বেব নিদর্শন পেলাম। এর চেয়ে আনন্দেব কথা আপনার বাজ্যলাভে দেশের সকলেই প্রীত। আপনার পূর্বাধিকারী এভাবে জনসাধারণের সন্তোষ ও শুভকামনা ভোগ করতে পারেননি। এ তো কম আনন্দের কথা নয়।

কিন্তু বেচারা ওয়াটসনের ভাগ্যে বেশী দিন রাজসুখ ভোগ সইল না। এক অসুখে বিছানা নিয়েই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটলো তাঁর।

শোকাহত ক্লাইভ গভীর মর্মবেদনায বিলেতে চিঠি লিখলেন—হায়! ওয়াটসনকে তাঁর গৌরবময় বিজয়কাহিনী পুরোপুরি ভোগ করতে হল না। এই ঘটনা সবাইকে মানুষ যে কত নশ্বর, কত ক্ষণস্থায়ী সেই কথাটাই মনে করিয়ে দেয়।

ওয়াটসনের মৃত্যুতে ক্লাইভের মনে ক্ষোভ আসাটাই স্বাভাবিক। মাদ্রাজ কুঠির আমল থেকেই এঁরা দুই বন্ধু। যদিও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল দুজনের মধ্যে প্রবল। কলকাতা অধিকারের পর বিজয়ীর গৌরব

নিয়ে দুজনের মধ্যে যে কুৎসিত কলহ আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাচলেছিল— তা আগেই পাঠকদের চোখে পড়েছে। সমান সমান ভাগ বাঁটোয়ারায় মীমাংসা হয়েছিল সেই কলহের। ওয়াটসনের চাওয়াটা একটু বেশী সত্যি। তবে ওয়াটসনের মনে ছিল অন্যরকম একটা আভিজাত্যের দম্ভ। কেননা তিনি তো আর ক্লাইভের মত মসীধর থেকে অসিধর হননি। তিনি হলেন জাত-যোদ্ধা। খোদ ইংলণ্ডেশ্বরের নিয়োগ করা নৌ-সেনাপতি।

কলকাতা আর মুর্শিদাবাদের বিজয়োৎসবের বাজনা ক্রমশ থিতিয়ে এল। ক্লাইভ একটু একটু করে কলকাতা গড়ার কাজে মন দিলেন।

প্রথমেই চাই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্যে একটা তদন্ত কমিশন। ক্ষতিপূরণ অবিশ্যি সকলকেই দেওয়া হবে না। আক্রমণের সময় যারা কলকাতা ছেড়ে পালাননি তাদেরই শুধু। অথবা যোগ দেননি কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোন কার্যকলাপে। মোট ১৪ জন লোক নিয়ে কমিশন তৈরি হল। তাদের মধ্যে ছিলেন গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক, রতন সরকার, নয়ানচাঁদ মল্লিক, নীলমণি মিত্র, দুর্গারাম দত্ত, মহম্মদ সাদেক, রঘুনাথ মিত্র, আলিজান ভাই, শুকদেব মল্লিক, দয়ারাম বসু, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, রামসন্তোষ, আইনদ্দীন।

৭০০ কাঠের সিন্দুক বোঝাই টাকা এসেছে ক্লাইভের সঙ্গে সেই ৬ই জুলাই। কিন্তু কমিশনের মতিগতি আলাদা। ভাগ করার সময়ে নিজে নিজে যে যার খুশিমত কিছু বাগিয়ে নেবে এইটেই সকলের মতলব। যার শ গেছে—তার নামে হাজার লেখানো হচ্ছে। হাজারের জায়গায় লাখ। ভাঙা মেঠো বাড়ি খাতায় উঠলো কোঠা। আর যাদের নামে ক্ষতিপূরণ লেখানো হচ্ছে তাদের অধিকাংশই কমিশন-কর্তাদের নিজেদের লোক। অথবা অনুগৃহীত কেউ।

সন্দেহবশতঃ কোম্পানী ক্ষতিপূরণের হিসাব থেকে অনেক টাকা কেটে ছেঁটে বাতিল করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহম্মদ সাদেকের ঘটনা। তদন্তে প্রকাশ পেল তাঁর কিছুই ক্ষতি হয়নি। অথচ তিনি কোম্পানীর কাছ থেকে ২,৭১৬ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। কোম্পানী ব্যাপার বুঝে শুধুমাত্র তাঁর নাম রক্ষার জন্যে মাত্র ১৲ টাকা মঞ্জুর করলেন। আর এদের মধ্যে শোভারাম বসাক ছিলেন-'মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার' মেজাজের মানুষ। হিসাবের গণ্ডগোল, জাল সই ইত্যাদি করে তিনি কোম্পানীর টাকা দু-বেলা আলো বাতাসের মত গিলতেন। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেলেন।

তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রার্থনা করা হল কোম্পানীর পক্ষ থেকে।

আবার কলকাতা পুনর্গঠনের কথায় ফেরা যাক্।

মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধির সর্তবলে মারাঠা ডিচের ভেতরের সমস্তটা, আর বাইরের জমি মোট ৮৮২ বর্গ মাইল কোম্পানীর দখলে এসেছে। তাতে খাজনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ, ২২ হাজার ৯৫৮ টাকা। এই জমিদারী ২৪ টা পরগণায় ভাগ করা। সেই থেকেই যে চব্বিশ পরগণা নামটা এসেছে, এ বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিকই একমত।

ক্লাইভ যে কলকাতার হর্তা-কর্তা-বিধাতা, সেটা আর শহর কলকাতা নয়। সে একটা বিরাট ধ্বংস। সেণ্ট অ্যান গির্জা ঝড়ে ভেঙে মাটিতে লুটোচ্ছে। বড়বাজার পুড়ে ছাই। সমস্ত বাড়ি ঘর মড়ার মত নির্জীব। কেল্লার গা থেকে হাড় পাঁজরা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তার ভেতরে আবার মসজিদ। জনশূন্য শহর। মানিকচাঁদের অত্যাচারের ভয়ে কেউ শহরে ঢুকতে সাহস পায়নি। ইংরেজ কোম্পানী যে তাঁকে কবে পোষ মানিয়ে নিজেদের স্বার্থের খাঁচায় পুরে ফেলেছে—সে খবর কলকাতার পলাতক বাসিন্দেরা জানবে কেমন করে?

এখন কলকাতাকে গড়তে গেলে গড়তে হবে একেবারে নতুন করে।

কিন্তু গড়ার কাজ যতটা না এগোয় তার চেয়ে ভাঙার কাজ এগোয় ঢের বেশী। এক একটা দৈবদুর্বিপাকে কলকাতা ধ্বংসের লীলাভূমি হয়ে ওঠে। ১৭৫৭ সালেই একসঙ্গে মড়ক, মহামারী ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবনৃত্য বয়ে চলল কলকাতার বুকের ওপর দিয়ে। ফেব্রুআরি থেকে অগস্ট এই সাত মাসের মধ্যে ১১৫০ জন রোগী হাঁসপাতালে থেকে রোগমুক্ত হল। রোগের মধ্যে স্কর্ভি, পৈত্তিক জ্বর, পিত্তশূলই বেশী। রোগীর মধ্যে ইংরেজও আছে। মারা গেল ৭২ জন। অগস্ট থেকে নভেম্বরের মধ্যে ১০১ জন। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

মানুষ বা লোকজন বিনা রাজ্য চলবে কাকে নিয়ে? প্রজা নেই, রাজা একা সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন করছেন—এ তো কেবল যাত্রাদলের অভিনয়েই চলে। ক্লাইভের প্রথম লক্ষ্য হল যে, ৫০ হাজার লোক মুসলমানের ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে, তাদের ফিরিয়ে আনা। দ্বিতীয় লক্ষ্য হল—পলাতক তাঁতীদের আবার কলকাতায় নিয়ে আসা। বাংলা দেশের সবচেয়ে সেরা বাণিজ্য বস্ত্র শিল্প। ইংরেজদের

তা থেকেই ব্যবসায় হাজার হাজার টাকা লাভ হচ্ছে।

শান্তিপুর হোক, ঢাকার মসলিন হোক, আড়ঙ্গের বস্ত্র হোক, যাই হোক, বস্ত্র বুনতে হলেই তাঁতীর দরকার। ডিরেক্টার সভার নির্দেশ এল কোম্পানীর গোমস্তাদের কাছে। কাশী জোড়া, শান্তিপুর, ঢাকা থেকে তাদের কলকাতায় ফিরিয়ে আনার জন্যে। কাজ শুরু হয়ে গেল।

ঢোল-সহরৎ সহকারে কোম্পানীর আদেশ ছড়িয়ে পড়ল চারপাশের তল্লাটে মুল্লুকে। কলকাতার চারধারে নিজের খরচায় বনজঙ্গল কেটে, চাষ-বাস করে, ঘর তুলে নিতে পারলে সেই বাড়ি, ঘর, জমিজমা আর গাছের মালিকানা পাওয়া যাবে। কেবল যে-সব গাছ ফলের সেগুলো কাটা চলবে না। এর ফলাফল হল ভালোই। কোদাল কুড়ুল কাটারি যার, জমি-জিরেত-জায়গা তার। কোম্পানীর এই নতুন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার লোকসমাগম বাড়তে থাকল সত্যি সত্যি। জঙ্গলও সাফ্ হতে লাগল।

এই সময়ে ইংরেজ কর্মচারীরা কলকাতার আশেপাশের জায়গাগুলো নিজের নামে বা বেনামে বন্দোবস্ত নিয়ে কাজে লাগাত। আবার দাঁও বুঝে বিক্রি করেও মোটা টাকা পিটতো। ১৭৫৮ সালে ইংরেজ কর্মচারীদের সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।

শহরের রাস্তা-ঘাট, বসতবাড়ির দিকেই শুধু ক্লাইভের দৃষ্টি ছিল না। সৈন্যদলের উন্নতির দিকেও নজর ছিল তীক্ষ্ণ। আগে কোম্পানীর সৈন্য দলে মাদ্রাজী, তেলেঙ্গীরাই ছিল বেশী। তাদের বলা হত 'লালপল্টন'। পোশাকে পরিচ্ছদে তারা গোরা সৈন্যদেরই গোত্র ছিল। ক্লাইভের হুকুম হল—এতে কুলোবে না। আরও চাই। পশ্চিম দেশের ভোজপুরীদের কোমরেও বেল্ট এঁটে, পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে দাও। পাগড়ী পরাও মাথায়।

সৈন্য তো হল। কিন্তু তারা থাকে কোথায়? দুর্গ চাই না? অমনি হুকুম হল গোবিন্দপুরের লোকজনকে শোভাবাজারে সরে যেতে হবে। নতুন করে দুর্গ তৈরি হবে সেখানে। একের ভিতর একশ। কোম্পানীর রাইটারদের থাকবার জায়গা, সৈন্যদের ব্যারাক, বারুদখানা, তোপখানা, জেলখানা সবই থাকবে তার ভেতরে।

প্রসঙ্গক্রমে কোম্পানীর 'রাইটার'দের কিছু বিবরণ এখানে পেশ করার প্রয়োজন পড়ছে। তখনকার কোম্পানীর কাজে 'রাইটার' বলে একরকম কর্মচারী থাকতো। প্রথমে এরা কোম্পানীর দপ্তরে কাজ করতো। তারপর অভিজ্ঞ-

তায় পাকাপোক্ত হলে এদের বাংলা বা বাংলার বাইরে, নানান ব্যবসাকেন্দ্রে কুঠিতে প্রধান কর্মচারী হিসেবে পাঠানো হত। প্রথম দিকে তারা যখন কলকাতায় আসে—তখন তাদের সাহেবিআনার মাত্রা ছিল একটু বেশীই। বাজারে এন্তার ধার দেনা করে কোম্পানীর নামে খাতায় খরচ লেখাত। পলাশী যুদ্ধের আগে তাদের পালকি বা ঘোড়ার গাড়ি চড়তেও নিষেধ করা হল এই জন্যে। পলাশীর পর ক্লাইভের আমলে তারা ঐ দুটি যান-বাহনে চড়বার-চাপবার অনুমতি পেল বটে। কিন্তু সেটা শুধু শীতকালে আর বর্ষাকালে। গভর্নর ভেরিলিস্টের সময়ে তাদের ওপর আরও কড়া শাসন চালানো হয়। ১৭৬৭ সালে উচ্ছৃঙ্খল 'রাইটার'দের মিতব্যয়ী করার জন্যে একটা তদারকী সভা ডাকা হয়। তাতে নীচের ব্যবস্থাগুলোকে আইনের মত চালু করা হল।

১। অবিবাহিত 'রাইটার'রা একজন রাঁধুনী আর দুজন চাকরের বেশী কিছু রাখতে পারবে না। ২। গভর্নরের বিনানুমতিতে কেউই ঘোড়া ব্যবহার করতে পারবে না। ৩। দুজন বা তিনজনে মিলে বাগানবাড়ি তৈরি করাও তাদের নিষেধ। ৪। এমন কোন পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে পারবে না—যাতে বিলাসিতার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

১৭৫৭ সালে কোম্পানী কেরানী বা রাইটারদের বেতন দিত বছরে পাঁচ পাউণ্ড। সেটা দেওয়া হত ৬ মাস অন্তর। সব কর্মচারীদেরই অন্য রকমের উপরিপাওনা বা দস্তরিপাওনা ছিল। যোগ্যতা দেখাতে পারলে সকলেই উচ্চ পদমর্যাদা পেতো।

সেণ্ট অ্যান গির্জাটা ভাঙা বলে One lady of the Rossary নামে পর্তুগীজদের এক গির্জায় ইংরেজরা জোর-জবরদস্তি করেই উপাসনা চালিয়ে যেত। ক্লাইভ বললেন, ও-চলবে না। নতুন গির্জা চাই। তার জন্যে ইট-কাঠ যোগাড়ের কাজ অমনি শুরু হয়ে গেল।

পলাশী যুদ্ধের আগে গোটা শহরটার রক্ষাকর্তা হিসেবে একজন করে 'নগর কোটাল' বা শহর কোতোয়াল থাকতো। শহরের লোক-লস্করকে দস্যু-তস্করের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। সঙ্গে থাকতো বক্সী আর পাইকম্যান বা সড়কধারী নামে অনেকগুলি পাহারাদার। ক্লাইভের আমলে 'কোতোয়ালী' ব্যবস্থা ঘুচল। চালু হল চৌকির বন্দোবস্ত। কেল্লার একজন মেজর সাহেবের অধীনে পাঁচশ গোরা পুলিস আর পাঁচশ

সিপাহী-সৈন্য রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত শহরের এ-মুড়ো থেকে সে-মুড়ো পর্যন্ত দাপ্‌টে বেড়াতে শুরু করলে। শহরের মাথা-মাথা জায়গায়, নদীর পাড়ে আরও কড়াকড়ি।

সেই সঙ্গে বাজে খরচ কমাবার জন্যে সেনাদলের ভাতা এবং অন্যান্য উপরি একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হল।

কড়াকড়ির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল কড়ির কথা। গোবিন্দপুরে যখন কেল্লা তৈরির আয়োজন চলছে—বহরমপুরেও সেইরকম একটা ছোটখাট কেল্লার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কেল্লার কারিগর কুলি মজুরদের 'কড়ি'র হিসেবে মাইনে দেবার সময় গণ্ডগোল হতে লাগল বিস্তর। তাই কলকাতা থেকে বন্দোবস্ত করা হল কড়ির বদলে তামার কি রূপোর আনি চালু করতে হবে।

১৭৫৭ সালের ২৯শে অগস্ট কোম্পানী মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে টাঁকশাল তৈরির পরোয়ানা পেল। ওজনে মুর্শিদাবাদের আসরফি আর টাকার মতনই ছিল কোম্পানীর আলিনগর নামাঙ্কিত মুদ্রা। এমন কি তার ভাষাটিও ছিল উর্দু-ফারসী। বেশী বলতে যা, তা হল 'কলকাতা' কথাটি। নবাবের রাজকোষেও সে টাকার গতিবিধিতে কোন বিধি-নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৭৫৮ সালে আলিনগরের নাম সরিয়ে সরাসরি কোম্পানীর নামই চালু করা হল।

একে একে সবই হল। কেবল বাকী রইল আইন-আদালত। ক্লাইভের আমলেই কলকাতায় প্রথম দেওয়ানী আদালত তৈরি হল। পাঁচজন ইংরেজ বিচারক এই আদালতের হর্তা-কর্তা বিধাতা। ২০ টাকার ওপরে যে সব দেনা-পাওনা নিয়ে লাঠালাঠি কি ফাটাফাটি সে সব মামলা এসে হামলা করত এখানে। পাঁচজনের মধ্যে একজন থাকত জজ্‌ সাহেব। তাঁর পরমায়ু মাত্র একটি বছর।

ক্লাইভ যখন এইসব সংস্কারের কাজে ব্যস্ত তার আগেই মানিংহাম পৌঁছে গেছে বিলেতে। পলাশী যুদ্ধের বিজয়-সংবাদ নিয়ে। ক্লাইভের কাছে সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে প্রশংসাপত্র, মানপত্র, অভিনন্দন-পত্র আসছে রাশি রাশি। কোম্পানী ভাবছে—হ্যাঁ, এতদিনে একটা মদ্দ-ইংরেজ জন্মাল বটে। আর এদিকে ক্লাইভ ভাবছেন—আমি একজন জন্মেছি বটে। ধরা আমার হাতের সরা।

ক্লাইভের পক্ষে যা সহজে সাজে, একজন সাধারণ কর্মচারীর পক্ষে তা শোভন নয়। অথচ এক একজন ইংরেজ কর্মচারী তখন এক একটি ক্ষুদে ক্লাইভ

বললেও চলে। কথায় কথায় লোকের মাথা কাটতে পারে এমনি স্বভাব। দিনরাত গা ডুবিয়ে আছে ফুর্তির ফোয়ারায়। নাচ আর গান। গান আর মদ্যপান। উচ্ছৃঙ্খলতার শিরোমণি সব। বেছে বেছে পাণ্ডাগুলোকে ক্লাইভ বরখাস্ত করলেন চাকরি থেকে।

ছাঁটাইওলারা ভ্যান্সিটার্টের বাগানবাড়িতে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ সভা ডেকে সর্ববাদীসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করলে— আজ থেকে ক্লাইভ সাহেব একঘরে। তাঁর বাড়িতে পানাহার বন্ধ। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম অচল। বিপুল ভোটাধিক্যে সেই সঙ্গে এও স্থির হল যে ক্লাইভকে সামনে ডেকে অপমানও করা হবে। এদিকে কাপ্তেন ডোর হুকুম জারী করলেন যে কোম্পানীর খাতাপত্র যদি কেউ গোলমাল করে, তহবিল তছরুপ করে, তাহলে তার শাস্তি হবে নাক কান কেটে দেওয়া। যদি কেউ জায়গা জমি নিয়ে বিবাদ করে বা খুন-খারাপি ঘটায়, তাকে হাতে পায়ে বেঁধে শাস্তি দেওয়া হবে। আর হত্যাপরাধীকে চাবুক মেরে জেলে না পাঠিয়ে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

এইবার ক্লাইভের আসন টলল। টান পড়ল পায়ের তলার মাটিতে। ওয়াটসনের সঙ্গে কলকাতা দখল নিয়ে এক দফা বিরাট ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে গেছে তাঁর। ক্লাইভ চেয়েছিলেন কলকাতা থাকবে কোম্পানীর। ওয়াটসন চেয়েছিলেন রাজার হোক্‌। যদি সেই পুরনো কেচ্ছার কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাতকাণ্ডের সাপ বেরিয়ে পড়ে—অত ঝামেলায় কাজ নেই। যে সয়, সে রয়।

বরখাস্ত কর্মচারীরা হঠাৎ আবার চাকরিতে যোগ দেবার চিঠি পেলে। ক্লাইভ সেই সঙ্গে মৃত ওয়াটসনের প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট সাহেবকে লিখলেন কলকাতা-বিজয় ইংলণ্ডাধিপতিরই জয়।

চিঠির মাথায় তারিখ লেখা ছিল ১৭৫৯ সাল। ৭ই জানুআরি।

সেই সঙ্গে বাবাকে লিখলেন আরেকটা চিঠি।

স্বপ্নেও যা ভাবিনি তাই হল।

পলাশীর যুদ্ধে আমরা জিতে গেলাম। এখন আর কলকাতায় মন নেই। স্বদেশে ফিরে গিয়ে বেশ জাঁকিয়ে-জমিয়ে মজা করে কাটাতে চাই বাকী জীবনটা। যুদ্ধ-টুদ্ধ আর ভালো লাগে না।

ক্লাইভ চলে যাবেন! একি সর্বনাশের কথা! কলকাতার বিত্তবানদের চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠল। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও কথাটা কানে যাওয়া মাত্র

অকূল সাগরে পড়লেন যেন। মন ম্রিয়মান সকলেরই।

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র তখন কোম্পানী ভক্তিতে গদগদ। ভক্ত প্রহ্লাদের মত ক্লাইভের 'ক' বলতে একেবারে অজ্ঞান। পলাশী যুদ্ধের সময় তিনিই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ইংরেজপক্ষে যোগদানের জন্যে খোশামুদির চূড়ান্ত করেছেন। ইংরেজদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে হাত দুটো যেন সদা-সর্বদা নিস্‌পিস্ করতো তাঁর। মুর্শিদাবাদে সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র চলার সময়েই মীরজাফর, জগৎ শেঠ, দুর্লভরামের দলে কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ সমাজের তিনিই গুরু। তাঁর দান-ধ্যান পূজার্চনা বারোমাসে তেরো পাল-পার্বণের পালা নিত্য-নিয়ত লেগেই আছে। ঋণগ্রহণের ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর একটা পূর্ব-সখ্যতা ছিল। মীরজাফরদের সেইটেই হল মস্ত বড় সুযোগ। কৃষ্ণচন্দ্রকেই তাঁরা মধ্যস্থতার ভূমিকাটি সঁপে দিলেন। বাইরে রটে গেল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চলেছেন কালীঘাটে মায়ের দর্শনে। চলেছেন টাকা কর্জ করতে। ওগুলো বাইরের বোরখা। ভেতরের আসল উদ্দেশ্যটা হল মীরজাফরের অভিলাষ নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে অভিসন্ধি গড়া। পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভের পেছনে তাঁর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বুদ্ধি চালনা আর মধ্যস্থতার মূল্য যে অনেকখানিই সেকথা সেদিনের ইংরেজ আর আজকের ইতিহাস কেউই তোলেনি।

কৃতজ্ঞ ইংরেজ প্রত্যুপকার হিসেবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজস্বের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছে অর্ধেকটা করভার। পলাশীর মাঠ থেকে পাঁচ-পাঁচটা কামান এসে দিব্যি জায়গা জুড়ে বসেছে তাঁর বাগানে। এসব ছাড়াও ক্লাইভ কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যাড়া ন্যাড়া রাজা উপাধির মাথায় দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে চেয়ে আনা মহারাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধির মুকুটখানা পরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ক্লাইভের বিদায়-সংবাদে কৃষ্ণচন্দ্র ব্যথিত না হলে হবে কে?

আর ব্যথিত হয়েছেন জগৎ শেঠ। ইরেজদের ইজ্জত রক্ষা করতে বহুবার তিনি তাঁর স্বর্ণ-সিন্দুকের ডালা খুলেছেন। তাই তাঁর নাম হয়েছে—"বাংলার কামধেনু"। তাঁর মর্মাহত হওয়াটা খুব আশ্চর্যের নয়।

আর আছেন রাজা নবকৃষ্ণ। নবকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে ক্লাইভের সম্পর্ক শুধু নিবিড় নয়, সুগভীর। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব সৃষ্টির উদ্যমের পিছনে নবকৃষ্ণের উৎসাহ-উদ্দীপনার ইতিহাস এবং পরবর্তী কালে বিপুল উন্নতিলাভের ইতিবৃত্ত একদিকে যতটা সত্যি, অন্যদিকে ততটাই রোমাঞ্চকর।

এখানে তার বিস্তৃত অধ্যায় থেকেই যৎ-কিঞ্চিৎ তুলে ধরা হচ্ছে পাঠকদের সামনে। একে নমুনা স্বরূপ মনে করাই ভালো।

চার্নকের আমলে পোস্তার রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষীকান্ত ধর ওরফে নকু ধর হুগলী থেকে সুতানটিতে এসে বসবাস করতেন। পলাশী যুদ্ধের আগে ক্লাইভকে বহুবার অর্থ সাহায্য করেছেন তিনি। প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সময় এককালীন ন-লাখ টাকা কর্জ দিয়েছিলেন। কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের তালিকায় তাঁর নাম ছিল মাথার দিকে। ক্লাইভ পলাশী যুদ্ধের পর তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে প্রচুর খেলাৎ দিলেন। আর তাঁর দৌহিত্র সুখময়কে দিলেন 'রাজা' উপাধি। এবার এল নবকৃষ্ণের পালা।

ক্লাইভের মুৎসুদ্দি এই নকু ধরের অধীনে কেরানীগিরির চাকরি ছিল তাঁর। পাঁচ-দশ পুরুষ ধরে এই তাঁদের কাজ। তাই মোগল সরকারের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন তাঁরা—'ব্যবহার্তা'। কোম্পানী যখন দুর্গ তৈরির জন্যে গোবিন্দপুর কিনছে—সেই সময় নবকৃষ্ণের বাবা রামচরণ সুতানুটিতে বাড়ি কিনে ফেললেন একটা। শোভাবাজার রাজ-বাড়ির জন্ম-লগ্নের ইতিহাস এইটুকু।

নবকৃষ্ণ পারসী ভাষায় ভারী পণ্ডিত। হেস্টিংস তাঁর ছাত্র। এইভাবে ছেলে পড়িয়ে দিন যেতে যেতে হঠাৎ একদিন তাঁর ডাক পড়ল অন্য একটি জিনিস পড়ে শোনাবার। কি ব্যাপার? সিরাজের বিরুদ্ধে মহারাজা রাজবল্লভ, মীরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে চিঠি এসেছে ড্রেক সাহেবের কাছে। বিশ্বস্ত হিন্দু মুন্শী ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে সে চিঠি পড়াতে নিষেধ। তোজা-উদ্দিন খাঁ তখন কোম্পানীর মুন্শী। মুসলমান বলে তাঁকে বরবাদ করে দিয়ে নবকৃষ্ণেরই তাই ডাক পড়েছে। নবকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ করলেন সকলকে। তোজাউদ্দিনের চাকরি গেল। নবকৃষ্ণ ৬০৲ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে কলকাতায় 'নব মুন্শী' হয়ে উঠলেন। সিরাজউদ্দৌলা যখন হালসীবাগানে উমিচাঁদের বাড়িতে তাঁবু খাটিয়ে কলকাতা জয় করবার উদ্যোগে ব্যস্ত, সন্ধি-পত্রের বাহক হিসেবে তাঁর তাঁবুতে মাথা গলাবার সুযোগ পেয়ে সিরাজের সৈন্য বাহিনীর যা-কিছু গোপন খবর তা সমস্ত সংগ্রহ করে তিনি ফাঁস করে দিলেন ক্লাইভের কাছে। ক্লাইভ তারই ফলে অমন ঘোর-অন্ধকার রাত্রে সিরাজকে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন। সন্ধিও ঘটল তারই ফলে।

এত করে তিনি ইংরেজদের বাঁচিয়েছেন। তাই দিল্লীশ্বর শাহ আলমের কাছ

থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি যোগাড় করলেন ক্লাইভ শেষবারের মত ভারতবর্ষ থেকে চলে যাবার এক বছর আগে। সেই সঙ্গে দশ হাজারী মনসবদারী। তাঁকে দেওয়া হল ৩০০ অশ্বারোহী আর পাল্কি রাখার অধিকার। পাল্কি তখন যে-কেউ ইচ্ছে করলেই চড়তে পারত না। তার জন্যে কোম্পানীর নির্দেশ চাই।

পরের বছর এল 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি। তার সঙ্গে খেলাৎ। ৪,০০০ অশ্বারোহী রাখার অধিকার। আর পারসী ভাষায় খোদাই করা সম্রাটের দেওয়া স্বর্ণপদক। রীতিমত দরবার বসিয়ে এই উপাধিদানের উৎসব হল। শোভাযাত্রা বেরুল মহা আড়ম্বরে। হাতীর পিছনে ঘোড়সওয়ার। তার পিছনে হাতীসওয়ার। তার পিছনে পদাতিক। তার পিছনে তূর্যাজীব। আশা-বরদার। সবশেষে কলকাতার মানুষ। সারা কলকাতায় সেদিন এমন ভিড় যে পিঁপড়ের মাথা গলাবার জায়গাটুকু নেই।

নবকৃষ্ণের রাজবাড়িতেও কী ধুমধাম। আজ পুজো। কাল যাত্রা। পরশু পাঁচালী। তারপর বিয়ে। অন্নপ্রাশন। প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ তৈরি করে পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই ষোড়শোপচারে পুজোর আয়োজন চলল বছর বছর।

নবকৃষ্ণরা পাঁচ ভাই নন। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব। আর এই পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে একজন কৃষ্ণ। তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর বিশদ বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। পলাশী যুদ্ধের পরের কলকাতা এই পঞ্চভূতে তৈরি। নবকৃষ্ণ তাঁদের শিরোমণি। বাকী চারজন হলেন—বড়বাজারের জমিদার কাশীনাথবাবু, শ্যামবাজারের কৃষ্ণকান্তবাবু, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ সিং, ক্লাইভ স্ট্রীটের দেবী সিং। শুধু কোম্পানীর নেকনজরে পড়েই এঁদের বরাত ফেরেনি। অন্য কারণও ছিল। সেটা যে কি তা সেই সময়ে লোকের মুখে মুখে ছুটে বেড়ানো একটা ছড়ার মধ্যেই লুকোনো আছে।—

"জাল জুয়োচুরি মিথ্যে কথা
এই তিন নিয়ে কলকাতা।"

যত দিন যায় রাজা নবকৃষ্ণের বরাত কলাগাছের মত ফাঁপতে থাকে। ৬০৲ টাকা মাইনের মুন্শী মায়ের শ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা খোলামকুচির মত খরচ করলেন। শুধু শ্রাদ্ধে তো আর নয়। বিয়ে উপনয়ন আরও কত কিছু আছে। নবকৃষ্ণ এক পুরুষে বড়মানুষ। বনেদী নন। আর তাঁরই প্রতিবেশী

চূড়ামণি দত্ত তাঁরও আগে থেকে অবস্থাবান হিসেবে জনসমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাই থেকে থেকেই খিটিমিটি চলতো দু-দলে। দেব আর দত্তের লড়াই। নবকৃষ্ণ রাজা মহারাজা হবার পরও চূড়ামণি দত্তের লোকেরা তাঁকে 'নবা' বলে ডেকে অপমান করতেও ভয় পাননি। এমন কি যেদিন চূড়ামণি দত্ত সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রায় চলেছেন শোভাবাজার রাজবাড়ির পাশ দিয়ে, তাঁর পারিষদবর্গ পরম পরিতোষে খোল-করতাল বাজিয়ে গান ধরেছে—

"যম জিনিতে যায় রে চূড়ো যম জিনিতে যায়,
যপ তপ করো কিন্তু মরতে জানলে হয়।
সবাইকে ফেলে চূড়ো যম জিনিতে যায়,
নবা তুই দেখবি যদি আয়।"

তাতেই যে নবকৃষ্ণের মাথাটা খুব একটা হেঁট হল তা নয়। সম্মানে, শ্রদ্ধায় খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে অর্ধেকটা শহরই তাঁর কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য তখন। বনেদী বংশের বনেদ একটু একটু করে ধ্বংসের দিকে। উঠতি বাবু সমাজে, ইংরেজি চাল-চলনের কদরটাই শহরবাসীর কাছে অনেক বেশী লোভনীয়।

আচ্ছা, ধরাই যাক না রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা। রাজা তো শুধু কাগজে কলমে খেতাব-কেতাবের রাজা নয়। সত্যিকারের রাজ্যেশ্বর। কী প্রতাপ! কী ঐশ্বর্য! তাঁর মত লোককেও একদিন মাথা হেঁট করতে হল কার কাছে, না গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কাছে। গঙ্গাগোবিন্দ কে? এই পরশু দিনের বড়লোক। ক্লাইভ যত দিন কলকাতায় ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতাপ-প্রতিপত্তির ভরা জ্যোৎস্নায় কোম্পানী-রাহুর ছায়াটুকুও লাগেনি। যা হবার নয় তাই হল মীরকাশেমের আমলে। মুঙ্গের দুর্গে কপর্দকহীন বন্দী হয়ে বাঁচা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র তাঁর সঙ্গী, আর কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র ইংরেজদের মন যুগিয়ে সিংহাসনে ঠেস দিয়ে বসেছেন। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁর সহায়। একদিন তাঁকে বাধ্য হয়েই মাথা হেঁট করতে হল গঙ্গাগোবিন্দের কাছে।

"নিজের নাই সাধ্য, ছেলেরা অবাধ্য
এবে যা কিছু ভরসা তুমি যে গঙ্গা-গোবিন্দ।"

অবশ্য নবকৃষ্ণ বা কৃষ্ণচন্দ্রের যে-সব ঘটনাবলীর বিবরণ ওপরে দেওয়া হল সেগুলো অনেক পরবর্তীকালের। এ থেকে আপাতত যে ধারণাটা স্পষ্ট

হবে তা হল এঁদের পদ এবং অর্থ বৃদ্ধি অথবা সিদ্ধিলাভের পেছনে ক্লাইভের হাত ছিল অনেকখানি। সুতরাং ক্লাইভের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ যে স্বতঃই এঁদের মনে বেদনার আবর্ত পাকিয়ে তুলবে সেটা খুব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের নবাবের মত মুষড়ে পড়েননি আর কেউ। মীরজাফরের দু-চোখে অন্ধকার। ক্লাইভ তাঁর রাজসিংহাসন আরোহণের সিঁড়ি। তাঁর বসবার পিঁড়ি। তাঁর অন্ধের যষ্টি। তাই তিনি নিজে সশরীরে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন।

মীরজাফর একে বাংলার নবাব। তায় কোম্পানীর অতিথি। সুতরাং আদর-আপ্যায়নের দিক থেকে কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদের কথা বাদই দিচ্ছি। শুধু কয়েকটা বাজের বাবদেই লেগে গেল ১৫ হাজার টাকা। তারপর ১৫ জোড়া পিতলের দেওয়ালগিরি—২২৷৷০, কোর্ট হাউস বাড়িতে মদের খরচা—৭৬৯, নবাবের জন্যে একটা কাফ্রী ক্রীতদাস কেনা—৫০০৲, সওগাতবাহী ক্রীতদাসের পুরস্কার—৩১০৲, ১৫ বাক্স্ গোলাপজল—৩৯৭, নবাবের প্রাসাদে ব্যবহারের জন্যে ৭০ মন মোমবাতি ৩৪৩, ৬০ পাউণ্ড মসলীপট চুরুট ৫০০৲, দু-মন ভিনিগার—৮০৲, ৫ মন কাফি—৩৩২৲।

মীরজাফর আর ক্লাইভ। দেহ আর আত্মা। এঁদের মধ্যে সন্দেহ, ঈর্ষা, দ্বেষ বিদ্বেষ সবই ছিল। তবুও একজনকে না হলে আরেকজনের চলে না। মীরজাফরের ত্রাণকর্তা যেন ক্লাইভ। কিন্তু মুর্শিদাবাদের লোকেরা এত ভেতরের খবর জানতো না। তারা বলতো মীরজাফর হচ্ছে 'ক্লাইভের গদর্ভ'। সে কি কথা! মীরজা সমশের উদ্দীন এমন কথা রাজ্যসুদ্ধ লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি করে?

মীরজা সমশের উদ্দীন মীরজাফরের বাল্যসহচর আর খুবই হাস্যরসপ্রিয়। একবার ক্লাইভের 'গোরা লোকদের' সঙ্গে মীরজার কি একটা ব্যাপারে দারুণ বচসা হয়। মীরজাফরের কানে সে কথা গিয়ে পৌঁছল। তিনি মীরজাকে প্রকাশ্য রাজদরবারে ডেকে পাঠালেন। সেইখানেই তিনি মীরজাকে অনেক ভৎর্সনা করলেন।

তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি কর্নেল সাহেবের পদমর্যাদা কতখানি? তাহলে কর্নেল সাহেবের বন্ধুদের এভাবে অপমান করতে সাহস পেলে কি করে?

মীরজা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যেন আত্মধিক্কারে কাতর হয়ে পড়লেন। নবাবের কাছে মাথা নীচু করে সেলাম জানিয়ে বললেন, সে কি কথা বলছেন—হুজুর, আপনি আমার প্রতিপালক! আমি প্রত্যহ সকালে ক্লাইভের গর্দভকেই তিনবার করে যথারীতি সেলাম করে থাকি। কর্নেল সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা 'বলবো—সে সাহসটুকু আছে নাকি আমার!

মীরজার রসিকতায় মীরজাফরের এই নব নামকরণ দেখতে দেখতে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল লোকের মুখে মুখে। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে? যাক্‌কে সে কথা।

পলাশী যুদ্ধের পর কলকাতার প্রাকৃতিক অবস্থা কালকেতুর মত দিনে দিনে 'সবার লোচন-সুখ হেতু' যেমন বেড়ে চলে, তেমনি বেড়ে চলল হঠাৎ-রাজাদের প্রাদুর্ভাব। শুধু 'রাজা' উপাধিতেও আর মন ভরে না। কেউ হচ্ছেন 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর'। কেউ 'মহারাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর'। শেষেরটি জুটেছিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কপালে। এবং তা নবকৃষ্ণেরই একান্ত অনুগ্রহের ফলে। আজকাল যেমন পদ্মবিভূষণের ছড়াছড়ি চলেছে দিল্লী শহরে, ক্লাইভ সাহেব তেমনি কলকাতাতেও শুধু উপাধি বিলিয়ে খেলাত ছড়িয়ে সমাজের গণ্যমান্য মাথাগুলোকে হাতের মুঠোয় এনেছিলেন। তাই 'ব্যাবণ অব পলাশী'র আরেক নাম হল 'কিং মেকার'।

এই উপাধি সম্পর্কে সেকালের লোকে ছাড়া কাটতো—

> "কিছুমাত্র বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি ঘটে যার,
> উপাধি বিষম ব্যাধি ধাড়ে চাপে তার।"

শুধু যে অন্যকে উপাধি বিলিয়েই ক্লাইভ সাহেব নিজেকে চরিতার্থ মনে করতেন তা নয়। নিজের খ্যাতি-প্রতিপত্তির ইচ্ছেটাও তাঁর ষোল আনার ওপরে আরো দু-আনা বেশী ছিল। লর্ড হতে হবে। সুনাম পেতে হবে। তাই থেকে থেকে স্বদেশের জন্যে মন কেমন করে ওঠে কেবলই।

১৭৬০ সালের ৮ই ফেব্রুআরি। ক্লাইভের জাহাজ কলকাতার বন্দরে মাথায় পাল তুলে দাঁড়াল লণ্ডনের দিকে মুখ করে।

এইটেই ক্লাইভের দ্বিতীয়বার ঘরে ফেরা। আর্কট জয়ের পর একবার। তখন বয়স হবে ২৮-এর কাছাকাছি। আজ তার সাত বছর পরে। সাত বছর আগের চেয়ে বহুগুণ সম্মানের দাবি নিয়ে দেশের মাটিতে পা দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে

শহর কেঁপে উঠলো জনসমারোহে। বাতাস ভারী হয়ে উঠলো চারপাশের পঞ্চমুখ-প্রশংসায়। ক্লাইভের ঘরে মানপত্র রাখবার আর জায়গা নেই। ইংলণ্ডের রাজা বললেন—নাও তোমার প্রাপ্য গৌরব। আজ থেকে তুমি লর্ড। আইরিশ লর্ড।

মন্ত্রী পিট বললেন—তোমাকে কি বলে সম্মান জানাবো। তুমি মর্ত্যের কেউ নও। তুমি 'স্বর্গ-সম্ভূত-যোদ্ধা'।

কোম্পানীর অংশীদাররা এক মহাসভা ডেকে ভোজের আসরে স্তবগান জুড়ে দিলে ক্লাইভের। ক্লাইভের বুক তখন খুশিতে টইটুম্বুর। আনন্দের দামাদা বাজছে যেন।

ক্লাইভের চোখে কেবল ভবিষ্যতের ছবি। ভাসছে। ডুবছে। জ্বলছে। নিভছে।

নাচ শিখবো। গান শুনবো। ঘুমিয়ে পড়বো পালঙ্কে কিংখাবের চাদরে গা মুড়ি দিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে। প্রাসাদ উঠবে বার্কলে স্কোয়ারে। তাব প্রত্যেকটি কামরা পৃথিবীব অমূল্য ঐশ্বর্য দিয়ে সাজানো থাকবে।

কিন্তু এই রকম স্বপ্ন দেখার দিন খুব বেশী সইলো না তাঁকে। হঠাৎ অসুস্থ হযে পডলেন। দু-দিনে দুর্বল হয়ে গেল শরীর।

এ দিকে কলকাতায় তখন ক্লাইভের কোলের ছেলেকে দোলনায় শুইয়ে ঘুম-পাডানী গান গাইছে মুসলমান ধাত্রী।—

> "দেখো মেরি জান, কোম্পানী নিশান
> বিবি গিয়ে দমদমা উড়িছে নিশান।
> বড সাহেব, ছোট সাহেব বঙ্কা কাপ্তান,
> দেখো মেবি জান লিয়া হৈ নিশান।"

দমদমে ছিল ক্লাইভের পুরনো বাড়ি। ওলন্দাজ পর্তুগীজদের কুঠি ছিল সেটা প্রথমে। ক্লাইভ স্বদেশে চলেছেন। সঙ্গে অজস্র হীবে মুক্তো জহরত। কিছু পাওয়া। কিছু কেনা। মাদ্রাজ থেকেই প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার হীরে কিনেছেন। আরও কত উপহার সামগ্রী। তা ছাড়া নগদ টাকার তো কথাই নেই।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর সার জন ম্যালকম সাহেব হিসেব কষে জানিয়েছিলেন—ক্লাইভের বাৎসরিক আয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা।

ক্লাইভ বিয়ে করেছিলেন ভারতবর্ষেই। মাদ্রাজের এক বন্ধুর বোনকে।

পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বছর আগে। বিলেতে যাবার সময় স্ত্রী ছিল সঙ্গে। মীরজাফরের ওপরই ভার ছিল তাঁর শিশুপুত্রকে দেখাশোনা করার।

ক্লাইভ নেই। ইংরেজ কর্মচারীরা যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে। 'প্রেমের গান গাও আর কুড়েমি কর'—এইটেই তাদের হাবে ভাবে, চলনে বলনে খুব প্রকট। ঘুষের কারবার চালিয়েছে দিনেরাতে, ডানহাতে বাঁ-হাতে। তারপর কোন পুজো-আচ্চা এলেই সবাই পাপস্খালনের জন্যে কালীঘাটে কি অন্য কোন হিন্দুদের মন্দিরে এসে জড়ো হয়। পুরুতদের মোটা টাকা দক্ষিণে দেয়। রাত্রে আতসবাজী ফাটিয়ে আকাশের কান কালা করে ছাড়ে। কখনও খড়ের চালেও আগুন লাগে। আর সেই সঙ্গে দেশী সিপাইরা দল বেঁধে চিৎকার করে—

"ব্যোম কালী কলকত্তাওয়ালী।"

কিন্তু খুব বেশী দিন তাঁর বরাতে স্বদেশে স্বর্গ-সুখে বসবাস করা ঘটলো না। কলকাতা থেকে দিনের পর দিন একটার পর একটা আসছে দুঃসংবাদ। ভারতবর্ষে কোম্পানীর বাণিজ্য পদ্মপাতায় জলের মত চঞ্চল। আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সত্যিই খুব ভয়াবহ আর জটিল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিটি দিন ষড়যন্ত্র, রক্তপাত, রাজ্যলাভের লালসায় রাঙা। সন্ধ্যে থেকে রাত্রি ছেয়ে আছে বিদ্রোহ-বিপ্লবের গোপন অন্ধকার।

ক্লাইভ স্বদেশে যাওয়ার পর বেশী দিন গেল না। গভর্নর ভান্সিটার্টকে পোষ মানিয়ে কলকাতার ভূতপূর্ব গভর্নর হলওয়েল মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লাগলেন। মীরজাফরের সম্বন্ধে ইংরেজদের অনেক অভিযোগ। তিনি সন্ধিপত্রের প্রতিশ্রুতিমত প্রাপ্য টাকা আজও কোম্পানীকে শোধ দেননি। পুত্র মীরণের মৃত্যুর পর মস্তিষ্ক-বিকৃতির কিছু কিছু লক্ষণও দেখা দিয়েছে তাঁর মধ্যে। রাজ্য পরিচালনায় ভুলভ্রান্তি ঘটছে হরদম। ইংরেজদের চেয়ে ডাচদের ওপর যেন তাঁর টানটা একটু বেশী বলে মনে হচ্ছে। হলওয়েল সাহেব দারুণ বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ ব্যক্তি। তার ওপর রম্যরচনা তৈরির ব্যাপারে দারুণ সিদ্ধহস্ত। 'অন্ধকূপহত্যার' রোমাঞ্চ কাহিনী তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর মস্তিষ্কের উর্বরতার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এবারে আর এক নতুন কাহিনী ফাঁদলেন। 'ঢাকার হত্যা কাহিনী'। প্রত্যেক ইংরেজই সে কাহিনী পাঠ করে বুঝল—'মীরজাফর সত্যিই একটা শয়তান।' সুতরাং—শুভস্য শীঘ্রম্। কাল-হরণে লাভ কি? যত তাড়া-

তাড়ি নবাবকে গদীচ্যুত করা যায় ততই মঙ্গল।

মীরকাশিম আলি খাঁ—মীরজাফরের জামাই। ভালো করবেজরা নাড়ি টিপেই সব রোগ ঠাওরায়। ইংরেজ দরবারে নবাবের প্রয়োজনে দু-চারবার আনা-গোনা আসা-যাওয়ার ফলেই কোম্পানীর কর্তারা বুঝে নিল—একে দিয়ে কাজ চলবে। ১৭৬০ সলের ১৫ই সেপ্টেম্বর গুপ্ত-সন্ধিপত্রে সমস্ত খোলাখুলি ভাবেই লেখা-জোখা হল। ইংরেজরা তাদের বাণিজ্যের বারো আনা সুযোগ-সুবিধে বাগিয়ে নেবার মত করেই সব কিছু সর্তাদি তৈরি করলে। আর মীরকাশিম খাঁ এটা বেশ স্পষ্ট করেই জানতেন—টাকা দিলে কেনা যায় না এমন একজনও ইংরেজ নেই এদেশে। সুতরাং খোজা পিক্রর মারফৎ টাকার তোড়াগুলি যথা সময়ে যথা স্থানেই পৌঁছতে লাগল।

২৬শে সেপ্টেম্বর। নতুন নবাবের পদমর্যাদা নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসলেন—নাশির উল্ মোলক্ ইম্‌তেয়াজউদ্দৌলা মীর মহম্মদ কাশিম আলি খাঁ নসরৎজঙ্গ বাহাদুর। মীরজাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তিতে ইংরেজরা চব্বিশপরগণার জমিদারী পেয়েছিল। মীরকাশিম খাঁর রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘাড়ে পড়ল মীরজা-ফরের বকেয়া ঋণের বোঝা। রাজকোষ এদিকে প্রায় শূন্য বললেই চলে। সোনা-রূপো মণি-মুক্তো তৈজসপত্রাদি প্রায় তিন লক্ষ টাকা। আর নগদ টাকা ৫০ হাজার। মীরকাশিম নিজের রাজকীয় সম্মান, আর ইংরেজ প্রভুর মন এই দুটো এক সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বর্ধমান, মেদিনীপুর আর চট্টগ্রাম এই তিনটে রাজ্যের ইজারা বন্দোবস্ত দিয়ে দিলেন ইংরেজদের।

রাজত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে মীরকাশিমের একমাত্র লক্ষ্য হল—রাজকোষ। টাকা চাই। অর্থ ছাড়া সব অনর্থ। রাজমহলের বিলাস-বৈভব ও নাচ গানের জোয়ারে ভাঁটা পড়ল। হাস্যকৌতুক, ফুর্তি, প্রাণোচ্ছলতা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনান্তরের দিকে পা বাড়াল। দাস-দাসীর সংখ্যা কমতে লাগল শেষ রাতের আকাশের নক্ষত্রের মত। খরচ কমানো চাই। নইলে জমা বেশী হবে কি করে? খাজনা বাড়তে লাগল রাজ্য জুড়ে। জমিদারদের কাছ থেকে নজর নেওয়ার কড়াকড়ি শুরু হল। নাগরিকদের সম্পত্তি যেমন তেমন কারণে আত্মসাৎ করাও বন্ধ রইল না। টাকা চাই। মোগল আমলের গোড়ার দিকে বাংলার রাজস্ব টোডরমল্লের কৃপায় হয়েছিল ১ কোটি ৭ লক্ষ। ১৭৫৬ সালে হয়েছিল ১ কোটি ৪৫ লক্ষ। ১৭৬৩ সালে মীরকাশিমের দাপটে তার পরিমাণ দাঁড়াল ২ কোটি ৫৬ লক্ষ।

এদিকে ইংরেজ কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও দৌরাত্ম্য বেড়েছে দারুণ। অর্থলালসার পথে কেউ প্রতিবন্ধক হলে তাকে একেবারে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তারা কুণ্ঠিত নয়। লুণ্ঠিত ধনের পিপাসায় তারা বনের জানোয়ারের চেয়েও ক্ষেপে উঠেছে। তাদের রক্তমাখা মুঠোর ছায়া পড়েছে নবাবের নুনের ব্যবসার ওপরেও। দেশী বণিকদের তারা বাধ্য করাতে চায়—বেশী মাল কেনায়, কম দামে বিকানোয়। নুনের কারবার তারা চায় একচেটে করে নিতে। 'দস্তক' ছাড়াও ব্যবসা করে তারা। ফলে নবাবের শুল্কের টাকা ক্রমশ কমে আসছে। অনেক রকম যুক্তি পরামর্শ, বাধা-বন্ধক দিয়েও যখন বাণিজ্যের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থামানো গেল না, মীরকাশিম প্রবল ক্ষোভের সঙ্গে ঘোষণা করলেন—বাংলায় ইংরেজ আর বাঙালী দুইই সমান। আমি কারও কাছ থেকেই কোন শুল্ক চাই না।

আলোড়ন উঠলো কলকাতার ইংরেজ বণিকের মন্ত্রণাগারে। নবাবের এ ক্ষোভ দীর্ঘস্থায়ী হলে কোম্পানীর সর্বনাশ। তাহলে উপায়? উপায় যুদ্ধ। উপায় আক্রমণ। উপায় মীরকাশিমকে পরাজিত করে আবার আমাদের আশ্রিত মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো। ১৭৬৩ সালের ১৯শে জুলাই মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ ঘোষণা করল।

"দিবানিশি বহরমপুর গড়ে
সাত সাহেব মুখোমুখি কিচির-মিচির করে।"

আবার মীরজাফর। আবার নতুন সন্ধিপত্র। বাংলার মসনদে মীরকাশিমের জায়গায় আবার ডাক পড়ল দেশদ্রোহীর। ইংরেজরা যেন পুতুল নাচ দেখাচ্ছেন। যখন যাকে ইচ্ছা ওঠাচ্ছেন, নামাচ্ছেন। এরই মাঝে চলেছে যুদ্ধ, বিগ্রহ। পাটনার হত্যাকাণ্ড থেমে রইল না। মীরকাশিমের কাটা-মুণ্ডুর বিনিময়ে একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করল ইংরেজরা। ইতিহাস যেন রক্তভূমি। যুদ্ধ, আর রক্তপাত, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর আর সন্ধি ভঙ্গের পুনরাবৃত্তি—এই পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার ভেতর দিয়ে মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়ে চলেছে একটা ধ্বংসের ঢালু খাদের দিকে, আর ইংরেজ-শক্তি একটু একটু এগিয়ে চলেছে একটা উন্নতির উপত্যকায় সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে।

১৭৬৪ সালের ৪ঠা জুন বিলেতের কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে অসীম ক্ষমতার অধিকার নিয়ে ক্লাইভ সাহেব কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু বাংলার

রাজনৈতিক আকাশ তখন অনেকটা ফর্সা। মীরজাফর মারা গেছেন মাত্র কয়েকমাস্ আগে। নন্দকুমারের পরামর্শে মৃত্যুর আগে হিন্দুর দেওয়া কিরীটে-শ্বরীর চরণামৃত পান করে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন। ক্লাইভ তাঁর আসল কিরীটেশ্বর। অর্থাৎ তাঁরই দৌলতে কিরীটলাভ। শেষ সময়ে তাঁর দেখা মিললো না। তাই পাঁচ লক্ষ টাকা দান করে গেছেন ক্লাইভের নামে।

ক্লাইভের কলকাতা-পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট ঘন ঘন পাল্টাতে লাগল। বকসার যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে মোগল শাসকদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। পরাজয়ের পর ইংরেজ-উচ্ছেদে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনজন নরপতির মধ্যে অযোধ্যাপতি সুজাউদ্দৌলা স্বরাজ্যে পালালেন। মীরকাশিম ফকির হয়ে লোকালয় থেকে দূরে, বনে-জঙ্গলে গ্রাসাচ্ছাদানহীন জীবন যাপন করতে লাগলেন। ১৭৭৭ সালের ৭ই জুন দিল্লী নগরীর একপ্রান্তে এক জীর্ণ কুটিরের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে তাঁর কংকালসার মৃতদেহ আবিষ্কার হয়েছিল বলেই ঐতিহাসিকরা বলেন। আর দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম নিজেকে নিশ্চিন্ত চিত্তে ইংরেজদের হাতে সঁপে দিলেন। ইংরেজদের জয়লাভে তাঁর যেন মুক্তিলাভ এবং বন্ধুলাভ দুইই ঘটলো যুগপৎ। সোৎসাহে তিনি বকসার যুদ্ধের সেনাপতি মেজর মনরোর কাছে চিঠি লিখে জানালেন তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা। এতদিন পরে মুক্তিলাভের সুসময় দেখা দিয়েছে! ইংরেজ-কোম্পানীকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ দিয়ে তিনি কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প।

শাহ আলমের পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক। কেননা দিল্লীশ্বর হলে কি হবে, প্রভাব প্রতিপত্তি কিছুই নেই তাঁর। সেইজন্যে লোকে ছড়া কাটতো—

"বাদশাহি শাহ আলম
দিল্লীসে পালম।"

অর্থাৎ শাহ আলমের যা কিছু প্রতাপ দিল্লীর তিন-চার মাইল দূরের গ্রাম 'পালম' পর্যন্ত। অন্যেরা আপত্তি করলেও ক্লাইভ এতে আপত্তি করলেন না। ১৭৬৪ সালের ১৯শে নভেম্বর দিল্লীশ্বর শাহ আলমের অভ্যর্থনার আয়োজন চলল। ২৪শে নভেম্বর এলাহাবাদে ইংরেজ-সেনানায়করা নতমস্তকে সম্রাটের সামনে কুর্নিশ ঠুকে 'নজর' নিয়ে দাঁড়াল। মুসলমান প্রজারা চিৎকার করে সম্রাটের জয়ঘোষণা করতে লাগল—জয় দিল্লীশ্বরের জয়! জয় শাহ আলমের জয়।

ইংবেজরাও কম যায় না। ওদের জয়ধ্বনি ছাপিয়ে এদের তোপধ্বনি। ইংবেজরা মহোল্লাসে ক্লাইভ-সহকাবে কলকাতার দিকে পা বাডাল। কালী-মায়েব মন্দিবে পূজো দিতে এসে হিন্দুস্থানী সেপাইরা গান ধবলে—

"কালি গৈয়ে কলকাত্তাকি, যিনকে পূজা ফিরিঙ্গি কিন,
বাঙ্গালিকো মুলুক ধনদৌলত দখল কবলিন।"

দেওয়ানী তো পাওযা গেল। কিন্তু নামে একজনকে নবাব সাজিয়ে না রাখলে বাজীমাৎ হয় না যে। কিন্তু নবাব করা যায় কাকে? মীবজাফবেব অন্য এক পুত্র কিশোব নজমুদ্দৌলাকে নবাব সাজানো হল। আর মীবজাফরের প্রধান প্রেয়সী মণিবাঈ তখন শুধু নবাবেবই মা নন। কোম্পানীবও মাতা। ইংবেজ কোম্পানী তাঁকে মাসে মাসে বৃত্তি দেয়। ক্লাইভ প্রভৃতিরা মুর্শিদাবাদে থাকলে দিনে দুশো টাকাও বোজগাব হয়েছে তাঁব। নজমুদ্দৌলাব ববাতে বেশী দিন নবাবীসুখসম্ভোগ ঘটলো না। কোম্পানীব পুণ্যাহের কিছু দিন পবেই তিনি মাবা গেলেন। সহোদব সইফুদ্দৌলা বসলেন সিংহাসনে। আব মণি বেগমেব মতামতকে উডিযে দিযে মহাবাজা নন্দ-কুমাবেব বদলে বেজা খাঁকেই বাংলাব দেওযান কবা হল।

ক্লাইভেব বাজত্ব জেঁকে উঠছে দিনকে দিন। নাচ গান তামাসায বেশ সুখে দিন কাটে তাঁব। নিমন্ত্রণ আসে শোভাবাজাবেব বাজবাডি থেকে। নকুধরের অট্টালিকায ঝাড় লণ্ঠনেব আলোয ক্লাইভ দেশীয উৎসবেব আনন্দ পান কবেন। বড়বাজাবেব নযানচাঁদ মল্লিকেব বাডিতে বাঙালী খানা চেখে দেখেন।

কিন্তু বেশী দিন এই আনন্দভোগ সহ্য হল না তাঁব। ১৭৬৬ সালেব শেষ দিকে শবীবটা পোড়ো বাডিব মত ভাঙতে থাকল। এমন স্বাস্থ্যভঙ্গ যে লিখবাব পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। ১৭৬৭ সালেব ১৪ই জুলাই তিনি আবাব স্বদেশে ফিবে গেলেন। আবাব বাজা ও বানীব সম্মানদান, সাদব সম্ভাষণ, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, ববমাল্য আব মানপত্রেব ছডাছড়ি। ১৭৬৮ সালেব গোডায সস্ত্রীক প্যাবিসে বেড়াতে গেলেন স্বাস্থ্যলাভেব আশায। জীবনে একটু শান্তিব প্রযোজন। শান্তি আর স্বস্তি। যুদ্ধ নয, চক্রান্ত নয, বাজ্যলাভেব ষডযন্ত্র নয—শান্তি।

কিন্তু বিলেতের পার্লামেন্টেই তাঁব স্বদেশবাসীবা তাঁকে দেশদ্রোহিতাব অপবাধে কাঠগড়ায টেনে আনল। তাঁব প্রতিটি অপবাধেব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচাব শুরু হল। ক্লাইভ নিজেই বীবেব মত নিজের অপরাধ আর নিজের কৃতিত্বকে

স্বীকার করে দেশবাসীর সামনে তাঁর বক্তব্য খোলাখুলি পেশ করলেন। শেষ পর্যন্ত নিরপরাধ প্রমাণিত হলেও শোকে, সন্তাপে, রোগে দুঃখে, অপমানে আর আত্মগ্লানিতে বিচলিত হয়ে উঠলেন ক্লাইভ। রাত্রে ঘুম নেই তাঁর অপলক চোখে। থেকে থেকে ফিট্ হয়। দুঃস্বপ্ন দেখেন। জীবনের দরজায় বারবার এসে যেন কড়া নাড়ে মৃত্যুর কালো হাত। কি ভালো? যন্ত্রণা না মৃত্যু? অপমান না মৃত্যু? অশান্তি না মৃত্যু। মৃত্যুই শ্রেয় হল শেষ পর্যন্ত। ১৭৭৪ সালের ২২শে নভেম্বর ব্যারন অব পলাশী আত্মহত্যা করলেন স্নানের ঘরে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের স্রষ্টা, বাংলার দেওয়ানী অধিকারের অধিনায়ক লর্ড ক্লাইভের জীবনাবসান হল এক মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে।

ক্লাইভ নেই। কিন্তু ক্লাইভের কলকাতা তো রয়ে গেল। প্রাসাদ নগরী কলকাতা। পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বছর পরে ১৭৬২ সালে আবার একবার মহামারীর আবির্ভাবে কলকাতা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। বাঙালী মরল প্রায় ৫০ হাজার। সাহেব ১৫০০। রাস্তায় ঘাটে শকুনি-গৃধিনীর উৎসব। পচা দুর্গন্ধ, জঞ্জাল, আবর্জনায় মৃত্যু যেন আরও মহোল্লাসে শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসল শহর জুড়ে। কলকাতায় তখন জল-নিকাশের নালা নেই। বন্দোবস্ত নেই জঞ্জাল পরিষ্কারের। শহরের চারপাশে বন, জঙ্গল, আগাছা। উন্মুক্ত পয়ঃ-প্রণালী বলতে শহরের চারদিক জুড়ে প্রকাণ্ড মারাঠা ডিচ। শহরের বাইরে পূতিগন্ধময় ধাপা—যাকে সেদিন বলা হত Salt Water Lake. ইংরেজরাও তখন মড়াকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেত। আজকের মত গাড়িতে চাপিয়ে নয়। আর মৃতদেহকে চার্চ-ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হত রাত্রে। শহরে প্রতিদিন এত মৃত্যু যে, ইংরেজ-মহিলাদের মনে একটা চাপা আতঙ্ক সব সময়েই বিভীষিকার মত ঘিরে থাকত। তাই তাদের চোখ এড়িয়ে অন্ধকারের কালো চাদরের আড়াল দিয়ে মৃতদেহ কবরের দিকে পালাতো।

তখন খ্যাতনামা বা পদস্থ ইংরেজরা সবাই তটস্থ মৃত্যু ভয়ে। শহরের বাইরে যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা, শহর ছেড়ে সেইখানেই সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ক্লাইভ যখন শেষবার কলকাতায় আসেন—থাকতেন দমদমে। সংস্কৃতে পণ্ডিত, সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারক স্যার উইলিয়ম জোন্স থাকতেন গার্ডেনরীচে। ইলাইজা ইম্পে কাশীপুরে। হেস্টিংসের বাগানবাড়ি আলিপুরে। আলিপুর জজ-আদালতের গায়েই। বারওয়েল সাহেব থাকতেন সেন্ট স্টিফেন গির্জার

কাছে এক প্রাসাদোপম গৃহে। বারওয়েলের এই বাড়ির নাম পরে হয়েছিল "মিলিটারী অর্ফান এসাইলম"। এই অট্টালিকার ভেতরের সাজানো নাচঘর আর বাথরুমটি ছিল সেকালের কলকাতার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু।

দেশীয়দের মধ্যে উমির্চাদের বাগানবাড়ি ছিল হালসীবাগানে। সিরাজউদ্দৌলা ছাউনি ফেলেছিলেন এইখানে। ঐ বাগানবাড়ির কাছে তাঁর যুদ্ধের হাতীরা থাকত বলেই 'হাতীবাগান' জায়গাটার নাম হয়েছে।

তালতলা, শোভাবাজার আর কুমোরটুলী এই সময় থেকে খুব জাঁকাতে থাকে। সুতানুটিতে বাস করতেন রায়-রাঁয়া মহারাজা রাজবল্লভ। মহারাজা নন্দ-কুমারের ছেলে রাজা গুরুদাস বাস করতেন চড়কডাঙ্গায়। এখনকার নতুন বাজার এলাকাটাই ছিল তখনকার চড়কডাঙ্গা। পাথুরিয়াঘাটায় থাকতেন দেওয়ান রামচরণ। ইনি যে আন্দুল রাজ বংশের আদি পুরুষ সে কথা আগেই বলা হয়েছে। গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের বেনিয়ান ছিলেন ইনি। ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান হয়েছিলেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং। পাইকপাড়ার রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। থাকতেন জোড়াসাঁকোয়। কান্তবাবুও থাকতেন ঐখানে। মিঃ হেইলারের দেওয়ান দর্প নারায়ণ ঠাকুর থাকতেন পাথুরিয়াঘাটায়।

১৭৪২ সাল থেকে চৌরঙ্গী অঞ্চলে ঘন-বসতির শুরু হল। চোরকাঁটা কণ্টকিত চৌরঙ্গীর রাস্তাটাকে হলওয়েল সাহেব নাম দিয়েছিলেন—The Road leading to collegot (kalighat). অর্থাৎ 'কালীঘাটের পথ'। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও এই চৌরঙ্গীতে বাঘের ডাক শোনা গেছে। ১৭৯৪ সালে এই চৌরঙ্গীতে মোট ২৪ খানা বাড়ি তৈরি হয়।

ক্লাইভের সময়ে কলকাতার উত্তর দিকটাকে বলা হত 'নেটিভ টাউন'। ঐ সময়ে নেটিভ টাউনের অধিকাংশ ঘর বাড়ি ছিল গোলপাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি। পাকা বাড়িও ছিল কিছু। তবে সবই একতলা। তার কারণ বাড়ি বেশী উঁচু করলে বজ্রাঘাতের ভয়।

বাঙালী পাড়ার নাম যেমন 'নেটিভ টাউন', ইংরেজ পাড়ার নামটাও তেমনি 'হোয়াইট টাউন'।

এই সময়ে স্যার ইলাইজা ইম্পে, হোয়াইট টাউন পেরিয়ে মিডলটন রো-র কাছে একটা বিরাট বাগানবাড়িতে বাস করতেন। তাঁর বাড়ির চারপাশের

খোলা জায়গায় হরিণ চরতো অনেক। সেই থেকে জায়গাটার নাম হয়ে গেল 'ডিয়ার পার্ক'। এখন সেটাই হয়েছে পার্ক স্ট্রীট।

আর উল্টোদিকে নেটিভ টাউনের ভেতরে বাগবাজারের ঠিক গায়েই পূর্বদিকে পেরিন সাহেবের বাগান। এই বাগান কথাটা থেকেই এসেছে বাগবাজার নামটা। এই জায়গাটা তখন ছিল কোম্পানীর চাকর-বাকরদের একটা সৌখিন আনন্দনিবাস।

আর শোভাবাজার নামেই শোভা। দেখবার যা তা কেবল বন আর জঙ্গল। পাথুরিয়াঘাটাও তাই। 'রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট' রাজা নবকৃষ্ণের নিজের ব্যয়ে তৈরি। 'কোলা থেকে কুল্পি' পর্যন্ত ৩২ মাইল রাস্তা তিনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন। গার্ডেনরীচ কি বেলভেডিয়ার—এসব জায়গা তখন কলকাতা শহরের বাইরের জায়গা।

দোকান বাজার যেখানে—সেখানেই সব গুলজার। বড়বাজারে একেবারে ব্যবসায়ীদের বাড়ি। তাদের বাড়ির চারদিকে কাঠের বেড়া বসানো। ১৭১১ সালে মাত্র চারটে বাজারের খুব নাম। 'সন্তোষ বাজার', 'মণ্ডী বাজার' 'লাল-বাজার' আর সবশেষে 'বাজার কলকাতা'। পরে পরে তৈরি হল বড়বাজার, বৈঠকখানা বাজার, সুতানুটি বাজার, জান বাজার, ধর্মতলা বাজার, মেছুয়া বাজার, বৌবাজার। আরও পরবর্তী কালে অর্থাৎ ক্লাইভ আমলের পরে ১৭৯৪ সালের কাছাকাছি সময়ে ধর্মতলা আর চৌরঙ্গীর মোড়ে একটা বাজার ছিল। নাম 'সেক্ষপীয়র বাজার'।

কলকাতা ক্রমশ বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটা অপরিহার্য আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াতে লাগল। জমিজমা, ভিটে মাটি, ঘর বাড়ি, স্বগ্রাম, স্বদেশ ফেলে লোকে কলকাতা শহরের দিকে ছুটে আসতে লাগল—সমৃদ্ধির টানে, সৌভাগ্যের খোঁজে। কলকাতায় পাকা বাড়ি। কলকাতায় দুর্গ। কলকাতায় লালদিঘীর বাগানে রঙিন দৃশ্যপট। টাকা উড়ে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়। চাকরি, উপার্জন কি ব্যবসা এমন কি দালালি—যেদিকে মন চায় সোজা হেঁটে যাও, পথ পেয়ে যাবে। দু-দিন যেতে না যেতেই সেই পথ বেয়ে পকেটে গড়িয়ে আসবে টাকা, টাকা আর টাকা। চোখের পলকে ভাগ্য ফিরে যাবে তোমার।

সাহেবিআনার কত রঙ্গ। কলকাতার প্রসাদে সে স্বাদটাও পুরোপুরি মিলবে। চলো কলকাতা।—

"ধন্য হে কলিকাতা ধন্য হে তুমি।
যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি ॥
দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চাল।
নকলে বাঙালী বাবু হল যে কাঙ্গাল ॥
রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে।
ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে ॥'

॥ হেস্টিংস চরিতামৃত ॥

ইতিহাসের পাতায় এইবার নতুন নতুন অধ্যায়। নতুন নতুন ঘটনাবলী। কলকাতার আয়নায় মুখ রেখে ভারতবর্ষ প্রতিদিন দেখছে তার নতুন চেহারা, নতুন জৌলুষ।

ক্লাইভের সময় কোম্পানী ছিল দেওয়ান। নবাব ছিলেন নাজিম। তার ফলে অসুবিধে বিস্তর। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যা কিছু রাজস্ব তা পায় ইংরেজ কোম্পানী। তারাই রাজ্যের সেনাবাহিনীর সংগঠক। অথচ আবার বিচার-আচার মামলা-মোকদ্দমার ভার নবাবের বা দেশীয়দের হাতে। এর ফলে কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক যে-কোন বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে আসল ত্রুটি-বিচ্যুতি যে কোন্ পক্ষের—তার হদিশ মেলে না। সুতরাং শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন চাই। আর তার জন্যে চাই একজন যোগ্যতর গভর্নর।

ক্লাইভের স্বদেশযাত্রার পর বাংলার গভর্নর হয়েছিলেন প্রথমে মিঃ ভেরেলেস্ট, তার পরে জন কার্টিয়ার। তাঁরা কি যোগ্য নন কেউ? যোগ্য বৈকি? ১৭৬৯ সাল থেকে ১৭৭২ সালের কিছুদিন পর্যন্ত কার্টিয়ারের রাজত্বকাল। কত

সংক্ষিপ্ত সময়। অথচ ঘটনাব দিক থেকে এমন স্মরণীয়, এমন শোচনীয়, এমন নিরবচ্ছিন্ন ধ্বংসের, অনাহারের, উৎপীড়নের রাজত্বকাল বাংলাদেশ বুঝি দেখেনি কখনো। মনে নেই ছিয়াত্তরেব মন্বন্তরের কথা। রেজা খাঁর, যিনি মীরজাফরের আমল থেকে বাংলার রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান, নির্মম রাজস্ব সংগ্রহের নীতিই এই বিরাট ধ্বংসলীলার একমাত্র কারণ—সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। কার্টিয়াবের যোগ্যতা সম্পর্কে এর পরও যদি প্রশ্ন ওঠে তাহলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সেই শোচনীয় অবস্থার ছবিখানাকে চোখের সামনে মেলে ধরতে হয়। কিন্তু ছাপাব অক্ষরের অভাবে মানুষেব মুখে মুখে ঘুরে বেড়ানো দুঃখের পাঁচালী ছাড়া আর কিছুই নেই তাব স্মৃতি-চিত্র রচনা করার জন্যে। সে দুঃখের পাঁচালী শুনে মনে হবে এ কোন্ দীর্ঘশ্বাসের ছন্দে লেখা।

"নদ নদী খাল বিল সব শুকাইল।
অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল॥
দেশেব সমস্ত চাল কিনিয়া বাজাবে।
দেশ ছারখাব হল বেজা খাঁব তবে॥
একচেটে ব্যবসা দাম খবতব।
ছিয়াত্তবেব মন্বন্তব হল ভয়ংকর॥
পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মবে লোক অনাহাবে অখাদ্য খাইয়ে॥"

আব আছে একটি কবিতা। সাব জন শোবেব নিজেব লেখা কবিতা।

Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limber sunk eyes and lifeless hue,
Still hear the mother's shrieks and infant's moans,
Cries of despair and agonizing,
... ...
Dire scenes of horror which no pen can trace
Nor rotting years from memory's page efface.

আব কার্টিয়াব নয়। সত্যিকাবেব বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ কোন রাজ-কর্মচারীকে চাই।

হেস্টিংস বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ কর্মচারী। পার্শী ভাষায় প্রচুর পাণ্ডিত্য আছে তাঁর। ভারতীয় আচার-ব্যবহার সামাজিকতা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা

আছে। মাদ্রাজ ছাড়াও কলকাতায় কাশিমবাজারে কেটেছে তাঁর জীবনের বহু বছর। সিরাজউদ্দৌলা যখন কাশিমবাজার আক্রমণ করেছিলেন হেস্টিংস তখন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তাঁরই অধীনস্থ এক কর্মচারী কান্তবাবুর বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। গভর্নরী পদমর্যাদা লাভের পর হেস্টিংস কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোম্পানীর দেওয়ানী দিয়েছিলেন এই কান্তবাবুকে। কান্তবাবু ও হেস্টিংস প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর একটি রচনা এখানে খুবই উল্লেখ-যোগ্য। কান্তবাবু ছিলেন কাশিমবাজার কুঠির মুহুরী। ছড়াটি এই—

"হেস্টিংস সিরাজ ভয়ে হয়ে মহাভীত।
কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত ॥
কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়।
হেস্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয় ॥
কান্তমুদী ছিল তার পূর্বে পরিচিত।
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত ॥
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে।
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে ॥
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান ॥
মুশ্‌কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়।
হেস্টিংসে কি খেতে দিয়ে প্রাণ রাখা যায় ?
ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ।
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া কাছে কলাগাছ ॥
সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে।
হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে ॥"

আবার ক্লাইভের কলকাতা অধিকারের সময় তিনি তাঁর অধীনে বজবজের যুদ্ধে ভলান্টিয়ারের কাজ করে ক্লাইভের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর তাই ক্লাইভ তাঁকে মীরজাফরের দরবারে রেসিডেন্ট করে পাঠান।

সুতরাং এত যার গুণ, তাকেই দাও নতুন গভর্নরের পদ। ১৭৭২ সালে কাজেও পরিণত হল তাই।

সিরাজের কলকাতা অধিকারের সময় হেস্টিংস প্রথমবার বিয়ে করেছিলেন।

সেটা কলকাতায়। কাপ্তেন বুকাননের বিধবা পত্নী মেরীকে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। ১৬৯২ সালের কোম্পানীর কাগজপত্রে এইরকম নির্দেশ দেওয়া ছিল—কোম্পানীর যে কোন কর্মচারীই স্থানীয় মহিলাদের দুঃখমোচনার্থ বিবাহাদি করতে পারেন। এবং সেটা করাই কর্তব্য। হেস্টিংসের প্রথমবারের দার-পরিগ্রহের পেছনে রয়েছে সেই উদার মনোভাব। কিন্তু প্রথমা পত্নী ও কন্যা বেশী দিন বাঁচেনি। ১৭৫৯ সালে দুজনেই মারা যায়।

প্রায় ১৮।১৯ বছর বিপত্নীক অবস্থায় কাটিয়ে হেস্টিংস দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করলেন ১৭৭৭ সালে। সেটা হুগলীতে। মহিলার নাম বারনেস ইনহফ। হেস্টিংসের শহরের আবাস-গৃহ ছিল বরণ কোম্পানীর আপিস বাড়িতে। সেই আবাসগৃহ সমস্ত সময় গম্‌গম্‌ করতো হেস্টিংস পত্নীর নাচগানের অবিরাম গুঞ্জরনে।

হেস্টিংসের চরিত্র সম্পর্কে নানা জনের নানা ধারণা। তাঁর একটা বিলাস-গৃহ ছিল আলিপুরে। আলিপুর জজ আদালতের গায়ে। এই বাড়িটার নাম ছিল 'হেস্টিংস হাউস'। এরই কাছে মীরজাফর ও মণি-বেগমের অট্টালিকা। অনেকের মতে হেস্টিংসের বাগান আর বাড়ি যে জায়গার ওপর সেটা মীর-জাফরের কাছ থেকেই উপহার-স্বরূপ পাওয়া। আলিপুর যাওযার পথে পড়ে টলির নালা। হেস্টিংস তাঁর বিলাস-গৃহে যাতায়াতের সুবিধের জন্যে এই নালার ওপর একটা সেতু তৈরি করান।

আলিপুর ছাড়াও হেস্টিংসের আরও বাগানবাড়ি ছিল। রিষড়া, কাশীপুর ও সুখ-চরে। রিষড়া আর কাশীপুরের বাগানবাড়িতে হেস্টিংস ক্বচিৎ-কদাচিৎ গেছেন। সবচেয়ে প্রিয় প্রমোদ-ভবন ছিল সুখচরেরটা। এই বাড়ি পাশ্চাত্য স্থাপত্যের একটা সুন্দর নিদর্শন। এই বাড়ির গায়েই ফার্ম। অনেক পরে সুবিখ্যাত এক ধনী, নাম বোরেটো, এই বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন আর সেখানে তৈরি হয়েছিল রোমান ক্যাথলিক গির্জা। গির্জার রূপান্তর ঘটল বোরেটোর উত্তরাধিকারী লওরাঁলেটোর হাতে পড়ে। সেটা হয়ে দাঁড়াল ব্যবসাদারদের বাসভবন আর মোরগের লড়ায়ের আড্ডা। সে প্রমোদভবন বা গির্জা আজ গঙ্গার অতলে বিলীন। লর্ড কার্জন বলেছিলেন—হেস্টিংস মোটামুটি ১৩টা বাড়িতে বাস করতেন একসঙ্গে।

চরিত্রের কথা বলা হচ্ছিল না? হ্যাঁ—হেস্টিংসের আমলে মট্‌ সাহেব নামে একজন সাহেব ছিলেন কলকাতার পুলিসের অধিকর্তা। ইনি প্রথমে ছিলেন

একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী। ক্লাইভের আদেশে ১৭৬৬ সালে তিনি উড়িষ্যায় মণির খনি আবিষ্কারের জন্যে যান। হেস্টিংসের আমলে তিনি থাকতেন চুঁচুড়ায়। বন্ধুত্ববশতঃ তাঁর আমন্ত্রণে হেস্টিংস বহুবার চুঁচুড়ায় যেতেন আসতেন। এই মট্ সাহেবের নামে কলকাতার একটা রাস্তার নামকরণ হয়—মট্ লেন। সে যা হোক—একবার দেনার দায়ে পড়ে মট্ সাহেবকে হাজত বাস করতে হয়। তখন মট্ সাহেবের পত্নী ৫০০ মোহর নিয়ে হেস্টিংস পত্নীর সঙ্গে বিলেতে পাড়ি দেন। অনেকে ফিস্‌ফাস্ করে যে হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে নিশ্চয়ই মট্ পত্নীর কিছুটা আঁতের যোগ রয়েছে।

এই সব ঘটনা হেস্টিংসের ব্যক্তি জীবনের ওপর অনেক আলো ফেলে। কিন্তু এ ছাড়া তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অনেক ঘটনাকেও আত্মপ্রকাশের আলোয় টেনে আনতে হবে।

হেস্টিংসের রাজত্বকাল ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫। এত দীর্ঘকাল আর কেউ গভর্ণরী করেননি। এই ১৩ বছর নানা ঘটনা-সংঘাত, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে কেটেছে। আর হেস্টিংসের আমলকেই বলা হয় বাংলার দারুণ দুর্দশার আমল। তার কারণ হেস্টিংসের আমলের ইতিহাস এক নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-লালসা ও অর্থ-গৃধ্নুতার ইতিহাস। বিদেশী সাহেব আর স্বদেশী রাজা-মহারাজার আবির্ভাব—এই সময়ের বাংলাদেশকে রক্তপান করার মত করে কেবল শুষেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যখন সর্বরিক্ত বাংলাদেশ জীর্ণ কংকালের স্তূপের মধ্যে কোনমতে নিশ্বাসের না জীবনের সাড়াটুকু জাগিয়ে কি বাঁচিয়ে রেখেছে হেস্টিংস সেই নিদারুণ সময়েও রাজস্ব আদায়ের কড়াকড়ি বিধিব্যবস্থার ফাঁস একটুও আলগা করতে রাজী হন্‌নি। এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের রাজস্ব ১৭৬৮ সালের রাজস্বকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল বলে হেস্টিংস খুব আনন্দ পেয়েছিলেন নিজের কৃতিত্বে।

সংগঠনী কাজ হয়েছে অনেক। কিন্তু সমগ্র দেশ তার ফলে খুব যে এগিয়ে যেতে পেরেছে তা নয়। ভাঙা এবং গড়া—এই দুটো দিক্‌কেই চোখের সামনে রেখে আমাদের মনের আগ্রহ আর চোখের বিস্ময়কে ইতিহাসের পাতার ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

১৭৭২ থেকে ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলার গভর্ণর। ১৭৭৪ সালের পর থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন প্রথম গভর্ণর

জেনারেল। তাঁর বার্ষিক আয় ২॥০ লক্ষ টাকা। আরও চারজন বিশেষ সদস্য ছিল তাঁর সভায়। তাঁদের বেতন বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা। সদস্যদের নাম হল—রিচার্ড বারওয়েল, ক্লেভারিং, কর্নেল মনসন আর ফিলিপ ফ্রান্সিস। এই চারজন সদস্য যেদিন প্রথম বিলেত থেকে ১৭৭৪ সালের অক্টোবরে চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ থেকে নেমে কলকাতার মাটিতে পা দিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে ১৭টি তোপধ্বনি করে তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হল। পলাশী-বিজেতা ক্লাইভকেও এ সম্মান জানানো হয়নি কখনো। তবু মাত্র ১৭টি তোপধ্বনি করা হয়েছে বলে ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রথম পরিচয়ের শুভলগ্ন থেকেই হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মনে মনে এক ক্ষুব্ধ বিদ্বেষের জাল বুনতে লাগলেন। তিনি আশা করেছিলেন তোপধ্বনি করা হবে ২১ বার। ফিলিপ ফ্রান্সিস ও তাঁর মন্ত্রী বারওয়েল—এই দুজনে মিলে চক্রান্ত আঁটতে লাগলেন হেস্টিংসের পদমর্যাদাকে কি করে, কখন, কতখানি খাটো করা যায়। যথাসময়ে তার বিস্তৃত বিবরণ পেশ করা হবে।

ভারতবর্ষে সিভিল সার্ভিসের সূচনা হল হেস্টিংসের আমল থেকে। রাজস্ব সংগ্রহের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা নতুন করে সাজানো হল। শুধু মাত্র শহরে টহল দিয়ে বেড়ানো ছাড়া পুলিসী ব্যবস্থা আরও উন্নত ধরনে গড়ে তোলা হল।

রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বিলেতের কর্মচারীরা অনভিজ্ঞ দেখে এই চাকরিতে দেশীয়দের বহাল করা শুরু হল সর্বত্র। তাতে কোম্পানীর লাভ হতে লাগল অনেক। রেজা খাঁ-ই ছিলেন এতদিন বাংলার ফৌজদারী বিচারেরও কর্তা। তহবিল তছরুপের অভিযোগে তাঁকে সপরিবারে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় এনে চিৎপুরে নজরবন্দী করে রাখা হয়। সেই সঙ্গে সীতাব রায়কেও। বিচারে প্রচুর অর্থদণ্ড হল তাঁদের। দু-বছর পরে এই বন্দীত্ব থেকে তিনি মুক্তি পেলেও—আগের কার্যভার আর ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।

তারপর বাংলা-বিহারের পুরনো দেওয়ানী আর নায়েবী পদমর্যাদাকে আপদ বিদায়ের মত তাড়িয়ে তার বদলে দুটো দেশকে ১৮টা জেলায় ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে একজন করে কালেক্টর নিযুক্ত করা হল। সদর দেওয়ানী আর সদর নিজামত আদালত তৈরি হল কলকাতায়। কলকাতায় উঠে এল মুর্শিদাবাদের কোষাগার। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৪ সালের মধ্যে মেয়র কোর্টের বদলে বাড়ি তৈরি হতে লাগল সুপ্রীম কোর্টের। তার প্রধান বিচারপতি

হয়ে এলেন স্যার ইলাইজা ইম্পে। বার্ষিক বেতন ৮০,০০০৲ টাকা। যতদিন না সুপ্রীম কোর্টের বাড়ি তৈরি হল—ততদিন তার কাজ চলতে থাকল মিঃ বুশিয়ে নামক একজন সওদাগরের বাড়িতে। এই বাড়িকে লোকে বলতো কোর্ট হাউস। ১৮৭২ সালে সুপ্রীম কোর্টের নব-নির্মিত বাড়ি ভেঙেই সেখানে বর্তমান হাইকোর্ট তৈরি হয়।

পুরনো রীতি পাল্টায়। নতুন রীতি তার জায়গা দখল করে। বাংলার নবাবকে এতদিন ধরে একটা ভাতা দিয়ে আসা হচ্ছিল। হেস্টিংসের তীব্র অর্থ-লালসা। রাজকোষে অর্থের প্রয়োজন আরও তীব্র। তাই তিনি এই ভাতার টাকা অর্ধেক ছেঁটে দিলেন। তাতে কোম্পানীর ১৬৩ হাজার পাউণ্ড বেঁচে গেল। এতকাল ধরে দিল্লীর সম্রাটকে নজরানা দিয়ে আসা হচ্ছিল কোম্পানীকে দেওয়ানী দানের কৃতজ্ঞতার মূল্য হিসেবে। ৩০০ হাজার পাউণ্ড। সেটা অর্ধেক নয় পুরো ষোল আনাই বন্ধ করে দেওয়া হল। এ ছাড়াও ক্লাইভের সঙ্গে সন্ধির সর্তানুসারে এলাহাবাদ আর কোরা এই দুটি রাজ্যের আয় সম্রাটের প্রাপ্য। হেস্টিংস সে আয়ের পথকেও একদম চিররুদ্ধ করে অযোধ্যার নবাব-উজীরকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আর প্রয়োজনের মুহূর্তে সৈন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তা দিয়ে দিলেন। সম্রাটকে নজরানা দিয়ে কি লাভ? উত্তর ভারতের একচেটে আধিপত্য মারাঠাদের হাতে। এমন কি দিল্লীর বাদশাহের স্বাধীনতাও। সম্রাটকে নজরানা দেওয়া মানে সেই টাকায় ইংরেজের পরমতম বা চরমতম শত্রু মারাঠাদের অর্থবল যোগান দেওয়া। সুতরাং এখানে নিয়মভঙ্গ করাটাই নিয়ম।

টাকা চাই, টাকা চাই। হেস্টিংসের দিন-রাত্রির চিন্তা। টাকা এসেও যায় বেশ ঘটনাক্রমে।

বেনারসের চৈত্ সিং ইংরেজদের রক্ষা-ব্যূহের ভেতরে থেকেই বেনারসের রাজা। আগে অযোধ্যার নবাব-উজীরের অধীনস্থ ছিলেন তিনি। ১৭৭৫ সালে নবাব-উজীর ইংরেজদের বেনারসের অধিকার দিলে চৈত সিং-এর সঙ্গে ইংরেজদের এক চুক্তি হয়। তাতে বছরে ২২৷৷০ লক্ষ টাকা কর দেবার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু প্রয়োজনানুসারে হেস্টিংস খুশিমত টাকা আদায় করতেন। ১৭৮১ সালে চৈত সিংএর ওপর একহাজার অশ্বারোহী সেনা পাঠাবার আদেশ করা হয়। কিন্তু এই আদেশ পালনের ভেতরে তাঁর শৈথিল্য ঘটায় চৈত সিং-এর জরিমানা করা হয় ৫০ লক্ষ টাকা। পরে তিনি নিজে সসৈন্যে

জরিমানার টাকা আদায়ের জন্যে বেনারস যাত্রা করেন। অযোধ্যার বেগমের কাছ থেকেও এমনি জোর জুলুম করে তিনি অনেক টাকা আদায় করেছিলেন। চৈত্ সিং-এর ভয়ে হেস্টিংসের পলায়নের কাহিনী আজও একটি ছড়ার ছন্দে প্রাণবন্ত।—

"হাতী পর হাওদা,
ঘোড়া পর জীন।
জল্‌দি আও, জল্‌দি আও
ওয়ারেন হেস্টিন।।"

হেস্টিংসের আমল এক ভাঙা আর গড়ার, সৃষ্টি আর ধ্বংসের উদ্যোগ পর্ব। সেই ধ্বংসের একটা দিক মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী।

মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী কোন একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। বহুদিনের সুপরিকল্পিত। দুই দিকে দুই ইংরেজ তাঁর ফাঁসীর দড়িতে টান মেরেছে। এক-জন পক্ষে থেকে। তিনি ফ্রান্সিস। আরেকজন বিরুদ্ধাচরণ করে। তিনি হেস্টিংস। ফ্রান্সিসের পক্ষে থাকার কারণ তিনি হেস্টিংসের প্রধানতম শত্রু। আর হেস্টিংসের বিরুদ্ধাচরণের মূলে নন্দকুমারের ঔদ্ধত্য। নতুন নতুন বিলাস ভবন, নতুন প্রণয়িনী, রাজসুখ-সম্ভোগ, জীবনের নিশ্চিত আরাম—বারবার ব্যাহত বিপর্যস্ত হয়েছে এই পদস্থ বাঙালীর আক্রমণে। দোষগুণের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। পদস্থ রাজকর্মচারীদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আর উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ নিয়ে আসছেন তিনি কলকাতার মন্ত্রীসভায়। আর ফিলিপ ফ্রান্সিসের গোপন অভিসন্ধি নন্দকুমারের এই সব উদ্যমের আগুনকে বারবার উস্‌কে দিচ্ছে। সুতরাং এর একটা দ্রুত হিত-বিহিত করা প্রয়োজন।

হিত-বিহিত করতে বেশী সময় লাগলো না। সাজানো সাক্ষী, সাজানো বিচারক, আর বিচারকের ওষ্ঠাগ্রে সাজানো রায়—সবই পরিপাটি করে সাজানো।

একদিন মহারাজার নামে আকস্মিকভাবে এক পরোয়ানা এসে হাজির। কি অভিযোগ? না, ছ-বছর আগে তিনি একটা দলিল জাল করেছেন। ১৭৭৫ সালের মে মাসের ৬ই তারিখে বিচারপতি লেমেস্টার ও হাইড সাহেবের সামনে তাঁর বিচার শুরু হল। প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে। নন্দকুমারকে আটক করে রাখা হয়েছে সাধারণ কারাগারের এক আলো

বাতাসহীন অন্ধকার ঘরে। তাঁর অ্যাটর্নী জারেট সাহেব ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদমর্যাদাসম্পন্ন এই ব্যক্তিকে অন্য কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ রাখার আবেদন জানালেন। সে আবেদন বিচারালয়ের ইঁট পাথরের শক্ত বুকেই আলোড়ন তুলল কেবল। বিচারপতিদের কোমল হৃদয়ে নয়। এমন কি পানাহারেরও কোন সু-বন্দোবস্ত করা হল না। কেবল সু-বন্দোবস্ত করা হল যাতে ৫ই অগস্টে ফাঁসীর ব্যবস্থাটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

হেস্টিংস প্রবর্তিত ইংলণ্ডের আইন-কানুন আর শাসন-ব্যবস্থার ন্যায়-রজ্জুতে প্রথম বাঙালী সন্তানের বলিদান যথাযথ ভাবেই সম্পন্ন হল।—

"বাঙলা এগারো শত সিরাশির সালে,
একুশে শ্রাবণ শনিবার সকালে
ব্রহ্ম নাশ হয়ে গেল আলিপুরের মাঠে,
হেস্টিংসের হৃৎকম্প হত যার দাপটে।
লোকারণ্য মাঠ ঘাট লাগিল কাঁদিতে,
ফাঁসী হল শুনে লোক লাগিল ছুটিতে।
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি যেই নিল শিরে,
এই পরিণাম তার লোকে চিন্তা করে।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল ইহার;
হেস্টিংস ইম্পের কেমন বিচার!"

হেস্টিংসের আমল রাজা মহারাজার আমল। হেস্টিংসের যুগ তোষামুদির যুগ। নন্দকুমার মহারাজা ছিলেন। কিন্তু হয়তো তোষামোদপ্রিয়তা তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল বলেই—তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যু। অথচ অন্য রাজা মহারাজাদের জীবন যেমন বহাল তবিয়তে, ঐশ্বর্যের আথালি পাথালি স্রোতের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছিল—তেমনিই চলতে লাগল।

ক্লাইভের সময়ই হঠাৎ-হওয়া রাজা মহারাজাদের জন্ম প্রভাত আর তাঁদের দৌরাত্ম্যের দুপুর হেস্টিংসের রাজত্বকালে। গঙ্গাগোবিন্দ, দেবী সিং, রাজা নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু, রাজা রাজবল্লভ—এঁরা সব ডাকসাইটে রাজা-মহারাজা। রাজ্য চলে এঁদেরই পরামর্শে। অর্থ রোজগারের জন্যে এঁরা যত অনর্থই ঘটান না কেন—তবু এঁদের শাস্তি হয় না। সুন্দরী স্ত্রীলোক নিয়ে ব্যভিচার করলেও বিচার হয় না। দেশের সর্বনাশ করার প্রতিযোগিতায় যে যত উদ্যোগী—তাঁর কপালে ততই রাজানুগ্রহ, সম্মান, উপাধি আর উপঢৌকন।

আর এই বিশৃঙ্খল রাজ্যশাসনের গলদ ফাঁস করতে গিয়েই—নন্দকুমারকে প্রাণ দিতে হল ফাঁসীর দড়িতে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পথে হেস্টিংস তুলে দিলেন একটা নির্মম আতঙ্কের দেওয়াল। যাতে প্রতিবাদের মুখ চিরকালের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রতিবাদ যারা করতে পারত, কলকাতার কি বাংলীর সাধারণ মানুষ, তারা তাদের হৃদয়ের বিক্ষুব্ধ ব্যথাকে কেবল গানের ছন্দে চিরকালের জন্যে গেঁথে রাখলো।—

"মহারাজা নন্দকুমার রে ;
তোর রাজ্যপাট জমিদারী কারে দিলি রে ?
নন্দকুমার রায় ছিল বাংলার অধিকারী
হেস্টিংস সাহেব এল জান করিবার বারি।
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা যোড়া ডিঙি বেয়ে॥
খোপেতে কৌতর কাঁদে ফোহারাতে হাঁস।
যোড় বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার গুলতি বাঁশ॥
ছোটরানী উঠে বলে বড়রানী গো দিদি।
সিঁতেয় ছিল কড়া সিন্দুর বঞ্চিৎ কবলেন বিধি।"

নন্দকুমারকে হত্যা করার অপরাধে যে ইংরেজ স্বদেশে এবং ভারতবর্ষে চিরকাল অপমান আর ঘৃণা কুড়িয়েছে—নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস সেই ইংরেজ হেস্টিংসের ক্রীতদাস হয়ে উঠলেন। কেননা এর পেছনে রয়েছে—অর্থ-লালসা, পদমর্যাদার বাসনা, ইংরেজ অনুগ্রহলাভের উৎকণ্ঠা। এ হল একদিক। আরেক দিকে স্বয়ং হেস্টিংসকেই ক্রীতদাস করে তুলেছেন রাজা নবকৃষ্ণ।

কবে তাঁর কাছে হেস্টিংস পারসী ভাষা শিখতেন। তার মূল্য অনেক দিয়েছেন হেস্টিংস। মহারাজা উপাধি থেকে শুরু করে অনেক কিছু। তবু অর্থ আর সম্মানের লালসা, পরশ্রীকাতরতা, পাপ আর প্রতিহিংসাপরায়ণতা তাঁর মন থেকে মোছেনি।

রাজা রাজবল্লভ কলকাতা গভর্নর সভার সভ্য। ১ লক্ষ টাকা তাঁর বার্ষিক বেতন। পদমর্যাদায় তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালী। নবকৃষ্ণের পদমর্যাদা অনেক নীচে তাঁর চেয়ে। একবার কি একটা কাগজে সই করানোর জন্যে হেস্টিংস সাহেব নবকৃষ্ণকে পাঠিয়েছেন রাজা রাজবল্লভের বাগবাজার বাড়িতে। রাজা

রাজবল্লভের কাছে তখন আরও দুজন লোক ছিল। নবকৃষ্ণ কাগজ নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন, মহারাজা পাঠ করতে বলার পর পড়লেন। তারপর রাজবল্লভ সই করে দিলেন। সমস্ত সময় নবকৃষ্ণকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

নবকৃষ্ণ হেস্টিংসের কাছে গিয়ে চাকরির ইস্তফাপত্র দাখিল করলেন। তাঁর চোখে মুখে তখন অপমানের দারুণ জ্বালা, লজ্জার বিষণ্ণতা। হেস্টিংস আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শুনে নবকৃষ্ণের দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করলেন। তিনি কোম্পানীর মন্ত্রণাসভা থেকে রায়রাঁয়া পদটি চিরকালের জন্যে উঠিয়ে দিলেন। রাজা রাজবল্লভের পদচ্যুতি ঘটানোর পক্ষে নবকৃষ্ণের সামান্য অভিমানই যথেষ্ট। হেস্টিংস যেন নবকৃষ্ণের হাতের পুতুল।

এর প্রতিবাদ করবে কে? সমালোচনার সাহস আছে কার? আছে এক-জনের। তিনি ফিলিপ ফ্রান্সিস। কিন্তু সেই বা আর ক-দিন। ১৭৮০ সালে তাঁকে কলকাতা ছেড়ে বিলেতে পাড়ি দিতে হল। তবে যতদিন ছিলেন—ততদিন হেস্টিংস তাঁকে বাঘের মত ভয় করতেন। তাঁদের পারিবারিক বিদ্বেষ এতদূর গড়িয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে হল। যুদ্ধে আহত হলেন ফ্রান্সিস। বিলেতে গেলেন বটে—কিন্তু আঘাতের দাগ তাঁর মন থেকে মুছল না। বিলেতে গিয়েও তিনি হেস্টিংসের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটতে লাগলেন।

হেস্টিংসের এক শত্রু বিদায় হল। আরেক শত্রু মাথা চাড়া দিল সঙ্গে সঙ্গে। তিনি হিকি সাহেব। তাঁর প্রকাশিত কাগজে হেস্টিংস এবং অন্যান্য রাজ-প্রমুখদের ওপর তীব্র কটাক্ষবাণ হানা হত। হিকির কাগজ যাতে ডাক-যোগে বিলিবন্দোবস্ত না হয়—তার পুরোপুরি ব্যবস্থা করেও হেস্টিংস শান্ত হতে পারলেন না। আদালতের আইনের শিকলে তাঁকে জেলখানায় আটকে রাখলেন।

একদিকে চুরি, ডাকাতি, জুয়াচুরি, ঘুষ, জেল, জরিমানা, মানহানির নালিশ। ছোট ছোট দাঙ্গা। ছোট ছোট বিশৃঙ্খলা। কিংবা ধ্বংস।

এরই পাশে পাশে রয়েছে ছোট ছোট গড়া। সংগঠন। কিংবা সৃষ্টি।

প্রথমেই ধরা যাক্ মাদ্রাসার কথা। হেস্টিংসের রাজত্বকালে দেওয়ানী কাজের ভার কোম্পানীর হাতে আসার পরেও অনেকদিন মুসলমান কর্মচারীদের হাতে ছিল ফৌজদারী কাজের ভার। তখন বিচার-বিভাগে জজ্‌দের সাহায্য করার জন্যে একজন আইনজ্ঞ মৌলবী সঙ্গে থাকতো। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয়া

সেকালে খুব কঠিন। একদিকে এই প্রয়োজন। অন্যদিকে সিংহাসনচ্যুত রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিপ্রায়। এই দুই ইচ্ছার যোগফলেই কলকাতায় ১৭৮০ সালে মাদ্রাসা সৃষ্টির সংকল্প জাগল হেস্টিংসের মনে। বিলেতের ডিরেক্টরদের মতামতের বা অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখেই তিনি নিজের তহবিল থেকে জমি ক্রয়ের আর গৃহ নির্মাণের টাকাটা দিয়ে দিলেন। পরে ডিরেক্টর সভা তাঁকে ঐ টাকা প্রত্যার্পণ করেছিলেন। বৌবাজারের দক্ষিণে যে বাড়িতে আগে চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের জেনানা মিশন ছিল—সেই জমির ওপরেই মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু জায়গাটা খুব অস্বাস্থ্যকর ভেবে এবং ছাত্রদের শারীরিক আর মানসিক উন্নতির পরিপন্থী হবে ভেবে ১৮২৪ সালের ১৫ই জুলাই মুসলমানবহুল কলিঙ্গাতে অর্থাৎ এখনকার ওয়েলেসলী স্ট্রীটে নতুন করে ভিত্তি স্থাপন হয় এই মাদ্রাসার।

প্রথমদিকে মাদ্রাসায় প্রাচীন আরবী ও পারসী ভাষায় সব কিছু শেখানো হত। সেই সঙ্গে মুসলমান আইন কানুন। এই মাদ্রাসার তত্ত্বাবধান করতেন একজন প্রাচীন মৌলবী। তাঁর নাম মজীদ উদ্দীন। স্কুল চালানোতে ৬২৫৲ টাকা খরচ হত।

১৭৮৩ সালে মেজর কিলপ্যাট্রিক একটা মিলিটারী অর্ফান স্কুল তৈরি করলেন। প্রথমে সেটা ছিল হাওড়ায়। পরে ১৭৯০ সালে নতুন করে স্থাপন করা হয় খিদিরপুরে। বারওয়েলের বাড়িতে। নাম হয় খিদিরপুর মিলিটারী অর্ফান স্কুল। এই বাড়ির ভেতরে ছিল একটা সুদৃশ্য বল্‌-রুম।

এর পরেই আসে এসিয়াটিক সোসাইটির কথা। ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুআরি এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্যার উইলিয়ম জোন্স এর প্রথম সভাপতি আর হেস্টিংস এর প্রথম পৃষ্ঠপোষক। এই সোসাইটির কল্যাণেই বাংলাদেশে অর্থাৎ কলকাতায় পুরাবৃত্তের চর্চা প্রসারিত হয়। এইখান থেকেই সংস্কৃত মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতি মাসের প্রথম বুধবার রাত্রি ৯টার সময় ৫৭ নম্বর পার্ক স্ট্রীটের একটি বাড়িতে এই সভার অধিবেশন হত। ১৮০৬ সালের পর এই সোসাইটির নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়।

আর কি বিচিত্র ছিল সেকালের লটারী খেলা। ১৭৮৪ সাল থেকেই প্রথম লটারী খেলা শুরু হয়। এই খেলার উৎপত্তি হয় শহরের যাবতীয় হিতসাধনের উদ্দেশে। সেকালের অধিকাংশ সাধারণ অট্টালিকা, ভালো ভালো রাস্তা সবই

তৈরি হয়েছিল এই লটারীর টাকায়। টাউন হল, স্ট্রাণ্ড রোড, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ট্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ-গৃহ—এ সমস্তই সে সময়ে লটারীর টাকার তৈরি। কলেজ স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীটও। এই লটারী খেলার জন্যে তখন একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল—লটারী কমিটি। প্রথম প্রথম আমদানি মালপত্র থেকে আরম্ভ করে অতি মূল্যবান সম্পত্তি পর্যন্ত লটারীর সাহায্যে বিক্রি করা হত। টেরিটি বাজার নামে একটা বাজারের দাম ছিল এক সময় প্রায় ২ লক্ষ সিক্কা টাকার মত। এই বাজারও এক সময় লটারীর পুরস্কার ছিল। গভর্নমেণ্টের অনুমোদন নিয়ে লটারী খেলা শুরু হয় ১৮০৯ সাল থেকে। সেই খেলার প্রথম পুরস্কার ছিল ১ লক্ষ টাকা। মোট পুরস্কার ছিল ৩ লক্ষ টাকা। ১৮৩৮ সালের শেষদিকে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে এই লটারী খেলার প্রচলন একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

কুমারটুলীর গোকুল মিত্র বিরাট চাঁদনী চক্ বাজারটা মাত্র দশ টাকার লটারীর টিকিটে পেয়েছিলেন।

১৮২৫ সালের সংবাদপত্রে লটারী খেলা সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

সংবাদটি এই রকম:—"কলিকাতা লাটরী খেলা। গত বৃহস্পতিবার গভর্নমেণ্ট গেজেট দ্বারা অবগত হইয়া লাটরী খেলা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা নগরের শোভা করিবার নিমিত্তে সন ১৮২৫ সালে প্রথম লাটরী গভর্নমেণ্ট দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার ব্যাপার লাটরী-কমিটির আজ্ঞানুসারে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট করিলেন তাহার ধারা গতবারের ন্যায় প্রাইজ হইবেক। এবং সেই ধারা মাফিক খেলা হইবেক এবং টিকিট বাঙ্গালা বেঙ্কে বিক্রয় হইবেক। প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ১০০ শত টাকা।"

লটারীর কথা এইখানেই শেষ হল। এবার আসছে ছাপাখানার কথা। হেস্টিংসের আমলের একটি সবচেয়ে বড় অবদান। ১৭৭৮ সালে হলহেড (Mr. N. B. Halhead) সাহেবের লেখা বাংলা বই (ব্যাকরণ) হুগলীতেই প্রথম ছাপা হয়। চার্লস উইলকিন্স এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। আর পঞ্চানন কর্মকার তার কাঠের অক্ষরগুলি খোদাই করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া দরকার।

হলহেড সাহেব কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ান। তিনিই প্রথম বাংলাভাষায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইংরেজ। বই লেখা হয়েছে বাংলায়। বাংলা অক্ষর না

পেলে ছাপা যায় কেমন করে? হেস্টিংস চার্লস উইলকিন্স নামে আর একজন সিভিলিয়ানকে অনুরোধ জানালেন—বাংলা অক্ষরের ছেনি কেটে দিতে। উইলকিন্স্ পণ্ডিত প্রবর ব্যক্তি। তিনিই ১৭৮৫ সালে হেস্টিংসের আগ্রহের আতিশয্য দেখে সংস্কৃত ভাগবৎ-গীতা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে ছাপিয়ে প্রকাশ করলেন। বাংলা ভাষা তাঁর কম জানা নয়। এর আগে নিজের খুশিমত তিনি দু-একটা অক্ষর ছেনি কেটে তৈরিও করেছেন। সুতরাং উইলকিন্স্ এ কাজের সত্যিকারের যোগ্য পুরুষ। তাছাড়া হল্হেড আবার তাঁর বন্ধু। সুতরাং দ্বিধাহীন ভাবেই তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম শুরু করে দিলেন এই বাংলা অক্ষর তৈবির কাজে।

সহস্তেই তিনি সব কাজ করেছেন কিন্তু একজন সঙ্গী ছাড়া এ কাজ তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। সঙ্গীটির নাম পঞ্চানন কর্মকার। উইলকিন্স্ তাঁকে হাতে ধরে এই কাজ শিখিয়েছিলেন। আর পঞ্চানন কর্মকারের কর্মপটুতা ও কৃতিত্ব ছিল তেমনি প্রবল। হল্হেডের ব্যাকবণ ছাপা হবার পরে পঞ্চানন তার চেয়েও ছোট একসেট বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। ১৭৯৩ সালে সেই হরফে কর্নওয়ালিসের কোড ছাপা হয়েছিল।

১৮০০ সালের শুরু থেকে পঞ্চানন কর্মকার শ্রীরামপুবের ব্যাপটিস্ট মিশনারী-দের ছাপাখানায় কাজ করতে শুরু করেন। শ্রীরামপুব মিশন পঞ্চাননকে পেয়ে সেখানে একটা টাইপ ঢালাইযের কারখানা প্রতিষ্ঠা করলে। এরই তিন বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। জামাই মনোহরকে তিনি শিখিযে পড়িযে মানুষ করে গিয়েছিলেন। পঞ্চাননের ছেলে কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীও পরবর্তীকালে যথেষ্ট সম্মান পান কর্মপটুতা দেখিয়ে।

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রথম বই বাংলা হবফে ছাপা হল হুগলীতে। এইখানেই আমাদের ছাপাখানার জন্মস্থান। এর পর হুগলী থেকে শ্রীরামপুরে বাংলা ছাপার কেন্দ্র স্থানান্তরিত হযে যায়। মিশনারীদের হাতে বাংলা সাহিত্যের, বাংলা গদ্যের, বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের যে নবজন্ম ঘটল পরবর্তী কালে, সে বিবরণ যথাসময়েই হাজির করা হবে। আপাতত আবার হেস্টিংস প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

হেস্টিংসের চরিত্র বিচার করা বড় জটিল কাজ। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত সত্যিকারের শুরু হয তাঁর সময থেকে। হেস্টিংসের রাজস্ব সংগ্রহের কঠোর বিধিব্যবস্থা থেকেই বণিকের মানদণ্ডের বদলে- ক্রমশই ধনিকের রাজ-

দণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাসের ওপরে একটা কালো কঠিন ছায়া ফেলে ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল। আগে বাংলাদেশ ছিল গ্রামে। এখন বাংলাদেশ ছুটে আসছে শহর কলকাতার দিকে। নবদ্বীপের টোল টাল খাচ্ছে কলকাতার মাদ্রাসায়। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ আর অষ্টাদশ শতাব্দীর হত্যা, ধ্বংস, অত্যাচারের পর্ব-পর্বান্তরে ভরা ইতিহাস—হেস্টিংসের আমল এই দুই যুগের মাঝখানে এক সন্ধিক্ষণ।

হেস্টিংসের পর বাংলার গভর্নর জেনারেল হলেন লর্ড কর্নওয়ালিস। ১৭৮৫ সালে হেস্টিংস পদত্যাগ করেন। ১৭৮৬ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেলের পদমর্যাদা গ্রহণ করলেন। মাঝের এই টুকরো সময়টুকু অস্থায়ী গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা নিয়ে শাসনকার্য চালালেন কাউন্সিলের প্রধান সদস্য মিঃ ম্যাকফারসন।

কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কর্নওয়ালিসের হাতে এল সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত বিভাগের কর্তৃত্ব। তিনিই গভর্নর জেনারেল। আবার তিনিই প্রধান সেনাপতি। একে দুই। দুয়ে এক। অন্য কারো মতের অপেক্ষা না রেখেই তিনি শাসন সংস্কারের উগ্র উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে। ১৭৯৩ সালে চালু করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বাংলার গ্রাম সমাজের এক চিরস্থায়ী ধ্বংসের এবং সংকটের বন্দোবস্ত। হেস্টিংসের আমল থেকে এই বন্দোবস্তের সূচনা। কর্নওয়ালিসের রাজত্বে তার সার্থকতা আর আইনসঙ্গত স্বীকৃতি।

হেস্টিংসের ছিল পাঁচ বছরের জন্যে ইজারাবিলি। পাঁচ বছর পরে যে আরও বেশী খাজনায় জমিদারী ডেকে নিতে পারবে—তারই অধিকার। ফলে বেপরোয়াভাবে গ্রামের গরীবপ্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্যে হঠাৎ-গজিয়ে ওঠা জমিদার গোষ্ঠীর তীব্র অর্থলালসা বিষাক্ত আর ক্ষুধার্ত সাপের মত এঁকে বেঁকে দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।'

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জাতে আলাদা। ধ্বংসের দিক থেকে আরও ক্ষুরধার। জমিদারদের খাজনার পরিমাণ তিনি চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিলেন। ফলে প্রজার মঙ্গল কি চাষ আবাদের উন্নতি এর কোনটার জন্যেই আর জমিদারের দায়িত্ব নেই। দরকারমত প্রজা উচ্ছেদ করো, খাজনা বাড়াও, পত্তনিদার-দরপত্তনিদার-গাঁতিদার এমনি সব মধ্যস্বত্বভোগীদের ভোগলালসাকে অর্থামৃতে তুষ্ট করো, চাষীরা খাজনা না দেয় ঘর পোড়াও, বেয়াদবি করে

পিতৃপুরুষের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করো, পোষা লাঠিয়াল দিয়ে মাথা ফাটাও, প্রজাদের সুন্দরী যুবতী ডাগর বৌ-ঝিকে পেলে জমিদারবাবুর খাস-কামরায় নিয়ে এসো আর কলকাতায় বসে বুলবুলি ওড়াও, হাফ-আখড়াইয়ের আসর জাঁকাও অন্দরমহলে, শখের যাত্রাপার্টির হল্লায় পাড়া বেপাড়ার কান কালা হয়ে যাক, মদের আমোদ, আমোদের মেয়েমানুষ আর মেয়েমানুষের মন—এই নিয়ে মেতে থাকো সারা জীবন। আর সব মিথ্যে, সব ভুয়ো।

কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক অদৃশ্য অক্ষরে সমস্ত দেশটার ওপরে এমনি একটা ইস্তাহার এঁটে দিলে যেন।

গ্রামের বিত্তবানরা দিনের পর দিন শহরের বুর্জোয়া হযে দাঁড়াচ্ছেন। আর গ্রামের চাষীরা হচ্ছে ক্ষেত মজুর, প্রজারা পথের ভিখিরি।

লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন বাড়ল। এর ফলে অবৈধ উপার্জনের পথ কিছুটা রুদ্ধ হল। শাসনকাজের সুবিধের জন্যে তিনি সমস্ত প্রদেশকে অনেকগুলো জেলায় টুকরো টুকরো করে ভেঙে প্রত্যেক জেলাতেই একটা করে বিচারালয় আর বিচারকের হাতেই ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা আর পুলিস বিভাগের পরিচালনভার তুলে দিলেন। কালেক্টরদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল বিচারের অধিকার। দেওয়ানি আর ফৌজদারী মোকর্দমার জন্যে আলাদা আলাদা বিচারালয় তৈরি হল। বিচারের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে এগোয়, তার জন্যে দেওয়ানী আদালতে একজন করে হিন্দু পণ্ডিত আর একজন মুসলমান কাজী নিযুক্ত থাকতো।

কর্নওয়ালিসের আমলে কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য আর শহরের জৌলুস উপচে পড়ছে। বীরভূম থেকে পাথর এনে রাস্তা-ঘাট পাকা করা হচ্ছে। শহরে গাড়ি ঘোড়ার চল বেড়েছে আগের চেয়ে অনেক। শাস্তির ভয়ে চুরি ডাকাতির দাপট কমেছে অনেক। শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেন তৈরি হয়েছে। গঙ্গার ধার ধরে যেদিকে এগোনো যায় সেদিকেই ঘাট আর ঘাট। স্নানের সুবিধে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাল ওঠানো-নামানোরও সুবিধে। প্রত্যেকটি ঘাটের সঙ্গে কলকাতা শহরের সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তি আর উন্নত পাড়ার নাম জড়িয়ে আছে।

বনমালী সরকারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'কলকাতার বাল্যলীলায়'। কোম্পানীর আমলে তাঁর জীবন সামান্য অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে উন্নতির অনেক উঁচুতে উঠেছিল—তাঁর নামাঙ্কিত বনমালী সরকারের

ঘাট—যেন তাঁর জীবনেরই একটি প্রতীক।

শোভারাম বসাকের ঘাট তাঁর নিজের ব্যবসার এবং স্নানের আরামের জন্যে তৈরি হয়েছিল। আর তারই পাশে রথতলা ঘাট। নন্দরাম সেনের তৈরি কদমতলা ঘাটের নামটা এসেছে ঘাটের ওপরেই একটা কদম গাছ ছিল বলে। যার ফুলের গন্ধ বাতাসকে মাতিয়ে রাখতো সব সময়ে আর ভাগিরথীর বাঁকা জলের ভেতরে ছায়া হয়ে নাইতে নামতো দুপুরের উজ্জ্বল রোদে।

কলকাতায় গঙ্গার জল বিক্রি করা পয়সায় বড়লোক হয়েছিলেন বৈষ্ণব দাস শেঠের পিতা। শিলমোহর করে দেশ বিদেশে চালান যেত ঐ জল। বৈষ্ণব দাসও একজন ক্রোড়পতি। কোম্পানীর মহা খাতিরের লোক। বৈষ্ণব দাসের ঘাট তাঁর কীর্তিময় জীবনের একটি স্মরণ-চিহ্ন। 'মদন দত্তের ঘাট' কিন্তু তা নয়। অন্তত যতদিন 'হেদুয়া পুষ্করিণী' অর্থাৎ আজকের আজাদ হিন্দ্ বাগ্ রয়েছে। কলকাতার জলকষ্টের দুঃখ নিবারণের জন্যে এটি তৈরি করেছিলেন তিনি। বাপের পরেই ছেলের ঘাট। 'টুনুবাবুর ঘাট'। টুনুবাবু মানে রামতনুবাবু। তাঁর মত সৌখিন বাবু যেন ভূ-ভারতে কেউ নেই। সোনার থালায় ভাত, রূপোর বাটিতে তরকারী ছাড়া খাওয়া হয় না তাঁর। পাছে কোমরে দাগ লাগে সেই জন্যে তিনি ঢাকাই ধুতির পাড় ছিঁড়ে পরতেন। গাজীপুরের গোলাপ জল আর আতর না ছড়ালে তিনি ঘরের মেঝেয় পা ফেলতেন না। আর ঘর ভর্তি ঝাড়-লণ্ঠনের আলো।

'আহিরীটোলায় ঘাট' নাম হয়েছে আহীরদের নাম থেকে। আহীর অর্থাৎ গোয়ালা। এই ঘাটের ওপরে তারা বাস করতো। 'জোড়াবাগান ঘাট' নামটা কিছুটা বিচিত্র। পলাশী যুদ্ধের আগে এই জোড়াবাগান থেকে একটা সিধে রাস্তা পুবদিকে কিছুটা গিয়ে দু-ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটা গোবিন্দ মিত্রের প্রতিষ্ঠা করা নন্দন বাগানের দিকে। আরেকটা হালসী বাগানের দিকে। এই ঘাটটা যে কার তৈরি তা জানবার উপায় নেই। কেউ কেউ মনে করেন যে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রীর দেওয়ান ও বাংলাভাষার শিক্ষক রামলোচন ঘোষই—এই ঘাটের স্রষ্টা। রামলোচন ঘোষই প্রথম ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইনি।

এ ছাড়াও অসংখ্য ঘাট আছে, যাদের বিস্তৃত ছেড়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গেলেও মহাভারতের একটি পর্ব হয়ে দাঁড়াবে। 'কাঁচা গদী ঘাট'কে বাদ দিয়ে 'নয়ান মল্লিকের ঘাট', কি 'নিউ-হোয়ার্ফ ঘাট'কে বাতিল করে 'অন্নপূর্ণার

ঘাট' যার আরেক নাম 'ওল্ড্ পাউডার মিল ঘাট', এইভাবে এগোলেও আবার পাঠকদের সব কৌতূহল মিটবে না। কথায় কথা বেড়ে চলারও ভয় আছে। তখন প্রশ্ন উঠবে—'চিৎপুর ব্রীজ ঘাট'-এর নাম 'পারসী সাহেবের ঘাট' হল কেন? পারসী সাহেব কে?

আমাদের অত সাত-সতেরোয় গিয়ে কাজ নেই। এমন কি কাশী মিত্রের ঘাট সম্পর্কেও আমাদের জানার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু জীবিতাবস্থায় কেউ কোনদিনই আমাদের তার ভেতরে ঢুকবার অনুমতি দেবে না। ঘাট নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটির পর আবার সেই কর্নওয়ালিসের কথায় ফিরতে হবে।

কর্নওয়ালিসের আমলে এদেশের লোকজন বিশ্বাস করতো যে ইংরেজি ডাক্তার দেখলে বা ইংরেজি ওষুধ খেলে জাত যায়। সংস্কারের ভূত তাদের মনকে-বিশ্বাসকে ঐ ভাবে ভয় দেখাতো। কর্নওয়ালিস কলকাতায় বাঙালী হিন্দু মুসলমানের জন্যে তিন হাজার টাকার চাঁদা দিয়ে একটা হাঁসপাতাল তৈরির প্রস্তাব করলেন। ১৭৯৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আরও ২০ বছরের মেয়াদের এক নতুন সনদ পেল। ভারতবর্ষে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার আগের মতই রয়ে গেল।

১৭৯৩ সালেই লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতবর্ষ ত্যাগ করে স্বদেশে পাড়ি দিলেন। নতুন গভর্নর জেনারেল হলেন স্যার জন শোর। তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্ব কাল (১৭৯৩-১৭৯৮) ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের ইতিহাসে খুব একটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

কর্নওয়ালিসের প্রস্তাবিত হাঁসপাতাল স্যার জন শোরের সময়েই ১৭৯৩ সালে ফৌজদারী বালাখানায় খোলা হল। গভর্নমেণ্ট সাহায্য করতো মাসিক ৬০০ টাকা। কলকাতার জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা উঠল ৫৪ হাজার টাকা। ১৭৯৬ সালে ঐ হাঁসপাতাল ধর্মতলায় সরিয়ে আনা হয়।

১৭৯৫ সালের ১লা জুন ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স নামে এক বীমা কোম্পানী খোলা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৭৮৬ সালের ৮ই জুন কলকাতায় জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে একটা ব্যাঙ্ক খোলা হয়।

১৭৯৪ সালের ১লা মে বিচারপতি স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ মারা যান। তাঁর শবযাত্রায় প্রবল ভিড় জমেছিল। সুপ্রীম কোর্টের সমস্ত বিচারপতি ব্যারিস্টার, অ্যাটর্নী, উচ্চ কর্মচারীবৃন্দ থেকে শুরু করে কলকাতায় সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ মানুষ বিলেতী ফৌজ-বাজনার সঙ্গে ঐ শবযাত্রায় হেঁটে

গিয়েছেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে তোপধ্বনি তীব্র আর্তনাদের মত গর্জে উঠেছে প্রতি মিনিটে মিনিটে। তাঁর যত বয়স কামান দাগা হয়েছিল ততবার। কলকাতার সভ্যজাগ্রত শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল সত্যিই।

স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্‌ ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের জজ আর বাংলায় বা কলকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। সুধীজন সমাজে তিনিই প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রথম প্রদর্শক। সংস্কৃত আর আরবী ভাষায় আর আইনশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান গভীর। লর্ড কর্নওয়ালিসকে তিনিই আইন-গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে এই গ্রন্থ তৈরির যাবতীয় ব্যয়ভার রাজকোষ থেকে দেওয়ার স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান আইনসার সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন বাংলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তাঁর মাইনে ছিল মাসিক ৩০০ টাকা। জোন্‌স্‌ নিজে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজিতে। আর জোন্‌সের অনুরোধেই মিথিলার আইনজ্ঞ সর্বরী ত্রিবেদী সংকলিত 'বিবাদ-সারার্ণব' আর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংকলিত 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' কোলব্রুক সাহেব ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন তিনি নিজেই।

আর ১৭৯৭ সালের ২২শে নভেম্বর মারা যান আরেকজন স্বনামধন্য বাঙালী। তিনি রাজা নবকৃষ্ণ। তাঁর আগে আগে গেছেন অন্যান্য সম্ভ্রান্ত এবং ইংরেজ কোম্পানীর সহৃদয় বান্ধবগোষ্ঠী। ১৭৮৮ সালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ঐ বছরেই কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু।

স্যার জন শোরের আমলে কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাচ গান, আহার বিহার আর বিলাসের সাগরে বান ডেকে উঠল।

১৭৯৮ সালে শুরু হল লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকর্তৃত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীকে বিদায় দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাত এসে আলো ছড়াল শহর কলকাতার সৌধমালার ভেতরে বাইরে। ব্যবসায়ীদের কলকাতায় শুরু হল শিক্ষা আর সভ্যতার নব-জাগরণ। স্যার জন শোরের আমলে মিশনারীরা এদেশে এল বটে কিন্তু ঠাঁই পেল কলকাতায় নয়, শ্রীরামপুরে। সেই শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই কলকাতার বাইরে থেকে কলকাতার কিংবা সারা বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিল তৃষ্ণা, আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা ও সৃষ্টির আবেগ।

সংস্কারে ভরা বাংলাদেশে জন্ম নিল প্রবল সংস্কারকের দল। শেওলা পড়া কূপমণ্ডুকতার পাথর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল পাশ্চাত্যের নতুন ভাববন্যায়। কাপুরুষের দেশে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটতে লাগল বারবার। বিদেশী শাসনের মারণমন্ত্র, তাদের তৈরি যন্ত্রযুগ, তাদের তৈরি বন্ধন—ভারতবর্ষে, বাংলায়, কলকাতায় কালের নিয়মে সৃষ্টি করল এক মুক্তির, নবজাগৃতির আন্দোলন। ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত লর্ড কর্নওয়ালিস, ১৮০৫ থেকে ১৮০৭ জর্জ বার্লো, ১৮০৭—'১৩ পর্যন্ত লর্ড মিণ্টো, ১৮১৩ থেকে—'২৩ পর্যন্ত লর্ড হেস্টিংস, তারপর আমহার্স্ট, তারপর বেন্টিঙ্ক, তারপর চালর্স মেটকাফ, লর্ড অকল্যাণ্ড এমনি করে একজনের পর একজন শাসনকর্তা ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বিদেশ থেকে এসেছেন, গেছেন। লর্ড কর্নওয়ালিস তাঞ্জোর আর সুরাট অধিকার করেছেন। লর্ড মিণ্টো শিখ অভ্যুত্থান দমন করলেন। এমনি ধারা যে রাজত্ব বিস্তারের ইতিহাস, সে ইতিহাসের সঙ্গে শহর কলকাতার যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাত থেকে শহর কলকাতার প্রাণপ্রবাহ চলা শুরু করল অন্য এক ইতিহাস সৃষ্টির সমুদ্র-পথে। কলকাতার পদপ্রান্তে এক উজ্জ্বল ভাগিরথী। আর এক উজ্জ্বল ভাগিরথীর স্রোত কলকাতার হৃৎপিণ্ডে, তার শিরা-উপশিরায়।

১৮০০ সাল থেকে কলকাতার যে বৈদেশিক শাসনের ইতিহাস—তার তাৎপর্য শুধু যুদ্ধজয়, শুধু রাজত্ব-বিস্তার, শুধু ধনিক শ্রেণীর বিকাশ, শুধু যন্ত্রযুগের অভ্যুদয় নয়, তারও চেয়ে বড়।

বাংলাদেশের গ্রাম, বাংলাদেশের গ্রাম-শিল্প, গ্রাম্য-সমাজ, গ্রাম্য রীতি-নীতি, বাংলাদেশের পুরনো ভাবাদর্শ, পুরনো জীবনধারা সব ভাঙছে, পোড়ো বাড়ির মত। যা থাকছে তা জীর্ণ পালিশ, ফাঁপা দেওয়ালের গায়ে চটা ওঠা নক্শা, সুরকী-খসা হেলানো থাম, বিকট ব্যঙ্গের মত দাঁত-বেরুনো গবাক্ষ, কংকালের চোখহীন চাউনির মত ভাঙা সিংহদ্বারের গা-ভরা অন্ধকার। তার বদলে গড়া হচ্ছে, গড়ে উঠছে কলকাতা। মুদ্রাযন্ত্রের কলকাতা। সংবাদপত্রের কলকাতা। পাবলিক লাইব্রেরীর কলকাতা। সভা-সমিতির কলকাতা।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে যার গদ্য সাহিত্যের শৈশব শুরু, মার্শম্যানের উৎসাহ থেকে যার সংবাদ-সাহিত্যের পাদচারণ পর্ব, লেবেদেফের নাট্য-আন্দোলনের প্রচেষ্টা থেকে যার মুখে ফুটেছে কথার কলরব—এবার কলকাতার সেই

নবজন্মের ইতিহাস শুরু হচ্ছে।

কিপলিঙ কলকাতার জন্মবৃত্তান্ত লিখেছিলেন নীচের কবিতায় :

Thus from the midday halt of Charnock
Grew a city,
As the fungus sprouts chaotic from its
bed.
So it spread.
Chance-directed, chance-erected, laid and
built.
On the silt,
Palace, byre, hovel, poverty and pride
Side by side.

আর বিদ্রূপচ্ছলে ব্যঙ্গের বিকৃত ভাষায় কলকাতার রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে একজন 'উদ্ভট কবিতাকার' এই নবজাগরণের কলকাতার স্তব রচনা করেছিলেন—হিন্দুদের প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদের নামে যে শ্লোক আছে—তারই নকল করে।

হেয়ার কম্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥

কবিতাকার কোনদিনও জানতে পারলেন না যে তাঁর এই ব্যঙ্গ-স্তুতি কখন যে সত্যি সত্যিই ব্যাজ স্তুতি হয়ে গেছে।

কলকাতা ইংরেজদের তৈরি অর্থনৈতিক কর্মকেন্দ্র। শহর কলকাতা ক্রমশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে মহানগর। সমগ্র ভারতের রাজধানী। কলকাতার সার্থক হতে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের স্বপ্ন।

তারা জানতো—"The truth is that it is far easier to pitch a camp and erect a palace, which under the native dynasties was synonymous with founding a capital, than it is to create a centre of trade." ইংরেজের গর্ব সেইখানেই।

বিশাল ঐশ্বর্যশালী ভারতবর্ষে আগে যে-সব শাসকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল, ইংরেজরা তাদের মত ভারতবর্ষে আসেনি। তারা এসেছিল কি রকম?

". . . not as temple-builders like the Hindus, not as palace

and tomb builders like the Musalmans, not as fort builders like the Marahattas, not as church-builders like the Portuguese, but in the more comman-place capacity of town-builders, as a nation that had the talent for selecting sites on which great commercial cities would grow up, and who have in this way created a new industrial life for the Indian people."

ইংরেজ ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম দিল। বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় তৈরি করল নবযুগ। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্মের ফলে এল শিল্প বাণিজ্য, শ্রেণী বিভাগ, মূলধন আর ধনহীনতার দ্বন্দ্ব। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম দেওয়া নবযুগের ফলে এল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অভ্যুদয়। অভ্যুদয় আর আন্দোলন। শাসকের সঙ্গে শাসিতের বিরোধ। আর এই দ্বন্দ্ব-বিরোধের মাঝখানে কলকাতা। অস্থির, চঞ্চল, প্রাণবন্ত কলকাতা।

সেকালের প্রশংসায় যার নাম হয়েছিল 'City of Palaces'—সেই কলকাতা। যাকে আমরা বলবো—'City of Renaissance'—সেই কলকাতা।
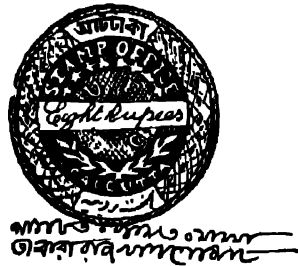
॥ নবজাগরণের প্রাতঃকাল ॥

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাস শুরু হল সত্যিকারের সেই দিন থেকে, ১৭৭৮ সালে যেদিন বাংলাদেশে হুগলীতে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক যুগের অভ্যুদয়ের বছর হিসেবে আমরা অভ্যর্থনা জানাবো ঐ সালটিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূর্য ডুবল। এল উনবিংশ শতকের আলোক-দীপ্ত প্রহরমালা। এরই মাঝখানে বিস্তীর্ণ সময় জুড়ে যে সাহিত্য-চিন্তা যে সাহিত্য-চর্চার উদ্বোধন—তাকে প্রধানত: গদ্য সাহিত্যের জাগরণ বললে ভুল বলা হয় না। গদ্য সাহিত্যের সমৃদ্ধি থেকেই নাটক, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক শাখা-প্রশাখার উন্মেষ। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে এই নবজাগরণের আদি স্রষ্টা যাঁরা—তাঁরা কেউ সাহিত্যিক নন, ধর্ম-প্রচারক। বাঙালী নন, ইংরেজ।

হলহেড আর উইলকিন্‌সের কথা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ১৭৭৮ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ বছরটি পর্যন্ত এই ২১টি বছরের ইতিহাস বাংলাভাষা আবিষ্কারের প্রাথমিক প্রচেষ্টার ইতিহাস। অনুবাদ, অভিধান রচনা আর ব্যাকরণ প্রনয়ণের বৈচিত্র্যহীন উদ্যোগ পর্ব। এই উদ্যোগ পর্বের পেছনে ৬ জন

বিদেশী কর্মী আর ১ জন বাঙালীর অধ্যবসায়, অমানুষিক পরিশ্রম, চিরকাল আমাদের পরম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

একজন বাঙালীর নাম রামরাম বসু। বাঙালীর লেখা প্রথম মৌলিক গদ্য সাহিত্য 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' তাঁরই লেখা। ব্যাপটিস্ট মিশনারী জন টমাসের মুন্‌শীগিরি থেকেই তাঁর জীবনে সাহিত্য পাঠ এবং সাহিত্য চিন্তা বড় রকমের ঠাঁই করে নিল। ১৭৯৩ সালে জন টমাসের সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে এলেন উইলিয়ম কেরী। রামরাম বসু হলেন কেরীর মুন্‌শী। ২০ টাকা মাসিক বেতন। ১৭৯৪ সালে কেরী মালদার মদনবাটির নীলকুঠিতে চাকরি পেলেন। রামরাম বসুও তাঁর সহযাত্রী হলেন। কেরী তখন বাইবেলের বঙ্গানুবাদে হাত দিয়েছেন।

ধর্ম প্রচারের জন্যে বাংলা সাহিত্য। ১৮০০ সালের জানুআরি মাস থেকে শ্রীরামপুরের একদল ধর্ম-প্রচারক খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। মদনবাটি থেকে কেরী এসে যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। কেরী নিয়োগ করলেন রামরাম বসুকে। ওয়ার্ড, মার্শম্যান, ফাউন্টেন এঁদের উদ্যম অসীম। মুদ্রাযন্ত্র এনে বসানো হয়েছে মিশনারী সোসাইটির ঘরে। এখন চাই শুধু লেখা। ছোট ছোট পুস্তিকা তৈরি করে বিলি করতে হবে জনসাধারণের মধ্যে। কেরীর অনুরোধে অ-খ্রীষ্টান রামরাম বসুও খ্রীষ্ট-স্তব রচনায় হাত লাগালেন। লিখে ফেললেন পর পর দুখানি কবিতার বই। একটা 'হরকরা'। আরেকটা 'জ্ঞানোদয়'। পাদরি ওয়ার্ডের অনুরোধে 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং' নামে একটা খ্রীষ্ট-জীবনীও লিখে ফেললেন কবিতার ছন্দে।

১৮০০ সালের শেষদিকে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তৈরি হল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই সঙ্গে রামরাম বসুর জীবনেও এল যুগান্তরের পর্ব। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ম হল সিভিলিয়ান তৈরির প্রয়োজনে। কাজের জগতে প্রবেশ করার আগে তারা যাতে দেশীয় ভাষায় পারদর্শী হতে পারে—লর্ড ওয়েলেসলীর উদ্যমের পিছনে সেইটেই বড় কারণ। কেরী হলেন এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ। রামরাম বসু হলেন ১০ টাকা বেতনের পণ্ডিত।

কলেজ তো হল। কিন্তু বাংলাভাষায় বই কই? কি পড়ে ভাষা শিখবে সুতরাং বই লেখাও, বই লেখাও—সাড়া পড়ে গেল কর্তৃপক্ষ মহলে। কেরী নিজে লিখতে বসলেন বাংলা ব্যাকরণ। রামরাম বসুকে লিখতে দিলেন একটা

গদ্য-গ্রন্থ। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'ই সেই গদ্য-গ্রন্থ। সিভিলিয়ান তৈরির প্রয়োজনে বাংলা বইয়ের জন্ম দিতে গিয়ে রামরাম বসু মৌলিক গদ্য-গ্রন্থের জনক হয়ে গেলেন। ১৮০১ সালের জুলাই মাসে তা ছাপা হল শ্রীরামপুরের মিশনারী প্রেসে। ১৮০২ সালে রামরাম বসুর আরেকটা বই প্রকাশিত হয়েছিল —'লিপিমালা'।

এবার সেই ৬ জন বৈদেশিক কর্মীর প্রসঙ্গ।

প্রথম নাথানিয়েল ব্রাসি হলহেড। আগেই এঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়—জোনাথান ডানকান। ১৭৮৫ সালে ইনি বাংলা ভাষায় 'ইম্পে কোড'-এর অনুবাদ করেন। বাংলা অক্ষরে ছাপানো সম্পূর্ণ একটি গদ্য-গ্রন্থ বলতে বাংলাভাষায় এইটি প্রথম। 'ইম্পে কোড' হচ্ছে—মহারাজা নন্দকুমারের বিচারকালে প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে কর্তৃক সংগৃহীত আইনাবলী।

তৃতীয়—এন, বি, এডমনস্টোন। তিনি ছিলেন গভর্নমেণ্টের ফারসী অনুবাদক।

চতুর্থ—হেনরী পিট্স ফরস্টার। বাংলাভাষা আর সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাভাষা তাঁরই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় যেন কিছু মর্যাদা পেয়েছিল। 'কর্নওয়ালিস কোড'-এর অনুবাদক তিনিই। ১৭৯৯ সালে A Vocabulary in two parts, English and Bengalee and Viceversa বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৮০২ সালে দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চম—এ, আপজন। ১৭৭৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালী বোকেবিলরি'।

ষষ্ঠ—জন মিলার। ১৭৯৭ সালে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হল। নাম 'শিক্ষ্যা-গুরু'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা-পর্ব এইখানেই শেষ। এইবার উনবিংশ শতাব্দীর অভিযান। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাস আর উইলিয়ম কেরীর জীবন চরিতের মাঝখান দিয়ে বাংলাসাহিত্যে নতুন দিগন্তের আবির্ভাব। ১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলী ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হয়ে কলকাতায় এলেন। রাজ্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয়ে প্রথমেই তাঁর নজর পড়ল। সেটি সিভিলিয়ানদের শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সে স্বদেশের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তারা এদেশে চাকরির প্রয়োজনে আসে। এদেশের

আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষাতেও তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে। আর শিক্ষার অভাবেই এই সব অপরিণত যুবকেরা বিলাস-বৈভবের মোহে শাসনকাজের ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে কদর্য কুশ্রীতার আবর্তে পাক্ খায়। সুতরাং এদের হিন্দুস্থানী ভাষায় নিয়মিত শিক্ষা দিতে না পারলে ইংরেজ-রাজত্বের ভিত কোনদিনই ভারতবর্ষে মজবুত হবে না। শিক্ষাই যদি দিতে হয় তো হিন্দুস্থানীতে কেন ?

তার কারণ আছে। ল্যাংওয়েজ বলতে তখন তিনটে ভাষাকে বোঝাত। ফারসী, হিন্দুস্থানী আর বাংলা। বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত এমন ইংরেজ তখন বাংলাদেশে বিরল। হিন্দুস্থানী ভাষায় পণ্ডিত আছেন একজন। তিনি গিলক্রাইস্ট। তাঁর নিজের তৈরি একটা স্কুলও ছিল কলকাতায়। ১৭৯৯ সালে ওয়েলেসলী আদেশ জারী করলেন যে, জুনিয়ার সিভিল সার্ভেন্টদের গিলক্রাইস্টের স্কুলে নিয়মিতভাবে হিন্দুস্থানীর পাঠ নিতে হবে। এই আদেশ জারীর চার দিন পরেই তাঁকে টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হল দক্ষিণ ভারতে। ৪ঠা মে তারিখে তিনি বিজয়গর্বে ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় ফিরেই তিনি রিপোর্ট পেলেন যে গিলক্রাইস্টের ছাত্রেরা শিক্ষার দিক থেকে দ্রুত উন্নতি করছে। ওয়েলেসলীর উৎসাহ আর পরিকল্পনা দুইই একসঙ্গে জেগে উঠল এইবার। তিনি প্রস্তাব করলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার। কাউন্সিলাররাও তাঁর প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাল প্রবলভাবে। ১৭৯৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয় করেছিলেন। সেই গৌরবের তিথিকেই তিনি গেঁথে দিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের সঙ্গে। ১৮০০ সালের ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবস ঘোষণা করা হল।

কলেজ গৃহ হল রাইটার্স বিল্ডিং-এ। ছাত্রদের থাকার জন্যে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল গোটা ছয়েক।

আর ১৮০১ সালের ৪ঠা মে শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় এলেন ফোর্ট উইলিয়মের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক হয়ে উইলিয়ম কেরী। তাঁর সহকারী হলেন আরও কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত।

উইলিয়ম কেরী—শিক্ষক—	মাসিক	৫০০৲
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার—প্রধান পণ্ডিত—	„	২০০৲
রামনাথ বাচস্পতি—দ্বিতীয় পণ্ডিত—	„	১০০৲

সহকারী পণ্ডিতবর্গ—শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন আর রামরাম বসু। এঁদের প্রত্যেকেরই বেতন—৪০৲। মিশনারী যুগে কেরী ছিলেন অন্যান্যদের মত হিন্দুধর্মদ্বেষী। হিন্দুধর্মের অসারতার কথা তিনি প্রচারও করতেন নানা জায়গায়। ১৮০৭ সালে তাঁকে ১০০০৲ টাকা মাইনেয় বাংলা আর সংস্কৃত অধ্যাপক আর মারাঠী ভাষার শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হল। এতদিনে তিনি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের আরও গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন। ফলে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ওয়েলেসলীকে জানালেন—

"বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে।......আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এদেশের রীতিনীতি, আচার, ব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।"

১৮২৫ সালে এক পত্রে লিখলেন "......my heart is wedded to India ; and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I can......"

বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে কেরীর নাম অবিচ্ছিন্নভাবে গাঁথা। আরবী-ফারসীর আক্রমণ একদিকে। অন্যদিকে সংস্কৃত জননীর বিমাতার মত হিংসুক আধিপত্য। বাংলাভাষার কোনদিকেই পালিয়ে বাঁচার উপায় নেই। বেঁচে আছে কিন্তু সে কেবল অশালীন অশ্লীল উচ্চারণের প্রয়োজনে—জনসাধারণের দৈনন্দিন কাকলী নয়, কলহের মাঝখানে। ঠিক এই মুমূর্ষু মুহূর্তে কেরী বাংলাভাষাকে একই সঙ্গে ভদ্রজনের ভাষা, ভাবপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ ভাষা, সাংসারিক ব্যবহারিক সব প্রয়োজনেরই পরিপূরক হিসাবে প্রমাণ করলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থগুলির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

১৮০০ সালে অগস্ট মাসে জন টমাস, রামরাম বসু আর উইলিয়াম কেরী সমবেত ভাবে 'মঙ্গলসমাচার মতীয়ের রচিত' অনুবাদ করেন। এই ধরনের ধর্মসংক্রান্ত আরও অনেক পুস্তিকা তিনি লিখেছিলেন—এখানে তার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে যা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে শুধু মাত্র তারই বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বেরুল বাংলা ব্যাকরণ।

১৮০১ সালে কথোপকথন। তারিখের হিসেবে এই বইটি প্রথম বাংলা মৌলিক

গদ্য-গ্রন্থ—'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র চেয়ে মাত্র এক মাসের কনিষ্ঠ। এই বইয়ে চাকর ভাড়া করন, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুন্সী, পরামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা, মহাজন আসামী, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্রলোক ভদ্রলোক, প্রাচীন প্রাচীন, শুপারিস, মজুরের কথাবার্তা, খাতক মহাজনি, স্ত্রীলোকের হাটকরা, মাইয়া কোন্দল—এমনি ৩১টি অধ্যায় আছে। এই বইটির যাবতীয় রচনাই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে সংগ্রহ করা। বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গির ফলে ভাষার যে বৈচিত্র্য ঘটে থাকে—এই বইটিতে তারই উজ্জ্বল রত্নকণাগুলি এক জায়গায় জড়ো করা। টেকচাঁদ ঠাকুর ও হুতোমের ভাষার মধ্যে যে স্বাভাবিক বাস্তবতা—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত এই বইটিই সেই বাস্তবতার পথপ্রদর্শক।

১৮০২ সালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত।

১৮১২ সালে ইতিহাসমালা। ব্যঙ্গপ্রধান ১৫০টি গল্পের সংগ্রহ। আর গল্পগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি সব ভাষা থেকেই। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, ধনপতি-খুল্লনা, রূপগোস্বামী, সনাতন গোস্বামী থেকে আকবরের প্রধানমন্ত্রী বীরবলের কথাও বাদ যায়নি। বইয়ের সবশেষে একটি বিচিত্র গ্রাম্য ছড়া (গদ্যধর্মী) সংগ্রহ করা আছে। ছড়াটির ভাষায় ছন্দে গ্রাম-জীবনের ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।—

"মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা
চিলে নিলে দু-গণ্ডা
বাকী রহিল ষোল
তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল
তবে থাকিল আট
দুইটায় কিনিলাম দুই আঁটি কাঠ
তবে থাকিল ছয়
প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়
তবে থাকিল দুই
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই
তবে থাকিল এক
ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ
এখন হইস যদি মানুষের পো

তবে কাঁটাখানা খাইয়া মাছখানা থো
আমি যেই মেয়ে
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে......।"

১৮১৫-২৫। বাংলা ইংরেজি অভিধান। কেরীর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ হয়। ১৮১৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৮২৫ সালে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ সাল একটি স্মরণীয় বছর। বাংলা সাময়িক পত্রের আবির্ভাব একদিকে, শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তিস্থাপন অন্যদিকে। কেরীর একটা জীবন ধর্মপ্রচারকের। আরেক জীবন অধ্যাপকের। একদিকে তিনি সাহিত্যের উৎসাহদাতা, অন্যদিকে সংগ্রহকর্তা। অনুবাদে তিনি যতটা সক্ষম, নিজস্ব ভাষার ওপরও তাঁর তেমনি দক্ষতা। এই অসীম ক্ষমতাকে তিনি যেন খণ্ডখণ্ড ভাবে প্রকাশ করেছেন নানা কাণ্ডে, নানা শিকড়ে, শাখাপ্রশাখায়, ফুলে আর ফলে। কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে কেরী একজন। এবং অনন্য। তিনি বাংলা সাহিত্য-সাধনার পুরোহিত।

এর পরেই আসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কথা। কেরীর অনুরোধে তাঁরা যে সব পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন সেগুলিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রভাতের স্বর্ণচ্ছটা। নীচে তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

১। রামরাম বসু—রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র। ১৮০১॥ লিপিমালা। ১৮০২॥

২। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। বাংলাগদ্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী। রামকমল সেনের ভাষায় পণ্ডিত সমাজে তিনি 'the most eminent.' মার্শম্যানের প্রশংসায় তিনি 'Colossus of Literature., কলকাতার হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। ১৮১৭ সালে কলকাতায় স্কুল বুক সোসাইটি খোলা হল। তিনি তারও সভ্য ছিলেন। আবার অন্য দিকে তিনি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের জজ পণ্ডিত। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে চারখানি স্মরণীয়। বত্রিশ সিংহাসন। ১৮০২॥ হিতোপদেশ। ১৮০৮॥ রাজাবলি। ১৮০৮॥ প্রবোধচন্দ্রিকা। ১৮৩৩॥

৩। গোলকনাথ শর্মা। হিতোপদেশ। ১৮০২॥

৪। তারিণীচরণ মিত্র। ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট। ১৮০৩॥

৫। চণ্ডীচরণ মুন্শী। তোতা ইতিহাস। ১৮০৫।

৬। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং। ১৮০৫॥

৭। রামকিশোর তর্কচূড়ামণি। ১৮০৮॥

৮। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। ইংরেজি-বাংলা শব্দকোষ। ১৮১০॥ ইংরেজি-ওড়িয়া অভিধান। ১৮১১

৯। হরপ্রসাদ রায়। পুরুষ পরীক্ষা। ১৮১৫॥

১০। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন। পদার্থকৌমুদী। ১৮২১॥

উইলিয়ম কেরীর প্রসঙ্গে অনেক কীর্তির কথা বলা হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু তাঁর এই কৃতিত্বের পিছনে যে বন্ধু এবং সহযোগী সাহিত্যামোদীর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল সব সময়েই—সেই জোশুয়া মার্শম্যান প্রসঙ্গে যেতে হবে এবার।

বাইবেলের তেলেগু অনুবাদ, বাংলা-ইংরেজি অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রভৃতি রচনার সময়ে মার্শম্যান কেরীকে সাহায্য করেছেন সর্বতোভাবে। কনফুশিয়াসের মূলসহ অনুবাদ এবং বাইবেলের একটি চীনা-অনুবাদও তিনি নিজের উৎসাহে করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিকের চেয়ে সাংবাদিক হিসেবেই তাঁর সম্মান। বাংলার নবজাগরণে সংবাদপত্রের যতখানি দাম, সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিস্তারের ইতিহাসে মার্শম্যানের অবদান ততখানিই মূল্যবান। সে আলোচনার প্রারম্ভে বাংলা দেশের সংবাদপত্রের শৈশব যুগের কিছু টীকা প্রয়োজন।

মোগল আমলে সংবাদপত্রের কাজ করতো গুপ্তচরেরা। গুপ্তচরেরা দেশের অভ্যন্তরের সমস্ত খবরাখবর গোপনে সংগ্রহ করে কখনও মাসে একবার, কখনও বা সপ্তাহে সপ্তাহে লিখে পাঠাতো। গোপনীয় রাজকীয় খবরাখবর থাকলে একা বাদশারাই সেটা মনে মনে পড়তেন। নিদেনপক্ষে জানতো কেবল তাঁর মন্ত্রী। কিন্তু তেমন কোন গোপন খবর না থাকলে সেটা রাজ-দরবারে প্রকাশ্য-ভাবেই পড়ে শোনানো হত। আবার বাদশাহের অনুকরণে তাঁর অধীন সেনাপতি, শাসন কর্তা, করদ-রাজারাও বাদশাহের দরবারের ঘটনা, তাঁর রাজনৈতিক মন্তব্য বা চিন্তা-ধারণা—এ ছাড়া রাজধানী আর অন্যান্য প্রদেশের খবরাখবর জানবার জন্যে বাদশাহের দরবারে নিজের নিজের সংবাদ-লেখক রাখতেন। তাদের বলা হত 'ওয়াকেয়া-নবিশ'। আবার তাঁদের নকল করে ফৌজদার থানাদার প্রভৃতি ছোট ছোট রাজকর্মচারীরা তাঁদের প্রভুদের সভায় অর্থাৎ সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দরবারে নিজের নিজের পত্র-লেখক

রাখতেন। এই ভাবে সংবাদ সংগ্রহের যে লিপি দেশে দেশান্তরে, সম্রাট থেকে নিম্নতম কর্মচারীর কানে কানে এসে সমস্ত রাজ্যের গোপন কথাটি শুনিয়ে যেত —সে সময়ে তাকে বলা হত—'আখবার'।

মোগল আমলের সংবাদপত্রের ইতিহাস এইটুকু।

এর পরের ইতিহাস অন্যরকম। ইংরেজ আধিপত্যের আদি যুগে অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পর ইংরেজি সংবাদপত্রের মতই এদেশেও মুদ্রিত সংবাদপত্রের জন্ম। ১৭৮০ সালের ২৯শে নভেম্বর তার জন্মতারিখ। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। সম্পাদক হিকি সাহেব। পত্রিকার নাম 'বেঙ্গল গেজেট'। লোকে বলতো 'হিকির গেজেট'। পত্রিকাটি ছিল কিছুটা রূঢ়ভাষী। কিছুটা অশ্লীল। ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তাঁর স্ত্রী থেকে শুরু করে সে-সময়ের পদস্থ লোকমাত্রেরই নির্মম নির্লজ্জ সমালোচনা প্রকাশিত হত এতে। দু-বছর চলেছিল কাগজটি। তারপর একটার পর একটা মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে এর প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

'হিকির গেজেট' অন্তর্ধান হবার পর 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট', 'হরকরা' এই সব নামে কতকগুলো পত্রিকা পর পর প্রকাশিত হতে লাগল। কিন্তু গভর্নমেণ্ট সেকালে সংবাদপত্রের বাঁকা-চলনকে দেখতে পারতেন না। ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলীর রাজত্বকালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে অনেকখানি সংকুচিত করা হল। গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত না হয়ে কোন রচনা, কোন সংবাদই প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। নিয়মভঙ্গের অপরাধে শাস্তির বিধান ছিল—ইওরোপে নির্বাসন। এমন আশ্চর্য ধরনের শাস্তি আবিষ্কারের কারণটি হল এই যে তখন যা কিছু সংবাদপত্র এদেশে বেরিয়েছে সবই ইংরেজি ভাষায় এবং তার সম্পাদক ইওরোপীয়রাই।

এবার এল সেই যুগ বিবর্তনের গৌরবমাখা ১৮১৮ সাল। লর্ড হেস্টিংস সম্পাদক ও সংবাদপত্রের ওপর থেকে আইনের বজ্র-আঁটুনিকে খুলে 'ফস্কা গেরো' করে দিলেন। আর এই সময় থেকে ইওরোপীয় ছাড়াও দেশীয় পণ্ডিতরাও সংবাদপত্র সম্পাদনায় যোগ দিতে লাগলেন।

এই সব ঘটনাপরম্পরার ফলেই 'সমাচার দর্পণে'র আত্মপ্রকাশ। ছাপা হয় শ্রীরামপুর থেকে। সম্পাদক—জে, সি, মার্শম্যান। পত্রিকার কণ্ঠদেশে একটি সংস্কৃত বচন লেখা থাকতো প্রতি সংখ্যাতেই।—

দর্পণে মুখ সৌন্দর্যমিব কার্য-বিচক্ষণাঃ।
বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্থ দর্পণে ॥

'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকার। ১৮২৪ সালে তিনি সংবাদপত্র ছেড়ে কাব্যের অধ্যাপক হলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে। এর পর তারিণীচরণ শিরোমণি চার বছর সম্পাদনায় সহযোগী ছিলেন মার্শম্যানের। কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার পর এদেশে ইংরেজি শিখবার একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সেই কারণে ১৮২৯ সাল থেকে 'সমাচার দর্পণ'কে দ্বিভাষিক কাগজ করা হল। একই সংখ্যায় বাংলা ও ইংরেজি।

'সমাচার দর্পণে'র পর কলকাতা থেকে বেরুল 'বাঙ্গাল গেজেট'। বাঙালী পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এর প্রকাশক। তিনি ছিলেন শ্রীরামপুর মিশনারী প্রেসের একজন কম্পোজিটার। সংবাদপত্র প্রকাশের আগে তিনি বইয়ের ব্যবসা করতেন। তারপর মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে তিনি কলকাতা থেকে প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সহযোগী ছিলেন হরচন্দ্র রায়। এই পত্রিকার পরমায়ু বেশী দিনের নয়। মাত্র এক বছর।

এর পরই 'সম্বাদ কৌমুদী'—সাপ্তাহিক পত্র। সম্পাদক তারাচাঁদ দত্ত আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পত্রিকার শিরোভাগে লেখা থাকতো—

দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদা শীতলং জগৎ ॥

রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতিরাও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নিয়মিত লিখতেন প্রবন্ধ। এর ফলে ধর্মহানি বা সমাজে মানহানির আশঙ্কা করে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায় এই কাগজ ছেড়ে অন্য এক সাপ্তাহিক 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করলেন। গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের কাগজ।

দিকদর্শন। ছাপার অক্ষরে এইটিই প্রথম মাসিক পত্র। সম্পাদক মার্শম্যান। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত হত। তাঁদের দ্বিতীয় মাসিক পত্র বেরুল—গসপেল ম্যাগাজিন। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব প্রকাশের প্রয়োজনে বাঁদিকে ইংরেজি, ডানদিকে বঙ্গানুবাদ। ১৮১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে প্রথম ছাপা হয়।

ইংরেজি, বাংলা এই দুটি ভাষা ছাড়াও উর্দু ভাষাতেও সংবাদপত্র প্রকাশিত

হত কলকাতা থেকে। সে সময়ে ভারতবর্ষে চলতি কথাবার্তায় উর্দু ভাষার চলন ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৮২২ সালের ২৮শে মার্চ বেরুল 'জাম-ই-জাহান-নুমা'। পাঠক খুব বেশী বাড়ল না দেখে কিছুদিন পরেই উর্দু, ফারসী দুটোকেই মিশিয়ে প্রকাশ করা হল। এতেও খুব বেশী সুবিধে হল না দেখে শেষ পর্যন্ত শুধু ফারসীতেই সংবাদপত্র ছাপা হতে লাগল। কলকাতায় ফারসী ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশ করলেন রাজা রামমোহন রায়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার পর ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত দেওয়ানী আদালতের রায়, নিম্নকর্মচারীদের রিপোর্ট আর রাজনৈতিক পত্রাদি ফারসী ভাষায় লেখা হত। কাজেই ফারসী কাগজ কিনে পড়ার লোক কলকাতায় সংখ্যায় কম ছিল না। রামমোহনের পত্রিকার নাম 'মীরাৎ-উল-আখবার'। অর্থাৎ সংবাদ দর্পণ। ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা—প্রত্যেক শুক্রবারে এর প্রকাশ তারিখ। সাপ্তাহিক কাগজ। এর পর এল ১৮৩৫ সাল। চার্লস মেটকাফ সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, মুক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ১৮২৩ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত যে স্বাধীনতা-বিরোধী আইনের ফাঁসে লটকানো হয়েছিল সাময়িক-পত্রকে—তার থেকে মুক্তি পেল সে। এল মতবাদ প্রকাশের অবারিত অধিকার। ১৮২৩ থেকে ১৮৩৫ সাল এই সময়ে যে সব পত্র পত্রিকা বেরিয়েছে তাদের মধ্যে 'সম্বাদ তিমির' আর 'বঙ্গদূতে'র নামটাই স্মরণীয়। ১৮২৯ সালের ৫ই মে 'মণ্টগোমারী মার্টিন' এই নামে ইংরেজি, বাংলা, ফারসী আর নাগরী এই চারটে ভাষা মিলিয়ে একটা পত্রিকা প্রকাশিত হত, 'বঙ্গদূত' তারই বাংলা সংস্করণ। এই পত্রিকার শিরোনামায় লেখা থাকতো—

"অন্য অন্য দূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে তত্ত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম অন্বেষণে॥
অতএব সাধারণ, সর্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয় হিতকারী এত বঙ্গদূত॥"

এর পরের অধ্যায়ে 'সংবাদ প্রভাকরে'র আবির্ভাব। ১৮৩১ সালের ১১ জানুআরি। প্রথম দেড় বছর বেশ ভালো ভাবেই চলল। ১৮৩২ সালের ২৫শে মে পর্যন্ত বেরিয়েছিল ৬৯নং সংখ্যা। এর পর চার বছর বন্ধ রইল কাগজ। চার বছর পরে ১৮৩৬ সালে ১০ই অগস্টে আবার নতুন করে বেরুল। এবার আর সাপ্তাহিক নয়। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত গুপ্তকবি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালংকার, প্রসন্ন

কুমার ঠাকুর ; রামকমল সেন—এঁরা ছিলেন এই পত্রিকার লেখক। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আর দীনবন্ধু মিত্রের বাল্য রচনাও ভোরের শুকতারার মত ঠাঁই পেয়েছিল প্রভাকরের রৌদ্রদীপ্ত পরিবেশের মাঝখানে। গুপ্তকবি ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' তাঁর পরিচালনার আশ্চর্য নিপুণতায় হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের ভাগ্য-বিধাতা। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সব যে রসময়ী রচনার বিষয় হতে পারে 'সংবাদ প্রভাকরে' তারই সম্ভাবনার পথ আবিষ্কার করলেন তিনি—কখনও শিখ যুদ্ধ, কিংবা পৌষপার্বণ, মিশনারী, উমেদারি এমনি সব আপাত তুচ্ছ ঘটনাবলীর মধ্যে থেকে। মনের নির্জন গৃহকোণ থেকে বিশ্বসংসারের বিরাট কোলাহলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল বাংলা সাহিত্য। ডাহা ইংরেজিআনার প্রতিপত্তির যুগে খাঁটি বাঙালীআনার প্রতিনিধি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে ও বাংলা সাময়িক পত্রে, বাংলাদেশের মাটির গন্ধ, মানুষের কলরবকে মর্যাদা দিয়ে গেলেন।

গুপ্তকবি যেন এক বিপুল, বিরাট সিংহতোরণ। যেন এক উদ্বেল উদ্দাম বর্তমানের প্রতীক সেই সিংহতোরণ। তার একদিকে পুরনো কাল। অন্য এক পারে নবযুগের বিপুল সম্ভাবনা। এই দুই কাল, দুই সামাজিক চেতনার দ্বন্দ্বে তাঁর সংবাদপত্রের পাতা আর কবিতার প্রাণ মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে বার-বার। নিজেকে দীর্ণ করে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছেন নবযুগের চেতনাকে। পুরনো কালের পিছুটানও তাঁকে টেনেছে কখনও কখনও।

এবার আসে সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ। সাহিত্য সংবাদপত্রের পর এখানে বাংলা নাটকের আর বাংলা নাট্যশালার সংক্ষিপ্ত একটু ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন। তারপর শিক্ষা, সভ্যতা, সামাজিকতার আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

বাংলা নাট্যশালার জন্মদাতা বাঙালী নয়। বাংলা নাট্যশালার প্রথম রজনী কোন সংঘবদ্ধ চেতনার তাগিদেও জন্ম নেয়নি। এ একক বিচ্ছিন্ন প্রতিভার ফল।

বাংলা সাহিত্যের রূপান্তরের পিছনে যেমন খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারক একদল মিশনারীর উদ্যম, বাংলা নাট্যশালা স্থাপনের পিছনে তেমনি একজন বৈদেশিক নাট্যানুরাগীর উৎসাহ। তিনি রুশদেশবাসী। নাম গেরাসিম লেবেদেফ। ১৭৯৫ সালের ঘটনা সেটা। ২৫নং ডুমতলায় (এখনকার এজরা স্ট্রীট) তিনি নাট্যশালা তৈরি করেছিলেন।

কলকাতায় এসে লেবেদেফ লক্ষ্য করেছিলেন যে—এদেশের লোকেরা গম্ভীর

উপদেশাবলীর চেয়ে হাসিতামাসা, রসের কথায় মজে বেশী। সেই জন্মেই তিনি চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা এইসব বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে পরিপূর্ণ দুখানি নাটক ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করলেন। নাটক দুখানির নাম 'The Disguise' আর 'Love is the best Doctor'। অনুবাদের পর কলকাতার কয়েকজন বিচক্ষণ পণ্ডিতকে সে নাটক পড়িয়ে শোনালেন। লেবেদেফের বাংলা ভাষাশিক্ষার গুরু ছিলেন গোলকনাথ দাস। তিনি নাটকটি পড়ে জানালেন—যে এ নাটকদুটি যদি জনসাধারণের সামনে অভিনয় করে দেখানো হয় তাহলে তিনি তার জন্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগাড় করে দেবেন। লেবেদেফ সোৎসাহে রাজী হলেন। ইতিমধ্যে তখনকার গভর্নর স্যার জন শোরের কাছ থেকে লাইসেন্সের দরখাস্তও মঞ্জুর হয়ে এল। ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর প্রকাশ্যভাবে বাংলা ভাষায় নাটক অভিনীত হল কলকাতায়। স্থান—কলকাতার কেন্দ্রস্থল। ডোমটোলা। পরের বছর নাটকটি আবার একবার অভিনীত হল। নাটকটি ছিল 'The Disguise'এর অনুবাদ।

কিন্তু লেবেদেফের ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নাট্যশালার পাদ-প্রদীপে ৪০ বছরের মধ্যে আর কোনদিন জ্বলেনি একটি আলোর শিখাও।

বাঙালীর সংস্কৃতির স্রোতধারা তখন আগের মতই চলল যাত্রা, পাঁচালী, কবি, হাফ-আখড়াই-এর ঘাটে ঘাটে অগাধ ফূর্তির ফেনা তুলে। তখন নাটক অভিনয় হত যাত্রার মুখোশ পরে। ১৮২১ সালে 'কলিরাজার যাত্রা' লেখা হয়। অনেকে এই যাত্রাকেই প্রথম বাংলা নাটকের সম্মান দেন। কলিরাজার পরে এল 'নল দময়ন্তী'। তারপরে 'কামরূপ যাত্রা'। এইসব যাত্রার মধ্যে নতুনত্ব, অভিনবত্ব ছিল। এবং নতুন যাত্রার সার্থকরূপ দেখা গেল ১৮৪৯ সালে 'নন্দবিদায় যাত্রা'য়। এতে নারী চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করেছিল। সংবাদ ভাস্কর তাই লিখলে…"এ প্রকার গান সচরাচর শুনা যায় নাই। তাঁহা-দের হাফ-আখড়াইয়ের সুরে পয়ার কাটান বড়ই চমৎকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সর্বোপরি ছিদাম নাম্নী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং চমৎকৃত করিয়াছে, ছিদামের বয়স উর্ধ্ব ১৩ বৎসর,…তার সুরের ন্যায় মিষ্ট সুর আমি আর কখন শ্রবণ করি নাই।"

সংবাদ ভাস্কর আরও লিখলে—"এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এ যাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার।"

নতুন যাত্রার প্রসার ঘটল বটে কিন্তু প্রশংসা পেল না। প্রভাকর পত্রিকা লিখলে, "এতদ্দেশে পুরাকালের নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়-দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ-প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের কদাপি সন্তোষবিধান হয় না।"

সুতরাং নাটক চাই।

নিউ টেস্টামেণ্ট অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ। তেমনি শেক্‌সপীয়র অভিনয় করতে গিয়ে বাংলা নাটক আর নাট্যশালার আত্ম-প্রকাশ।

১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে 'হিন্দু থিয়েটারে'র দ্বারোদ্‌ঘাটন হল। ইংরেজি-শিক্ষিত নবযুবকদের তৈরি 'হিন্দু থিয়েটার'। প্রথম নাটক অভিনীত হল—'জুলিয়াস সিজার'।

অভিনয় হল বটে। কিন্তু দর্শক জমলো না নাটকগুলো ইংরেজি বলে। অতএব নাটক চাই—এবং বাংলা নাটক চাই—এই প্রয়োজন ঘা মারল নাট্যোৎ-সাহীদের মনে।

শ্যামবাজারের ট্রাম ডিপোর সামনে বাবু নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ি। তিনি একটি নাট্যশালা তৈরি করলেন—তাঁর নিজের বাড়িতে। অভিনয় হল—বিদ্যাসুন্দরের নাট্যরূপ। কিন্তু বেশী দিন সেটা চললো না।

এর পরেই 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'।

১৮৫১ সালে বটতলায় 'ডেভিড হেয়ার একাডেমি' স্থাপনের পর ঐ স্কুলের ছাত্রেরা শেক্‌সপীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অভিনয় করলো। সমস্ত শহরে সে কী চাঞ্চল্য। সংবাদপত্রে সুখ্যাতির শেষ নেই। তাই দেখে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছেলেরা একটা দস্তুরমত নাট্যশালা তৈরি করে বসল। নাম 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'। নাটক—'ওথেলো'। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত এই থিয়েটার খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে টিকে থাকলেও কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের অসহ-যোগের ফলেই এই নাট্যশালার গ্রীনরুম ক্রমশ ঘন অন্ধকারে ভরে উঠল। বুলবুলির লড়াই, খেমটা নাচ আর ইতর গোছের তামাসার জেল্লার কাছে নাটকের ঐশ্বর্য সম্মান পেল না।

এবার নবীনচন্দ্র বসুর ভাইপো প্যারীমোহন বসু তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এক নাট্যশালা গড়লেন। সেটা ১৮৫৪ সাল। জুলিয়াস সিজার তার প্রথম

অভিনয়। কিন্তু বাংলা নাটকের অভাবে কিছুই জমে না। লেবেদেফের 'ছদ্মবেশ', নবীন বসুর 'বিদ্যাসুন্দরে'র মত নাটক চাই। নইলে নাট্যশালার প্রদীপ চিরকালই নিভে থাকবে। ১৮৫৭ সালের সঙ্গে সঙ্গে জাগলো এক আশার আলো। নন্দকুমার রায় লিখলেন এক নতুন নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'। আশুতোষ দেবের (সাতুবাবু) বাড়িতে তাঁর দৌহিত্রেরা এই নাটকের আয়োজন করলেন। ৩০শে জানুআরি সরস্বতী পুজোর দিনে নাটকের প্রথম রজনী উদ্‌যাপিত হল। তারপর সেপ্টেম্বর মাসে 'মহাশ্বেতা'।

'সম্বাদ প্রভাকর' লিখলে "...আহা, তরুণবয়স্ক ছাত্রগণ মহাকবি কালিদাস প্রণীত শকুন্তলা নাটকের অনুরূপ প্রদর্শন সময়ে কবিবরের মনোগত ভাব প্রকাশ করাতে আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি, অধুনা অন্যান্য ভদ্রকুলপ্রসূত বিদ্যানুরাগী ছাত্রগণ এই মহাদৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া যদ্যপি সংস্কৃত কবিগণকৃত নাটকের পুনরুদ্ধার করেন তবে পরমোপকার হয়।"

সাতুবাবুর বাড়িতে অভিনয়ের কিছু দিন পরে চড়কডাঙ্গায় (এখনকার টেগোর ক্যাসেল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ির উঠোনে মহাসমারোহে অভিনীত হল 'কুলীন কুলসর্বস্ব।' রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক। ১৮৫৮ সাল নাটকের ধুমধামে জমে উঠল। 'সম্বাদ প্রভাকর'-এর পাতায় 'একজন সভ্যতা পথের পথিক' ছদ্মনামে একটি চিঠির শেষ লাইনে জনৈক পাঠক লিখলেন—

"বঙ্গদেশে আজকাল বড় ধুমধাম্।
যেথা সেথা শুনা যায় অভিনয় নাম ॥
বঙ্গদেশে বঙ্গবিদ্যা হতেছে প্রকাশ।
সকলে উৎসাহ করে এই মম আশ ॥
নাটক লইয়া সবে রঙ্গ রসে থাকো।
কালিদাস হয়ে সবে কালী নাম ডাকো ॥"

এর পরের ইতিহাস নাট্যশালার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। ১৮৫৩ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে এক সাহিত্য সভা গড়লেন। সভার সঙ্গে সঙ্গেই এল নাট্যশালার উদ্যম। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। তারপর বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যমে থিয়েটারে প্রথম দেশীয় ঐক্যতানবাদনের প্রবর্তন হল। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেরা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে যোগ দিলেন। মাইকেল মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' লিখলেন সদ্য মাদ্রাজ থেকে ফিরে।

নাটকের দৃশ্যপটের মত নাট্যশালাও পাল্টায়। এক ওঠে, অন্য জাগে। বেল-গাছিয়া নাট্যশালার পর মেট্রোপলিটান থিয়েটার, পাথুরিয়াঘাট বঙ্গনাট্যালয়, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটারিক্যাল সোসাইটি, জোড়াসাঁকো থিয়েটার, বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় নাট্যশালার ইতিহাসে উজ্জ্বল ধূমকেতুর মত আবির্ভাবের ও বিকাশের উদ্দীপ্ত আলো ছড়িয়েই অকস্মাৎ ম্লান হতে হতে নিভে গেল। মাইকেলের অনেক নাটক এই সময়েই লেখা। এবং এই সময়ের পর থেকেই অ্যামেচার রঙ্গালয়ের বদলে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সূচনাপর্ব। কলকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় তৈরি হল ১৮৭২ সালের ১১ই মে। বাগবাজারের অ্যামেচার থিয়েটার 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' নাম নিয়ে বাংলার নাট্যামোদী সমাজে এক যুগান্তর নিয়ে এল। শ্যামবাজার নাট্যসমাজ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। ন্যাশনাল থিয়েটার থেকেই এই সাধারণ প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হল। বাংলা নাট্যশালার দীপাবলী উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরে উঠল একের পর এক প্রতিভাধর অভিনেতার আবির্ভাবে। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, রাধামাধব কর, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু। প্রতিভাধর নাট্যকারের পদধ্বনিও শোনা গেল দ্রুততালে। দীনবন্ধু মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন, শিশির ঘোষ, অমৃতলাল বসু, মনমোহন ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলার নাট্যা-ন্দোলনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহাকবি গিরীশচন্দ্রের অসংখ্য নাটকের সমাবেশে কলকাতার সখের থিয়েটার তার শৈশবের চাপল্য ঘুচিয়ে হয়ে দাঁড়াল বাংলার রঙ্গালয়। যৌবনের দীপ্তি তার সারা মুখে, চোখে বুদ্ধির লাবণ্য, দেহে কর্মপ্রেরণার অমিত শৌর্য।

এর পরের অধ্যায়ে আসছে শিক্ষা আর সমাজব্যবস্থার কথা। নবজাগরণের আলো সেখানেও রেখেছে তার স্বাক্ষর। সেখানেও নতুনের জন্ম আর পুরনোর মৃত্যু। একটা কিছু গড়া হয় তার জন্যে ভাঙতে অন্য একটা কিছু। পুরনোকে অস্বীকার না করলে নতুনকে স্বীকার করে নেওয়ার জোর আসে না। তাই নবজাগরণের অধ্যায়কে এক ভাঙার অধ্যায়ও বলতে দ্বিধা নেই।

সব ভাঙছে। জাত ভাঙছে, ধর্ম ভাঙছে। সংস্কার ভাঙছে, সমাজের অনুশাসন ভাঙছে। মানুষের মন, মনের চেতনা সেও ভাঙছে। ঘর ভেঙে বাহির আসছে। দেশ ভেঙে আসছে বিশ্ব-পৃথিবী। সহমরণ বা সতীদাহ ভেঙে আসছে বিধবা বিবাহ। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ভেঙে আসছে ব্রহ্মধর্মের

একমেবাদ্বিতীয়ম্‌-এর উপাসনা।

সৃষ্টির উল্টো পিঠ—ভাঙা। আর সৃষ্টির বুকের ভেতরে দ্বন্দ্ব। হ্যাঁ আর না—এই দুয়ের দ্বন্দ্ব থেকে হ্যাঁ-এর সৃষ্টি। জয়ের ইতিহাস যেমন যুদ্ধের ইতিহাস, শহর কলকাতার নবজন্মের ইতিহাসও তেমনি এক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ইতিহাস।

একদিকে ধর্মসভা। অন্যদিকে ব্রহ্মসভা। ধর্মসভা রক্ষণশীলদের। তাঁদের দলে রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন। তাঁদের কাগজ 'সমাচার চন্দ্রিকা'। অন্যদিকে ধর্মসংস্কারকদের দলে রামমোহন রায়, টাকীর কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, তেলেনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এঁদের কাগজ 'সংবাদ কৌমুদী'।

রাধাকান্ত দেবের দল রামমোহনের নামে গান লিখে স্কুলের ছেলেমেয়েদের দিয়ে পথে ঘাটে গাওয়াচ্ছে।—"সুরাই মেলের কুল

বেটার বাড়ি খানাকুল,
বেটা সর্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল ;
ওসে জাতের দফা, করলে রফা
মজালে তিন কুল।"

ওদিকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাধাকান্তকে সম্বোধন করছেন—গাধাকান্ত বলে।

১৮৩০ সালের নভেম্বরে রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গিয়ে ১৮৩৩ সালে ব্রিস্টল শহরে মারা গেলেন। তিনিই বাংলার নবজাগরণের পথিকৃত। প্রবল পৌরুষ, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান ও মনীষার প্রতিমূর্তি তিনি। সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্যে তাঁর যে উদ্দাম আন্দোলন—তারই ফলে ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্কের ঘোষণা—সতীদাহ প্রথা আইনবিরুদ্ধ। সতীদাহের চিতা নিভল। কিন্তু আরেক চিতাগ্নি জ্বলল বাংলাদেশের রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবনে। বাংলার স্থির সংস্কারের শেওলায় মজা সমাজের নদীতে এল তুমুল বন্যার ডাক। দু-কূল ভরা প্লাবনের ডাক। রামমোহনের মেঘমন্দ্র আদর্শ আর বিশ্বাসের ডাক। সে ডাক দেশের নবীন যুবকদের কাছে। নতুন ভারতবর্ষের জন্যে সে ডাক। যাদের কানে সে ডাক গিয়ে পৌঁছল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল তারা। বেরিয়ে যখন এল তখন আর রামমোহন নেই। তাঁর তেজস্বিতাই তখন বাংলার

নবজাগরণকে মৃত্যুহীন নেতৃত্ব দিয়ে চলল।

১৮২৩ সালের যে দিনটিতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংস্কারের জন্যে তীব্র ভাষায় রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লিখেছিলেন—সেইদিনই বাংলাদেশে নব জাগরণের প্রথম শঙ্খধ্বনি উঠল পুরনো, পোকালাগা, জীর্ণ সংস্কারের ধ্বংসস্তূপ কাঁপিয়ে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্ত্য নীতির বিরাট ব্যাপ্ত আকাশের দিকে তিনি চোখ ফেরাবার ডাক দিলেন দেশের নবীন যুবকদের। তা বলে দেশের ধর্ম বিজ্ঞান সাহিত্যের যা কিছু মহৎ—তাকে না ভুলে। রামমোহন প্রাচীন সংস্কারকে ভাঙবার জন্যে যতটা ডাক দিয়েছিলেন নবীনেরা শুনেছিল তার চেয়ে বেশী। তার কারণ পরবর্তীকালের ফরাসী বিপ্লবের অসাধারণ প্রেরণা। 'ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর'—'ইয়ং বেঙ্গলে'র জয়যাত্রা শুরু হল কণ্ঠে নিয়ে এই গান। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হচ্ছে দিকে দিকে তখন।

সমস্ত কলকাতা পাল্টে যাচ্ছে। কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কি রাজনীতিতে। হিন্দু কলেজের ছেলেরা ধর্ম মানে না। আহ্নিকের বদলে হোমারের ইলিয়ড আবৃত্তি করে। বামুন দেখলেই পথে ঘাটে চিৎকার জুড়ে দেয়—'আমরা গোরু খাই গো, আমরা গোরু খাই গো' বলে।

হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন কে এক ডিরোজিও সাহেব। ছেলেদের মদ খাওয়া শেখায়। বিজাতীয়, ম্লেচ্ছ ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেয়, বাল্য বিবাহ মানে না। জাতিভেদকে ঘৃণা করে। মুসলমানের ছোঁয়া জল খায়। একেই বলে ঘোর কলি। নইলে নবকিশোর মল্লিকের ছেলে রসিককৃষ্ণ আদালতে দাঁড়িয়ে স্পর্ধার সঙ্গে বলতে পারল কি করে যে, আমি গঙ্গা মানি না। ডিরোজিও-র আরেক শিষ্য মাধবচন্দ্র মল্লিক 'Athenium' কাগজে লিখলে—'If there is any thing that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism.' নন্দকিশোর বসুর ছেলে রাজনারায়ণ বসু মদ খায়। পণ্ডিত রামজয় বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র কৃষ্ণমোহন মাংস খেয়ে বামুন পাড়ায় চিৎকার করে বেড়ায়—'ঐ গো-হাড়, ঐ গো-হাড়'। একি কম স্পর্ধার কথা! এইখানেই ক্ষান্তি নেই। আবার খ্রীষ্টধর্মের দীক্ষা নিচ্ছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন; শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি দ্বন্দ্বের দুন্দুভি বেজে চলেছে দ্রুত তালে। ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুআরি মেকলে—উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের গভর্নর জেনারেলের সময়ের ব্যবস্থা সচিব—শিক্ষা সম্বন্ধীয় এক অনুসন্ধান পর্বের

পাত্তা ঢুকিয়ে তাঁর মন্তব্য পত্রের এক জায়গায় লিখলেন—'A single shelf of a good European Library was worth the whole native literature of India and Arabia.' হিন্দু কলেজ থেকে সভ পাশ করে বেরুনো ছেলেদের মনে মেকলের কথা ঝড়ের ঝাপটানি তুলল। কালিদাসের জায়গা জুড়ে বসল শেক্‌স্‌পীয়র। রামায়ণ-মহাভারতের অক্ষরগুলো Edgeworth's Tales-এর পত্রছায়ায় হারিয়ে গেল অন্ধকারে। বেদ-বেদান্তের বুকে ধুলোজমা বালিলাগা অখণ্ড স্তব্ধতার ওপরে প্রতিদিন শোনা যেতে লাগল বাইবেলের স্তবগান।

ডিরোজিও-র আমলে তৈরি হয়েছিল—Academic Association. ডিরোজিও-র মৃত্যুর পর সেটা উঠে এল ডেভিড হেয়ারের স্কুলে। হেয়ার তার সভাপতি। ১৮৪৩ সালে সেটা উঠে গেল। কিন্তু প্রচণ্ড জ্ঞানের তৃষ্ণা তাঁদের উদ্যমকে কিছুতেই ম্লান হতে দিল না। তৈরি হল Circulating Library, তারই সঙ্গে Apistolarry Association. তারপরে এল জ্ঞানার্জন সভা। এরও আগে ১৮৩৬ সালে কলকাতায় পাবলিক লাইব্রেরী তৈরি হয়ে গেছে। ১৮৪৪ সালে মেটকাফ হলে উঠে এল সেটা। একের পর এক সভা-সমিতিব উদ্ভব হতে লাগল কলকাতায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষারও আন্দোলন। দীপ্ত তাপস ভগীরথের মত 'ইয়ং বেঙ্গলে'র কর্মপ্রেরণা আর নবীন ধর্মবোধ বাংলাদেশে মৃত, মুমূর্ষু শাপদগ্ধ সমাজের বুকে বইয়ে দিলে এক প্রবল তরঙ্গময় ভাবগঙ্গার ধারা। প্রতিপক্ষ তাদের সঙ্গীনের ছুঁচলো ফলার চেয়েও ধারালো অস্ত্র ক্ষুরধার শাস্ত্রবচন দিযেও আটকাতে পারলো না এই নব অভ্যুত্থান।

'এজুকেটেড'দের তখন ঠাট্টা করে ডাকা হয়—'এজু' বলে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জজ পণ্ডিত ও 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদক জয়গোপাল তর্কালংকার একটি সংস্কৃত শ্লোকে—ডিরোজিও-র ১৫ জন ছাত্রের দুর্বিনীত ব্যবহারের কথা লিখলেন—

> "দক্ষিণারঞ্জনো রামঃ রসিক কৃষ্ণমোহনঃ।
> তারাচাঁদো রাধানাথো গোবিন্দশ্চন্দ্র শেখরঃ ॥
> হরচন্দ্র রামতনুঃ শিবশ্চন্দ্রশ্চ মাধবঃ।
> মহেশোঽমৃতলালশ্চ প্যারীচাঁদো মধুব্রতাঃ ॥
> ফিরিঙ্গী-পুঙ্গব-শ্রীমদ্‌-ডিরোজিও কুশেশায়।
> মধুপানরতাঃ সম্যগ্‌ দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানবর্জিতাঃ ॥"

১। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানান্বেষণে'র প্রকাশক ও সম্পাদক।

২। রামগোপাল ঘোষ প্রসিদ্ধ বাগ্মী।

৩। রসিককৃষ্ণ মল্লিক—শিক্ষাব্রতী, সংবাদপত্রসেবী, দার্শনিক পণ্ডিত। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাছাড়া জ্ঞানান্বেষণ, জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গের সম্পাদক আর বেঙ্গল স্পেকটেটরের সহকারী সম্পাদক।

৪। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, সাহিত্যিক ও বাগ্মী। বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত। স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনের প্রবল উদ্যোক্তা। আর সে সময়ের সাহিত্য আন্দোলনেরও পাণ্ডা।

৫। তারাচাঁদ চক্রবর্তী—সেকালের রাজনৈতিক, সামাজিক জগতের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং গ্রন্থকার।

৬। রাধানাথ শিকদার—অঙ্কশাস্ত্রবিদ্। সার্ভে আপিসের কম্পিউটর। হিমালয়ের চূড়ার উচ্চতা তিনিই প্রথম মেপেছিলেন। প্রথম মহিলাদের জন্যে প্রকাশিত 'মাসিক পত্রে'র তিনি ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক।

৭। গোবিন্দচন্দ্র বসাক 'জ্ঞানান্বেষণে'র লেখক। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মারে' তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন।

৮। চন্দ্রশেখর দেব—'জ্ঞানান্বেষণে'র লেখক।

৯। হরচন্দ্র ঘোষ—মুন্সেফ, ম্যাজিস্ট্রেট, ছোট আদালতের জজ আর অন্য ধারে সমাজসংস্কারক।

১০। রামতনু লাহিড়ী—সমাজ সংস্কারক, 'জ্ঞানান্বেষণে'র লেখক।

১১। শিবচন্দ্র দেব।

১২। মাধবচন্দ্র মল্লিক। তাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে।

১৩। মহেন্দ্র ঘোষ।

১৪। অমৃতলাল মিত্র।

১৫। প্যারীচাঁদ মিত্র—টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন নিজের প্রতিষ্ঠা করা কাগজের পাতায়। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জনক বলা যেতে পারে তাঁকে।

এই ১৫জন ছাত্রের একজন শিক্ষক। তিনি ডিরোজিও। বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবকদের প্রাণস্পন্দনের ভেতরে ডিরোজিও যেন রক্তের উত্তাপ। আর এই ডিরোজিও-র পথপ্রদর্শক হিসেবে আরেকজন বিদেশীর নাম করতেই হয়। তিনি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা—ডেভিড হেয়ার। তাঁরই

উদ্যোগে স্কুল বুক সোসাইটির জন্ম। স্কুল বুক সোসাইটির নাম বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। মিশনারীদের যুগে বাংলা সাহিত্য বৈদেশিক ধর্ম-প্রচারের একটা প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু স্কুল বুক সোসাইটি বাংলা সাহিত্যের আপন আত্মাকে আবিষ্কার করার ব্রত ভার গ্রহণ করলে। ১৮৪২ সালের শেষদিকে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড থেকে স্বদেশে ফিরলেন। ইংলণ্ড আর আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আগুন ছড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। স্বদেশে ফিরবার পথে ইংলণ্ড থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন এক অগ্নিধর প্রতিভাকে। তিনি জর্জ টমসন। ১৮৪৩ সালে ২০শে এপ্রিল ইংলণ্ডের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মত কলকাতাতেও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি তৈরির পিছনে তাঁর উদ্যম আর বাগ্মিতার প্রবল প্রেরণা রয়েছে। ঠিক ঐ সময়ে বালাহিসার নামে একটা জায়গায় যুদ্ধ চলছিল। আর কলকাতায় জর্জ টমসনেরই বক্তৃতা। এই দুটিকে এক করে শ্রীরামপুরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া লিখলে—"এখন দু-দিকেই ঘন ঘন কামানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে! পশ্চিমে বালাহিসাবে আর পূর্বে ফৌজদারী বালাখানাতে।"

ফৌজদারী বালাখানা এইজন্যে বলা যে ঐখানেই নতুন সোসাইটি আর পুরনো জ্ঞানার্জন সভা স্থাপিত হয়েছিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলা হল—সেটা কেবল ইয়ং বেঙ্গল যুগের কাহিনী। হিন্দু কলেজ তৈরি হবার পর তেরো বছরের মধ্যে কলকাতা শহরে এক নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটল। পণ্ডিত সমাজের উল্টো দিক। তারই ফলে এই ইয়ং বেঙ্গলের ঐক্যবদ্ধ জাগরণ। সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত ও আন্দোলন। আর সভাসমিতি সংগঠনের প্রাবল্য। ইয়ং বেঙ্গলের দুই হাতে দুই প্রহরণ। এক হাতে পত্র-পত্রিকা। অন্য হাতে সভাসমিতি। আর সভাসমিতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি এবং বিজ্ঞানচর্চারও উৎসাহ দেখা দিতে লাগল একটু একটু করে। স্বাধীন চিন্তা আর স্বাধীনতার চিন্তা—এই সভাসমিতিরই দান। ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের জন্মও এই সভা-প্রাঙ্গণ থেকে। দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতা থেকেই সূত্রপাত বলা চলে তার। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে যে অসংখ্য সভাসমিতির জন্ম মৃত্যু ঘটে গেছে—তার মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করা তত্ত্ববোধিনী সভার মত আর কেউ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

এইভাবে 'দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানবর্জিতাঃ' একদল নবীন যুবকের হাতে উনবিংশ

শতাব্দীর অর্ধাংশ জুড়ে প্রতিদিন চলল এক নতুন ইতিহাস রচনার পালা। আবার ইতিহাসই একদিন তাঁদের দিগ্বিজয়ী দিক্‌পাল বলে সম্মান জানাতে কুণ্ঠা করলো না। স্বদেশানুরাগের মন্ত্র তাঁদের কণ্ঠে। সে মন্ত্রের উদ্গাতা ডিরোজিও। ভারতবর্ষের মাতৃবন্দনা তিনিই লিখলেন নতুন ছন্দে।—

"Well—let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks behold ;
And let the Guerdon of my labour be,
My fallen country ! One kind wish for thee."

এর পরের যুগ বিদ্যাসাগরের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর খর-দ্বিপ্রহরের সে প্রসঙ্গ এখানে টানছি না। এই অধ্যায়টুকু কেবল নবজাগরণের প্রভাত-বন্দনা।

॥ প্রভু ভৃত্য সুসমাচার ॥

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এটা শাস্ত্রবচন। অর্থাৎ আনন্দের ভেতর থেকে জন্ম নিয়েছে এই বিশ্বচরাচর।

আনন্দ কথাটির আরেকটি শব্দরূপ হচ্ছে স্ফূর্তি। অষ্টাদশ শতকের কলকাতাও জন্ম নিয়েছিল এই স্ফূর্তির মাঠে। অবাধ্য অবারিত স্ফূর্তি। নাচ, গান, মদ্য পান, জলযানে ভ্রমণ, ঘরের ভেতরে বিবি, ঘরের বাইরে পালকি বেয়ারা, আগে পিছে সেপাই বরকন্দাজ, হুঁকোবরদার, আশাসোঁটাবরদার আরও কত কি।

হেস্টিংসের সময় থেকে ইংরেজরা তো ভারতবর্ষের পাকাপোক্ত প্রভু। শুধু ক্ষণিকের অতিথি নয়। বণিক-ব্যবসায়ীও নয়। প্রভু—একেবারে ভারতবর্ষের সর্বেসর্বা। এবার শুরু হচ্ছে সেই প্রভু-বন্দনার পালা।

সেকালের ইংরেজরা ছিল বিলাসের দাস। আরামের রাজা। সকালে ঘুম ভাঙবে তার জন্যে যে আয়োজন, যে সময়, যে জনসমারোহ—তা আমাদের কটা রাজা-রাজড়ার কপালে জুটেছে জানি না।

সকাল সাড়ে সাতটার সময় সাহেবের দারোয়ান গিয়ে ফটক খুলতো। তারপর

তার পেছনে পেছনে সার দিয়ে ঢুকতো সরকার, চাপরাশী, হরকরা। চোবাদার, হুঁকোবরদার, খানসামা, কেরানী, প্রার্থী। বারান্দায় তিল ধরবে সে জায়গা নেই। হেড বেয়ারা আর জমাদার ,৮টা বাজলে সাহেবের শয়ন-মন্দিরে মাথা গলাবে। আর জমাদারের পায়ের সাড়া, কেঠো-কাশির শব্দ না পেলে সাহেবের শয্যাসঙ্গিনীর ঘুম ভাঙবে না। প্রথমে তিনি আড়মোড়া কাটবেন একবার। চোখ রগড়াবেন দু-বার। তারপর শরীরের বিস্রস্ত বসন গোছগাছ করে নিয়ে কোন গুপ্তদ্বার দিয়ে বাইরে চলে যাবেন। আর শয্যা-সঙ্গিনীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই মশারীর পর্দান্তরাল থেকে বেরিয়ে আসবে সাহেবের শ্বেত শুভ্র চরণ-যুগল। চরণ নয়, সিগন্যাল। মেলট্রেনের কামরার মত সারি সারি গায়ে গায়ে জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভৃত্যেরা ঐ চরণ-সিগন্যাল দেখেই বুঝে নেবে প্রভু বলছেন—চলো। অর্থাৎ এসো, ভেতরে এসো।

ঘরে ঢুকে তিনবার ঘাড় নুয়ে, মাটি ছুঁয়ে, সেলাম জানাবে ভৃত্যেরা। প্রভু তার প্রত্যুত্তরে মাথাটাকে কিঞ্চিৎ নাড়লেন কি নাড়লেন না তা বোঝা যাবে না। মনে হবে যেন ঠোঁটের পাতাদুটি নড়ল কিঞ্চিৎ। ব্যাস ওতেই যথেষ্ট। ভৃত্যেরা শুনবে সাহেব তাদের সংবর্ধনা জানিয়ে বলছেন, গুড মর্নিং।

এর পর তাঁর শরীর থেকে ঢিলে পায়জামাটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দেওয়া হবে পরিষ্কার ধবধবে শার্ট, প্যান্টলুন, স্টকিং, জুতো।

এবার এল ক্ষৌরকার। দাড়ি গোঁফ ছেঁটে, নখ কেটে, কানের ময়লা ঘেঁটে ক্ষৌরকার চলে যাবার পর জনৈক ভৃত্য চিলমজি আর মগ নিয়ে এগিয়ে এসে তাঁর মাথায় জল ঢেলে, মুখ-হাত ধুইয়ে হাতে তোয়ালে তুলে দেবে। প্রভু এবার মহা আড়ম্বরে গিয়ে ঢুকবেন প্রাতঃভোজনাগারে। প্রভু খাবেন। এদিকে পিছনে একজন পরিপাটি করে চুল আঁচড়িয়ে দেবে আর হুঁকোবরদার গড়গড়ার নল বাড়িয়ে প্রস্তুত থাকবে সামনে।

এবার একজন মুৎসুদ্দি প্রভুর সামনে এসে দাঁড়ালেই উপস্থিত অন্যান্য অনু-চররাও কাছ ঘেঁষতে শুরু করবে। উপস্থিত প্রার্থীদের মধ্যে কেউ নামজাদা থাকলে তাঁকে চেয়ার পেতে দেওয়া হবে বসতে। অতঃপর রাজকার্যের পালা। অনুচরবর্গ সহকারে প্রভু পালকি চড়ে বসবেন। পালকির আগে আগে ৮ থেকে ১২ জন চৌকিদার, হরকরা, চাপরাশী। যার যার গায়ে, তার তার নিজস্ব পদমর্যাদার তকমা আঁটা পোশাক। মাথায় নানা ঢঙের পাগড়ী। কোমরে কোমরবন্ধ।

পথে যেতে যদি প্রভুর হঠাৎ প্রয়োজন পড়ে কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার, অমনি চাপরাশীরা আগে আগে গিয়ে বেয়ারাদের পথ দেখাবে।

আপিসের কাজ বেলা দুটো পর্যন্ত। তারপর মধ্যাহ্নের আহারাদি পর্ব। এই বারের আহার অনুষ্ঠানে মহিলারাও যোগ দেবেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আবার কাজ। সন্ধ্যের পর সাজসজ্জা পাল্টে নাচের আসর অথবা নৌ-বিহার।

নাচ বাদ দিলে সাহেবদের বাঁচা দায়। নাচ-অন্ত প্রাণ। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই নাচ। নববর্ষ, দুর্গোৎসব, বিয়ে বাড়ি, ভোজসভা—পুজো-পার্বণে, ঘরে বাইরে নাচ, কেবল নাচ। সাহেবদের মেম। বাবুদের বাঈজী। এই দুয়ে মিলে শহর সরগরম।

প্রথম প্রথম মেমেরা বাঈজীদের নকল করে খুব জবড়জঙ্গ পোশাক পরে নাচের আসরে নামতো একেবারে ফুলপরী সেজে। কিন্তু দু-দণ্ড যেতে না যেতেই সব ভিজে জ্যাবজেবে। স্বাস্থ্যহানির ভয়ে শেষকালে নোটিশ জারী করে সবাইকে সাবধান করে দেওয়া হল যে, গ্রীষ্মকালে কেউ ভেলভেট বা সাটিনের জামা, কি গাউন পরে নাচবে না। সেই থেকে ইংরেজ রমণীর বুকের বসন একটু একটু করে খসতে শুরু হল। আর যারা এই নাচের পক্ষে ছিলেন, তারা বলতেন—কলকাতায় যা যক্ষ্মার বাড়াবাড়ি এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে প্রবল অঙ্গ-চালনা চাই। সুতরাং দিন কাটুক নৃত্যের তালে তালে।

নাচ যে শুধু বাজসভা-ভোজসভারই শোভা ছিল তা নয়। তার জন্যে থিয়েটারও ছিল। অবিশ্যি সেটা পলাশী যুদ্ধের আগের ঘটনা। সিরাজ-উদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণের সময়ে সেই থিয়েটার ঘরটিকে তাঁর তোপখানা বানিয়েছিলেন। তাঁর বিজয়ের পর ভগ্নাবস্থায় সেটি ঝোপখানা হয়ে রইল। ১৭৭৫-৭৬ সালে সাধারণের চাঁদায় সেটা আগা-পাশ-তলা মেরামত করা হয়। হেস্টিংস, জেনারেল মনসন, রিচার্ড বারওয়েল, স্যার ইলাইজা ইম্পে এঁরা সব ছিলেন উদ্যোক্তা। সেখানে সখের অভিনেতাদের গান-গাওনাকির আসর বসতো। আর সেই ঘরের অন্য একদিকে ছিল নাচের ঘর।

সেকালের আমোদ-প্রমোদের আরেকটি আকর্ষণ নৌ-বিহার। যন্ত্রযানের আবিষ্কারের আগে জলযানে ভ্রমণের পথটাই ছিল প্রশস্ত। আর জলযান হিসেবে ময়ূরপঙ্খীর কদরই ছিল সবচেয়ে বেশী। ১০০ ফিট লম্বা ৮ ফিট চওড়া। দাঁড় বায়

৪০জন মাঝি। নৌকার মাথার দিকে বিরাট মুখ-হাঁ-করা একটা সাপ। আবার কোনটায় ময়ূরের মাথা। সোনালী রংয়ের কারুকার্য করা বিচিত্র ময়ূর নৌকোর পেছনে। রূপোর খুঁটিতে টাঙানো রেশমী চাদরের চাঁদোয়া। কাঠের ঘরও বানানো থাকতো কোন কোনটায়। তারই ছাদে বসে স্নিগ্ধ হাওয়ার স্বাদ নিতে নিতে অবসাদ ঘুচতো।

জলযানের আদর-কদর যতই থাক তার প্রয়োজনটা একমাত্র বিলাসের জন্যে। কিন্তু স্থলযানের প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তেই। আপিস যেতে, আদালত থেকে ফিরতে, বেড়াতে—সব সময়েই। আর স্থলযান হিসেবে একমাত্র ভরসা পালকি। কেননা তখনও যন্ত্রযানের চলাচল শুরু হয়নি। সেটা চালু হল হেস্টিংসের আমল থেকে।

পালকির প্রকাশ বহুরূপীর মত। প্রথম যুগের পালকি ছিল চারদিক খোলা। ছাদের মাঝখানটায় উঁচু। কাঠের গায়ে নানাধরনের নকশা কাটা কারুকার্য। গদী আটা। বা সাটিন সাঁটা। পরে এল ঢাকা-পালকি। আর চেয়ার পালকি। চেয়ার পালকিরই আরেক নাম তাঞ্জাম। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক পর্যন্ত এই তাঞ্জামে চড়ে যাতায়াত করেছেন। তারপর রূপোর কাজ করা তক্তারামা, চতুর্দোলা, মহাপায়া। ক্রমবিবর্তনের ফলেই পালকির এই সব নব নব মূর্তি পরিগ্রহণ। আরেক রকম পালকি ছিল। তাকে বলা হত ডাক-পালকি। দেখতে সবটাই পালকির মত। কেবল চাকা লাগানো। ঘোড়া নয়, টানতো মানুষ।

প্রত্যেক পালকিতে আরোহী থাকতো একজনই। কিন্তু বেয়ারার কোন ঠিক ছিল না। কখনও ছয়। কখনও আট। পালকির সঙ্গে বেয়ারা ছাড়াও আরেকজন লোক যেত। ছাতাবরদার।

সেকালে পালকি বেয়ারাদের কাজটা উড়েদেরই একচেটে ছিল। পাঁচ মাইলের পথ গেলে ভাড়া ছিল চার আনা। ৮ মাইলে ১ টাকা। কি বাবু, কি সাহেব, সেকালে সকলেরই প্রাণের বাহন ছিল পালকি। আজ গেঁয়ো-যোগী হয়ে ভিখ জোটে না তার। এখন কোন্ বাবুর পাখা গজিয়েছে, টাকা গজিয়েছে তা চিনতে হয় কোন্ নতুন ডিজাইনের গাড়ি হাঁকাচ্ছেন তিনি তাই দেখে। গাড়ির চেহারা দেখে বাবুর হাঁড়ির খবর বোঝা যায় এখন। রোলস্ রয়েস, না ক্যাডিলাক, না স্টুডিবেকার না বুইক। তখন তেমনি চিনতে হত পালকি হাঁকানো দেখে। সাহেবরা তখন চড়ি বললেই

যাকে তাকে পালকিতে চড়তে দিতেন না। কেননা পালকি চড়াটা সাগর পারের বিলাসিতা! সুতরাং রাম শ্যাম যদু মধু যে কেউ তাতে চড়লে তার মান মর্যাদা ভেঙে পড়তে পারে—এই ভয়েই পালকি চড়ার বিধি-বিধান তৈরি হয়েছিল অনেক।

তাহলে চড়তো কারা?

যাদের চামড়ায় রাজ অনুগ্রহের শিলমোহর পড়েছে—শুধু তারাই। প্রথম বাঙালী হিসেবে ইংরেজ আমলের শুরুতে পালকি চড়ার অনুমতি পান শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব। ঘোড়ার গাড়িতে চাপবার অধিকারও প্রথম পেয়েছিলেন তিনি।

এই সব হেঁটে বেড়ানো পালকির জন্মভূমি হল সাগরপারের হাট। পরবর্তীকালের জুড়ি গাড়ি, ফিটন, লাণ্ডোলেট ছিল এই পালকি-ঠাকুরদার নাতি-নাতকুড়।

ইংরেজ আমলে সাহেব-প্রভুদের পালকির মত আরেকটা প্রিয় জিনিসের নাম করতে ভুলে যাচ্ছিলাম। হুঁকো—ভালো করে যাকে বলতে হয় আল-বোলা। হুঁকো আমরা যখন তখন টানতে পারি। কিন্তু সেকালে হুঁকো টানবার আগে যেটি না হলেই নয়—সেটি হল হুঁকোবরদার। নইলে তামাকের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে সাহেবের পিছু পিছু—আপিসে, আদালতে, ডিনার পার্টিতে ছুটবে কে? হুঁকোটা খুব ন্যাড়া ন্যাড়া কিন্তু গড়গড়াটার কী জাঁকজমক!

হুঁকোর চেয়ে গড়গড়ার দিকেই নজর ছিল তাই সকলের। আগা-গোড়া রূপো দিয়ে মোড়া। তারপর নলের জায়গাটা সোনা বাঁধানো। নলের গায়েও জরির নকশা। মাপে দশ গজ।

নল নিয়ে আবার ভারি বিভ্রাট। একজনের নল যদি আরেকজন ডিঙিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হয় উনি ইনিকে অপমান করলেন। এই নিয়ে হাতাহাতিও হয়েছে বহুবার। হুঁকো ফুঁকতে গিয়ে প্রায় শিঙে ফোঁকার যোগাড়।

তামাক-সাজার রেওয়াজ সেকালে যেমন চালু ছিল তেমনি তামাকটাও ছিল একটা সাজবার মত জিনিস। একালে লোকে যা খায়—সেটা তামাক। সেকালে যা খেতো তা তামাক হলেও তামাক নয়, তাম্রকূট। গব্য ঘৃতও ঘি। ডালডাও ঘি। এই দুই ঘিয়ের মধ্যে যে কী তফাৎ সেটা বুঝতে পারলেই

ঐ দুই তামাকের ফারাক ধরা যাবে। সেকালের তাম্রকূট পুরাকালের নন্দনকাননের যে কোন গন্ধরাজ ফুলের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারতো। তাই মেয়েরাও সাহেবদের রক্তচক্ষুর আড়ালে রাঙা ঠোঁটের প্রসাধনকে ক্ষুণ্ণ করেও তাম্রকূট সেবনের লোভ সামলাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সভাসমিতিতেও তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তামাক খাওয়ার।

আর যদি কারো আপত্তি থাকতো—তিনি তাঁর নিমন্ত্রণ পত্রের শেষাংশে লিখে দিতেন—"No hookahs to be admitted upstairs." আবার উল্টোটাও লেখা থাকতো—"is requested to bring no servants except his hookahburdar."

১৮৪০ সালে হুঁকোর চলন, আলবোলার বড়লোকি চাল রাহুগ্রস্ত চাঁদের মত ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে একদিন একেবারেই বিলীন হয়ে গেল।

সময় কারো সমান যায় না। চুরুটের চোখ রাঙানি হুঁকোকে একঘরে করল। ফিটনের দাবড়ি খেয়ে পালকি শহরের রাস্তা ছেড়ে পিঠটান দিলে গ্রামগঞ্জের দিকে। রইল অল্প দু-চারটে যা, তা কেবল স্বল্প-বিত্তদের জন্যে।

কলকাতা শহরের ইংরেজ দম্পতীর কাছে ফিটন হল সবচেয়ে ভালবাসার বাহন। ভালবাসার বাহন কি ঠিক বলা হল? বলছি এইজন্যে যে ভালবাসার ব্যাপারে ফিটনের সত্যিই অসামান্য ভূমিকা ছিল। ঘোড়ার কদম দেখে লর্ডদের দাম ঠিক করত লেডীরা। গাড়ি তখন এক আধ রকম নয়। নানা ছাঁদের আমদানী হয়েছে। জেঁকে বসেছে স্টুয়ার্ট, সেটান কুক, হার্ট ব্রাদাস, ভেলাণ্ট ব্রাউন ইত্যাদি কোম্পানী।

ফিটন তখন গাড়ির রাজা। তাছাড়া চেরেট্, বগি, লাণ্ডোলেট, পালকি গাড়ি, ব্রাউনবেরী, দশফুকুরে, ব্যারাস, ব্রুহাম আরো কত। ব্রুহামটা ছিল ডাক্তার হাকিমদেরই বেশী প্রয়োজনের।

সাহেব প্রভুদের মন চিরকালই বার-মুখো। সকালে উঠেই চাই প্রাতঃভ্রমণ। বাগবাজারের কাছে পেরিন সাহেবের বাগান ছিল সৌখিন বাবুদের বেড়াবার একটা চমৎকার জায়গা। জুড়ি চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে দল বেঁধে সেখানে বেড়াতো যেত সবাই। এখন যাকে গোলদিঘী বলি তার আগেকার নাম ছিল মেছো-পুকুর। ঐ মেছোপুকুর আর চাঁদপাল ঘাটের মাঝামাঝি অনেকগুলো বেড়াবার জায়গা ছিল। কলকাতার কাছে ঘোড়দৌড়ের বিরাট মাঠে

গাড়ির ভেতরে বসে ঠাণ্ডা হাওয়া খাওয়া—সাহেবদের কাছে স্বর্গসুখ। এক মুঠো হাওয়ার সঙ্গে দশমুঠো ধুলো নাকের ভিতরে গেলেও কেউ বিরক্ত হ'ত না। দখিন-হাওয়া গলাধঃকরণের দক্ষিণে হিসেবেই সবাই মেনে নেত ওটাকে।

বজরা আর ব্রুহাম ছাড়াও পদব্রজে ভ্রমণের রেওয়াজটাও ছিল তখন। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের কাছে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত হেঁটে যেত সবাই। সকাল বিকেল পায়ে হেঁটে বেড়ানোর জন্যে চোখ জুড়োনোর জায়গা ছিল 'রেম্পাণ্ডিয়া ওয়াক'। সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত সাহেব ছাড়া আর কারো সেখানে মাথা গলাবার হুকুম ছিল না। গেটে সব সময় সেপাই-সান্ত্রীর কড়া পাহারা।

বেড়ানো চুকলেই খেলাধুলো। সেও কি এক রকম। তাস খেলা, জুয়া খেলা, স্ফূর্তি খেলা, বিলিয়ার্ড খেলা। সবশেষে ঘোড়দৌড়। যে-কোন কফি হাউসেই আট আনা পয়সা দিলে বিলিয়ার্ড খেলার সাজসরঞ্জাম টেবিল মিলত। লর্ড কর্নওয়ালিসের আগে পর্যন্ত জুয়াখেলা ক্লাবের মধ্যে প্রকাশ্যেই চলতো। তাস খেলার সময় ছিল রাত্রি ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত। খেলা হত বাজি ধরে: 'ফাইভ কার্ডলু', 'ট্রি', 'ডিল', 'হুইস্‌ট্' এই সব ছিল তখনকার খেলার নাম। তাসের রঙে শুধু পুরুষ নয় মহিলারাও রঙ মেলাতেন। আর ঘোড়দৌড়ের একটা মাঠ ছিল গার্ডেন-রীচে। অন্যটা কলকাতার ময়দানে।

সাহেব প্রভুদের আমোদ-প্রমোদের তালিকায় আরেকটি জিনিসকে স্বীকার করতে হবে। শিকার। মাছ ধরাও শিকার। বনে জঙ্গলে হাতীর পিঠে চেপে বন্দুক বাগিয়ে বাঘ কি হরিণ মারাও শিকার। আবার কলকাতা থেকে ১৫ মাইল দূরে নিউ পার্কে গিয়ে শূকর বধ করাও শিকার। শিকারী সাজাটাও যেন একটা আনন্দের খোরাক, শিকার করা জন্তটিও সময় সময় তেমনি যোগায় আহার্যের খোরাক। হরিণ কি বাঘের চামড়ায় ঘর সাজানোও চলে।

এতক্ষণ ধরে গাওনাকি হল শুধুই সাহেব সমাচার। এবার বিবি-বৃত্তান্ত। কোম্পানীর আমলের শৈশবকালে বিলেত থেকে কলকাতায় যত সাহেব আসতো, তার চেয়ে ঢের কম আমদানী হত মেম। সাহেবদের বিবাহটা সে কালে তাই ছিল একটা সমস্যার মত। এদেশীয় মেয়েরাই তাদের অনেকের

একমাত্র ভরসা। চারশো সাহেবের সাকুল্যে মাত্র আড়াইশো মহিলায় কুলোবে কি করে? তাই মাসে মাসে জাহাজে করে মেম চালান আসতো। এক একজন মহিলার আসতে খরচ পড়তো ৫০০০৲ টাকা। হা-পিত্যেশ হয়ে সাহেবরা অপেক্ষা করতো জাহাজ কখন এসে লাগবে ঘাটে। কিন্তু মেম হলেই যে তাকে বিয়ে করা যাবে—সে গুড়ে বালি। এক ঝোড়া রত্নালংকার, এক ঘর সুন্দর পরিচ্ছদ, তাকের ওপর দামী বাসন কোসন, মনোমত অন্যান্য সামগ্রী ঠিক সময়মত যোগাতে পারলে তবে কোনমতে পত্নী একটি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ঘরকন্নার কাজ তিনি করতে পারবেন না কিছু। সে ব্যাপারে একদম অনড়। দাস দাসী চাই। চাই ঠাকুর চাকর।

এসব যোগাড়-যন্তরের পরেও প্রেমটা যে খুব টেকসই হবে এমন কিছু নিশ্চয়তা নেই। সদ্য-বিবাহিত দম্পতীর প্রণয়লীলা একমাস দু-মাসেই শেষ হয়েছে এমন ঘটনা বিরল নয়। কারণ অন্তরের ভালবাসা বলতে কারো ওপর কারো ছিল না। ছিল অর্থের ওপর। বিবাহিত সিভিলিয়ানরা তখন ২০০৲ টাকা অতিরিক্ত মাইনে পেত।

ইওরোপীয় মহিলারা সেকালে ওজনের চেয়ে আড়ম্বরেই বেশী ভারি। হেস্টিংস পত্নী ছিলেন সেকালের ফ্যাশন-জগতের সম্রাজ্ঞী। তিনি আজ যা চালু করেন, কাল সমস্ত ইংরেজ মহিলা তা কপি করার জন্যে কেঁদে মরে। লণ্ডন প্যারিস থেকে যাবতীয় হাল ফ্যাসনের খবর নিয়মিত আসতো তাঁর কাছে। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ এক একদিন এক এক ঢঙের। আজ একদম কচি খুকির মত নাবালিকা সেজেছেন। আবার কাল সেজে এলেন কোন এক ভোজ-সভায় যাকে বলে এলোকেশী। কিংবা মাথার চুলগুলোকে আলু-থালু করে জড়িয়ে তাল পাকিয়ে।

সেকালে সাহেবদের যেমন বেড়িয়ে বেড়ানোর রেওয়াজ, মেয়েদের তেমনি ছিল বাড়ি বেড়ানোর রেওয়াজ। এ আসছে ওর বাড়ি। ও আবার এর বাড়ি গেল। সাহেবদের মজলিসে বাঈনাচ চালু ছিল। আর সাহেবদের মধ্যে চালু ছিল আরেক রকম নাচ। তার নাম ফ্যান্সি ড্রেস বল নাচ। এতে ইংরেজ সাহেব মেম সকলেই কৃত্রিম পোশাকে সেজেগুজে অভিনয় করতো। পাহারাওলা, নাগা সন্ন্যাসী, মুন্শী, মেথরানী, সুবাদার এমনি আরও অনেক চরিত্রেরই অভিনয় হত।

তখনকার অধিকাংশ সাহেবেরই বাড়ি ছিল বেশ নীচু। ঘর বলতে দুটি। বারান্দা সামনে। আসবাবপত্র বলতে একটা খাট, দুখানা চেয়ার, টেবিল, টেবিলের ওপরে কাগজপত্র, বই, চুরুট কেস, একটা হিন্দুস্থানী অভিধান। লেপের ওয়াড়ে শিকার করা হরিণের কি বাঘের চামড়া। দেয়ালের গায়ে এক কোণে একটা বন্দুক। এসব আসবাবের সঙ্গে ছিল তালপাতার পাখা। টানা পাখা প্রথম চালু হয় রাজা সুখময়ের বাড়ির উৎসবে। প্রবল গরমের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে আরেকটা জিনিস চালু ছিল তখন। খসখসের টাট্টি। জানলায় দরজায় তখনো কাঁচ ওঠেনি। বেতের জানলা আর প্যানেল আঁটা দরজাই তখনকার সাহেব বাড়ির সৌন্দর্যের যা কিছু আকর্ষণ।

খুন জখম, লাম্পট্য, বিলাসিতা এবং সর্বোপরি ঘন ঘন আত্মহত্যা—সেকালের সাহেব প্রভুদের জীবনে এইগুলির প্রভাব ছিল খুব বেশী। নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন তখন অর্থাৎ সেই সদ্য-রাজ্যপাট বিস্তারের যুগে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা দিয়েছিল। অথচ পোশাকে-আশাকে কিছু বুঝবার যো নেই। তারাও আবার মসলিন পরে। মেয়েদের হাতে পরায় লোহা, শাঁখা-সিঁদুর। হিকির গেজেট সেকালের নির্মম সংবাদপত্র। হিকির কাগজে তখনকার ইঙ্গ সমাজের যাবতীয় ঘটনাবলী বিন্দুমাত্র সংযম বা শ্লীলতার আড়ালে না ঢেকে খোলাখুলি ভাবেই আলোচিত হত। প্রতিদিনের যা কিছু গ্লানি, কদর্যতা, যৌন-লিপ্সা, উচ্ছৃঙ্খলতা, লোভ-লালসা, দ্বেষ, অর্থগৃধ্নুতা সবই। ১৭৮০ সালে হিকির গেজেটে একটি ব্যঙ্গ-রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের ইংরেজ প্রভুদের সত্য পরিচয় অনেকখানি লুকোনো আছে তাতে। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপুজোটা জমে ভালো।—

প্রশ্ন—বাণিজ্য কি ?

উত্তর—জুয়াখেলা।

প্রশ্ন—সর্বোৎকৃষ্ট গুণ কি ?

উত্তর—ধন।

প্রশ্ন—স্বদেশ প্রেম কি ?

উত্তর—আত্মপ্রেম।

প্রশ্ন—প্রতারণা কি ?

উত্তর—ধরা পড়া।

প্রশ্ন—সৌন্দর্য কি ?

উত্তর—রঙ।

প্রশ্ন—সময় সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন কি ?

উত্তর—দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা অভিসারের অঙ্গীকার যথাসময়ে পালন।

প্রশ্ন—ভদ্রতা কি ?

উত্তর—অমিতব্যয়িতা।

প্রশ্ন—সরকারী টেকস্ কি ?

উত্তর—গুণ পালান।

প্রশ্ন— জনসাধারণ কে ?

উত্তর—কেহই নয়।

প্রভুর গুণকীর্তন-পালা এইখানেই ফুরলো। এবার ভৃত্য সমাচার।

১৭৫৯ সাল। কলকাতায় একদিন সমস্ত জমিদারদের নিয়ে একটা জরুরী সভা ডাকা হল। কি ব্যাপার ? সভার বিষয়সূচী কি ? না ভৃত্য। শুনে চমকালো সবাই। সভা ডেকে ভৃত্যদের সম্বন্ধে আলোচনা হবে। উপস্থিত থাকছেন হলওয়েল, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, রিচার্ড, বিচার প্রভৃতি জাঁদরেল জাঁদরেল ব্যক্তিরা।

সভায় আলোচনা চলল পুরোদমে। সকলেরই মুখে একটা কথা। কলকাতাব ইংরেজদের ঘরের চাকররা খুব উদ্ধত হয়ে উঠেছে। তারা আজকাল খুব বেশী রকম একটা মাইনের দাবি করে বসে, যা দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। এর একটা বিহিত চাই। সভায় সর্ববাদীসম্মতিক্রমে অনেকগুলো প্রস্তাব পাশ হল। ইংরেজরা তাদের ভৃত্যদের জন্যে একটা মাইনের হার বেঁধে দিলে। এই বাঁধা মাইনে না মানলে তাদের বাঁধা পড়তে হবে হাজতে। জমিদারের বিচারে যা শাস্তি প্রাপ্য হয় সেটাই তখন মানতে হবে নির্বিচারে। অবশ্য শাস্তিরও একটা সীমা রাখা হল। যেমন জরিমানা, বাসোচ্ছেদ, কারাদণ্ড আর দৈহিক প্রহার—এর বেশী আর এগোনো যাবে না। তারপর হুট্ বলতে চাকরি ছেড়ে ছুট দেবে, সেটি হবার যো নেই এখন থেকে। ছুটি দরকার হলে একমাস আগে থেকে প্রভুকে জানাতে হবে।

তবে এসব মানার পরও যদি কোন প্রভু ভৃত্যের প্রতি কোনরকম অসদাচরণ করেন, তিনি যতই মান্যগণ্য হোন—ভৃত্য প্রকাশ্য আদালতে সেই প্রভুর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে পারবে।

সভাতেই ভৃত্যদের একটা বাঁধা মাইনের তালিকা, মাসিক তলবানা তৈরি

করা হল।

পদ—	অর্থ (আর্কট টাকা)
১। খানসামা (খ্রীষ্টান, মুসলমান)	৫৲
২। চোবাদাব (হিন্দু)	"
৩। প্রধান বাবুর্চী	"
৪। কোচম্যান	"
৫। পর্তুগীজ হেড-আষা	৪৲
৬। জমাদাব	৩৲
৭। খিদমতগার	"
৮। বাবুর্চীব সহকাবী	"
৯। সর্দাব বেযাবা	"
১০। দ্বিতীয আযা	"
১১। পেয়াদা	২॥০
১২। বেযাবা	"
১৩। ধোপা	৩৲
১৪। সহিস	২৲
১৫। মশালচী	"
১৬। পবচুলা সাজাবাব নাপিত	১॥০
১৭। নাপিত	"
১৮। খবচপবদাব	২৲
১৯। মালী	"
২০। ঘেসেড়া	১।০
২১। দাসী	১৲
২২। হুঁকোববদাব	"

আজ আব চোবাদাব, মশালচী, পবচুলাববদাব, খবচপবদাবেব দিন নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতক বা উনবিংশ শতকেব নাগবিক সভ্যতায এদেব জৌলুষ হাজাব বাতি ঝাড়লণ্ঠনেব আলোকেও ম্লান কবে দিত। হুঁকোববদার না হলে সভা-সমিতিব শোভা নষ্ট। প্রভুদেব জলকষ্ট নিবাবণের জন্যে 'আবদাব'। পানীয জলকে শীতল বাখাই তাদেব কাজ। মদ নইলে আমোদ জমে না। তার জন্যে চাই সবাবদাব। আমাদেব অতিশয্যে বাবুবা যখন ঘামছেন—

তখন পিছন থেকে হাওয়া করে যারা—তারা হচ্ছে ‘পাঙ্খাকুলি’। বাবুর্চী তো রাঁধল। কিন্তু প্রভুদের মুখের সামনে এগিয়ে দেবার লোক চাই একজন। তার জন্যে সেজেগুজে প্রস্তুত ‘কম্পরদার’। আর রাঁধবার আগে হাট বাজার চাই না? তার হিসেবপত্র রাখাটা কি কম ঝামেলা? সেজন্যেও একজন লোক চাই বইকি। এল ‘কার্বাদার’। এ তো সব প্রভুদের সামলানোর ব্যাপার। কিন্তু প্রভু তো একা নন। তাঁর পত্নী আছেন, পুত্র, কন্যা, আছে, এ তালিকায় তাঁর অতি আদরের কুকুরটির নামই বা বাদ যায় কেন? ঘোড়ার জন্যে যেমন ‘সহিস’, হাতীর জন্যে যেমন ‘মাহুত’ তেমনি কুকুরের জন্যে ‘ডুরিয়া’। ডুবে ডুবে জল খাওয়া যায়, মদ নয়। মদ খাবে মদের মত। দশ জনের সামনে। হাঁক-ডাক করে। মাথার ওপরে জ্বলবে লণ্ঠনের ঝাড়, বাতিদান। পেয়ালা পিরিচে প্রভুর রাঙা মুখমণ্ডলের সেই আলো রামধনুর মত সাতটা রঙের বাহার তুলবে। কিন্তু এত আলোর তদ্‌বির করে কে? কেন, ‘ফরাস’?

এসব গেল চাকর-বাকরের কথা। এখনও উপকথা বাকী আছে। সেটা ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর। সেকালে কাফ্রী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীর দাম ছিল সবচেয়ে বেশী। তাদের শরীরের বাঁধুনীর জন্যে কিনা কে জানে। আবার রাঁধুনীর কাজ জানলে মূল্য আরো বেশী। এক একজনের দাম ১০০৲ টাকা। আবো বেশী হতে পারে যদি তাদের কেউ গান, বাজনা, নাচ কিংবা ক্ষৌরকাজ জানে।

প্রভুরা মৃত্যুর আগে এঁদের নামেও উইল করে এবং চাকবি থেকে মুক্তি দিয়ে যেতেন।

ইংরেজ প্রভুদের কৃপায় সেকালে ক্রীতদাস বালকের আর ক্রীতদাসী বালিকার বহু নির্মম নির্যাতনের কাহিনী ইতিহাসের পাতার কালো হরফে ফুটে আছে।

ইংরেজরা সুসভ্য জাত। একজনের পিছনে দশ-বিশটা চাকর না ঘুরলে তাদের মনে হয় যেন প্রাগৈতিহাসিক জগতে পিছিয়ে পড়ে আছি। সুতরাং দাম বাড়ুক আর যাই হোক, ভৃত্য-পোষণ তাদের করতেই হবে।

মাক্রেবী সাহেব ফিলিপ ফ্রান্সিসের সেক্রেটারী। তিনি তাই ভৃত্য-পোষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—“চাকর-বাকরদের বেতন চার গুণ বেড়েছে। তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে এর ফলে তাদের সংখ্যা কমবে। আমি জানি, কোন কোন ইংরেজ পরিবারে কেবল চারজন বাসিন্দে। কিন্তু চাকর

১১০ জন। হায়! এ সব সত্ত্বেও লোকে বলে আমরা মিতব্যয়ী!"

কিন্তু প্রভু কি শুধু এক ইংরেজ নাকি? ইংরেজ আধিপত্যের যুগে তাদেরই অপত্য স্নেহের পক্ষপুটে যে সব দেশীয়রা কলকাতা শহরের ওপরে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি হাঁকিয়ে পৃথিবীর ওপরে স্বর্গোদ্যান গড়ে তুলেছেন—তাঁরা কি কলকাতার প্রভু নন। নিশ্চয়ই। সুতরাং তাদের প্রসঙ্গ কেন বাদ যাবে? প্রভু বন্দনা করতে তো আপত্তি নেই। কিন্তু কে যে কত বড় প্রভু তা মাপা যায় কেমন করে? কেন মাপা যাবে না। বাপের শ্রাদ্ধে, ছেলের বা মেয়ের বিয়েয়, নাতির অন্ন প্রাশনে যার লক্ষ লক্ষ টাকা নিশ্বাস ফেলতে নিঃশেষ হয়ে যায় তিনিই তো সবচেয়ে বড় প্রভু। ইংরেজদের যে যত বড রকমের খানা খাওয়াতে পারবে—সে তত বড় প্রভু। যার বাড়িতে যত বাঙালীর আনাগোনা, যত আমোদ প্রমোদ আর যত মদ—তিনি ততই নামজাদা।

এই দেশীয় প্রভুদেরই আরেক নাম 'বাবু'। এদের বহিরঙ্গের কিছু বর্ণনা না দিলে 'বাবু' চরিত্র বোঝা দুষ্কর হবে।

"মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বানিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমন্বিত চীনের বাড়ির জুতা।"

দিনগুলি এঁদের খুবই কর্মব্যস্ত। ঘুমোতে হয় আলবোলা টানতে টানতে, টানা পাখার হাওয়ায়। ঘুড়ি ওড়াতে হয়। বুলবুলির লড়াই দেখতে হয়। সেতার, এসরাজ, বীন এসব বাদ্যযন্ত্রের কান ধরে নাড়াচাড়া করতে হয়। তারপর আছে কবি, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী।

কবিগান যদি শুনতে হয় তো নিতাই বৈষ্ণবের। ভবানী বেনের সঙ্গে যখন গান জমে—সে এক শুনবার জিনিস। পথ ঘাট থৈ থৈ করে লোকে। নাওয়া খাওয়া ভুলে শোনে 'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই'। আর একজন আছেন তিনি হরু ঠাকুর। তাঁর প্রতিপত্তি খ্যাতিও কম নয় এতটুকু। সাধ্বী স্ত্রীর বিরহ-যন্ত্রণা বর্ণনা করেছিলেন তিনি একটা গানে।—

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে; তারে বলি বলি,
আর বলা হল না
একে আমার এই যৌবনকাল, তাহে কালবসন্ত এল,

এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নজলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না।”

এই হরু ঠাকুরের শিষ্য হচ্ছে ভোলা ময়রা। তাঁর সঙ্গে লড়াই জমতো—অ্যান্টুনী ফিরিঙ্গীর। অ্যান্টুনী জাতে ফিরিঙ্গী হলেও সংস্কৃতিতে বাঙালী। তাই গানের আগে দুর্গা বন্দনা করতেন তিনি—

“যদি দয়া করে তার মোরে এ ভবে; মাতঙ্গি;
ভজন সাধন জানি না মা জাতেতে ফিরিঙ্গী।

অন্যপক্ষ তাকে তখনি প্রত্যুত্তরের বাণে বিদ্ধ করতো।

“যিশুখ্রীষ্ট ভজ্‌গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জাতে,
জাত ফিরিঙ্গী জাম্নড়জঙ্গী পারব নাক তবাতে।”

কবিগানের স্রষ্টা গোজলা গুঁই। আর পাঁচালীর রাজা দাশরথী রায়। বিধবা বিবাহকে ব্যঙ্গ করে তিনি গান লিখেছিলেন—

“বিধবার দিতে নাগর
গুণের সাগর
বিদ্যাসাগর—গুণ ধরেছেন গুণনিধি।”

আর মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে লিখলেন—

“হরিনাম খাসা গুড়ক ভুড়ুক ভুড়ক
টান দেখি মন দিবা নিশি।

এর পর আসে বাবুদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা।

‘আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে Doctorকে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন। Physic বেশ operate করে ছিল, four five times motion হল, অদ্য কিছু better বোধ কচ্ছেন’—এই হচ্ছে তাদের বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ, এবং ইংরেজি ভাষার নৈপুণ্যের একটি চরম উদাহরণ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাবুদের গুণাবলী বা লক্ষণাবলী সংক্রান্ত একটি ছড়া চালু ছিল হাটে বাজারে। সেই ছোট্ট ছড়ার মধ্যে বাবু বৃত্তান্তের চাবিকাঠিটি লুকোনো। আর সেই চাবিকাঠি পেলে আমরা অনায়াসেই

বাবুদের অন্দর মহলে মাথা গলাবার গুপ্তদ্বারটিকে আবিষ্কার করে ফেলবো।

"ঘুড়ি তুড়ি জস দান
আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান।
অষ্টাহে বনভোজন
এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"

পরবর্তীকালে হুতোমের ভাষায় এই ছড়াটিই যেন পোশাক বদলে অন্য এক রূপে প্রকাশ পেল।

"আজব শহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কী কেতা।"

সেকালের বাবুদের সমস্ত রকম আমোদ-প্রমোদের মুখ মদের পেয়ালা পিরিচ আর মেয়েমানুষের পিরীতির দিকে ঘুরোনো ছিল। নবাবী আমলের শেষ দিকে যে সব বিত্তবান সুখের পায়রারা উড়ি উড়ি করেও অভিজাত্যের খোলা আকাশে গা ছড়াতে পারছিলেন না ইংরেজ আমলের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাখা গজাল। সম্ভ্রান্ত সমাজ পরমেশ্বরের মত এক হতে বহু হয়ে দাঁড়াল। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট ব্রিটিশ রাজশক্তির ছত্রছায়ায় ব্যাঙের ছাতার মত দিনের পর দিন নব নব কলেবরে প্রকাশিত হতে লাগল—দেওয়ান গোমস্তা, দালাল, মুচ্ছুদি, জমিদার, তালুকদার। একদিকে (লর্ড) রাজা আর অন্যদিকে অসংখ্য ধনী—এই দুই নিয়ে তৈরি হল নতুন রাজধানী কলকাতা। ইংরেজদের কাটা খাল বেয়ে তখন টাকার কুমীর এসে জড়ো হচ্ছে বাবুদের বাড়িতে। সে টাকা স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্যে খাটাবার মত সুযোগ সুবিধে নেই তখন। তাই টাকার কুমীর গা ঝাড়া দিতে শুরু করল। আজ মোরগের লড়ায়ে গেল হাজার। কাল বেড়ালের বিয়েতে লাখ। পরশু আতর ঢেলে ঘর বার চুনকাম করা হল। বুলবুলির লড়ায়ের জন্যে পাঁচশো এ তো প্রায় লেগেই আছে। বাঈনাচ, টপ্পা, খেউড়, সখের যাত্রায় কত গেল—তার হিসেব রাখে কে? সে এক মদমত্ততা আর মদন-মত্ততার যুগ।

পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই বাঙালীর নিজস্বতা, স্বকীয়তায় মরা গাঙে ভাঁটার টান লাগে। তার পালকি গিয়ে ফিটন এল। বাংলা শব্দের ঘাড়ে চাপল অনর্থক ইংরেজি শব্দের ফিরিঙ্গীসুলভ দুর্বোধ্য উচ্চারণ। ফিরিঙ্গী সঙ্গীতের গায়ে বিলিতি সুরের গাউন পরিয়ে টেনে আনা হল জনসমাবেশে।

নাচের মধ্যে এল মেমদের প্রভাব। কবিওয়ালার স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গীতপ্রবণতা আর সুললিত ছন্দ মুছে গিয়ে শুরু হল আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা, খেউড়ের অভিযান। এমন কি কবিগানের মধ্যেও ইংরেজি শব্দও মাথা গলাতে লজ্জা পেল না। নৈতিক চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের কথা এখানে তবু তুলছি না। হুতুম প্যাঁচার নক্‌শা তার দলিল হয়ে রয়েছে। বাঙালী সংস্কৃতির হাঁস আর ইংরেজিআনার সজারু একঘাটে জল খেতে এসে রূপান্তরিত হল এক কিম্ভূতকিমাকার হাঁসজারুতে। পিছন থেকে তাকে সমর্থন আর অনুকরণ করার মত রাজা-রাজড়ার অভাব তখন কলকাতা শহরে ছিল না আদৌ।

অভাব ছিল কেবল 'জ্ঞানান্বেষণে'র মত সুস্থ সবল পত্রিকার। ঠাকুর বাড়ির মত পরিবারের। মাইকেল মধুসূদনের মত কবির। ঈশ্বর গুপ্তের মত সম্পাদকের। রামমোহন রায়ের মত প্রবলপ্রাণ নেতার। বিদ্যাসাগরের মত প্রতাপান্বিত পৌরুষের।

এঁদের আবির্ভাবে শহর কলকাতায় যে যুগান্তর এল তা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

ইতি পালা সাঙ্গ ও যবনিকা পতন।

॥ আজব শহর কলকেতা ॥

হাণ্টার সাহেব তাঁর একটি ইতিহাসের বইয়ে রূপকথার মত এই ছবিটি এঁকেছিলেন:

দেশভ্রমণের সময় মাঝে মাঝে একটা কথা ভেবে বেশ আমোদ পাই। ভাবি আর কল্পনা করি। ধরা যাক্, গত শতাব্দীর একজন মৃত হিন্দু আবার পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার ফিরে পেল। আজ সে নিজের দেশকে দেখে কি ভাববে। আমি বলতে পারি প্রথমেই তার অগাধ বিস্ময় ফেটে পড়বে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মাঝখানে। সব পাল্টে গেছে। হাজার হাজার বর্গ মাইল জুড়ে যেখানে ছিল বন, আর বুনো পশুর আস্তানা তার সময়ে—সেখানে এখন শস্যের সাগর দুলছে। জ্বর জ্বালায় মরে-হেজে যেসব জায়গা নরকের মত হয়ে উঠেছিল, এখন সেখানে ড্রেনকাটা পরিচ্ছন্ন শহর। পর্বতের যে সব মস্ত মস্ত দেয়াল সমুদ্রোপকূল থেকে ভারতবর্ষের সুদূর ব্যাপ্ত অভ্যন্তরকে আড়াল করে রাখতো, তাকেও দীর্ণ করেছে পায়ে চলার পথ, বেঁধেছে রেল লাইন। আর নদী! সে তো প্রদেশে প্রদেশে তৈরি করেছিল একটা দুস্তর বিচ্ছিন্নতার পারাবার। তার বন্যা এনেছে দেশে

দেশে ধ্বংস। এখন সেই নদী মানুষের প্রয়োজনে বশীভূতা। ব্রীজের বাহুবন্ধনে বাঁধা। ক্যানেলে বন্দিনী।

কিন্তু প্রথম বিস্ময়ের পর তার কাছে আরও আশ্চর্য ঠেকবে যা ভেবে তা হল বহির্জগতের এই যা কিছু পরিবর্তন তা সবই মানুষের নিরাপত্তার জন্যে। একশো বছর আগেও যেখানে রাজা থেকে প্রজা সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সেজে থাকতো সব সময়ে, এখন তাদের হাতে একটা ছোরা কি একটা মশাল খুঁজে পাওয়া দায়। ভারতবর্ষের অসংখ্য দেশীয় রাজ্য যাদের আগে কেবল নিষ্ঠুর নির্দয় যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেই দিন কাটতো বলে মনে পড়ে, তারা এখন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য করছে শান্তিতে। রাজপথ' আর রেলপথ, ডাকঘর আর টেলিগ্রাফের তারে তারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন।

এছাড়াও আরও কিছু নতুনত্ব, আরও কিছু পরিবর্তন আবিষ্কৃত হবে তার চোখে। সমস্ত দেশ জুড়ে মস্ত মস্ত অট্টালিকা কিন্তু তার গড়ন-পিটন বিদেশী ছাঁদের। এগুলো কিসের কাজে লাগে? কোন্ রাজা-মহারাজা এই বিস্তীর্ণ প্রাসাদটি বানিয়েছেন নিজের বসবাসের জন্যে? তার এই প্রশ্নের জবাব আসবে —না, এটি কোন ধনবানের প্রমোদগৃহ নয়, দুস্থের হাঁসপাতাল। তিনি খোঁজ করবেন, এই জমকালো মন্দির কোন্ দেবতার জন্যে বানানো হল? উত্তর আসবে—না, এ কোন দেবতার মন্দির নয়, এ মানুষের বিদ্যালয়। খাড়াই দুর্গের বদলে তার চোখে পড়বে বিচারালয়, মুসলমান দেওয়ানের বদলে জেলায় জেলায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, দলবদ্ধ ফৌজের জায়গায় খুঁজে পাবেন পুলিস, বিস্তীর্ণ পতিত জমিতে দেখতে পাবেন নিবিড় জনপদ।

ব্রিটিশ বণিকের মারফৎ ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় অনেক কিছু নতুনত্ব আমদানী হতে শুরু করল উনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় থেকে। সামন্তপ্রথা গিয়ে ধনতন্ত্র। সংস্কার গিয়ে বিজ্ঞান আর শিল্পবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ভেঙে শিল্পনগর।

ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক বিকাশের বা বুর্জোয়া অভ্যুদয়ের যে রূপকথার মত ইতিহাস হাণ্টার সাহেব লিখেছেন—তারই একটি বিশেষ পরিণতি—কলকাতা। বাংলার চেয়েও ভারতবর্ষের চেয়ে বড় যে কলকাতা।

"ভারতবর্ষের কামধেনু বাংলা"—সেটা মোগল যুগের সত্য। সেই কামধেনুর দুধের উৎস হল কলকাতা। এটা কোম্পানী যুগের সত্য। কলকাতার ইতিহাস কোন সময়েই একটা মহানগর সৃষ্টির ইতিহাস নয়। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক

সামাজিক—এই দুই মহাজাগরণের ইতিহাস। সেও এক রূপকথার মতই। সত্য ও অনন্য।

আমি লিখতে বসেছি অন্য ইতিহাস। সেটা হয়তো মহাজাগরণের উল্টো দিক। সে এক আজব শহরের ইতিহাস। কলকাতার নয়, কলকেতার।

এর আগে পর্যন্ত অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে বলা হয়েছে রাজনৈতিক মানুষের উত্থান-পতনের কাহিনী। রাজা মহারাজা, উজীর-দেওয়ান, লর্ড কর্নেল, কোর্ট, কাউন্সিল, এমনি সব অসাধারণ মানুষ, অসাধারণ ঘটনাবলীর কথা। এবার কিছু সাধারণের প্রসঙ্গে পা বাড়াচ্ছি। কলকাতার সাধারণ মানুষ, তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, তাদের চিন্তা-ভাবনা, কলকাতার ওপর তাদের ঘৃণা, ভালবাসার কাহিনী এটা।

আদি যুগের কলকাতার সাধারণ মানুষের কোন ইতিহাস নেই। যা আছে সে কেবল কিছু সংখ্যক অপরাধীর। এ থেকে নিশ্চয়ই এটা প্রমাণ হয় না যে কলকাতার সাধারণ মানুষ অপরাধী ছিল শুধুই। আপাতত যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে—এখানে তারই বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

১৭৬০ সালের কথাই আগে ধরা যাক্। ১৭৬০ সালের আগে নিয়ম ছিল আসামীকে তার অপরাধের চরম শাস্তি হিসাবে চাবুকের ঘা খেতে হবে। একেবারে মরে না যাওয়া পর্যন্ত। ১৭৬০ সালের পর থেকে নতুন আদেশ চালু হল—হত্যাপরাধী আসামীকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এ পর্যন্ত একজন লোকেরই নাম পাওয়া যায় যাকে সত্যি সত্যিই তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার নাম নযাণ ছুতোর।

হাওড়ার পুল যখন তৈরি হয়নি তখন হাওড়া কাজে লাগতো—শাস্তিদানের প্রয়োজনে। সামান্য খুচরো-খাচরা অপরাধে তখন আসামীদের হাওড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। ব্রীজ নেই, খেয়া নৌকো নেই। হাওড়ায় পাঠানো যেন আন্দামানের নির্বাসনের মত। হাওড়া-বাস ছাড়াও শাস্তিদানের প্রণালী আরও অনেক রকম ছিল। যেমন বেত মারা, জুতো মারা, কান কেটে নেওয়া, ফাঁসী দেওয়া। গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে ঢোল পিটোতে পিটোতে সমস্ত শহরে তাকে আসামী বলে চিনিয়ে দেওয়া।

কর্নেল ওয়াটসনের এক নাপিত ছিল। নাম রামসিংহ। সে সূত্রধর বলে নিজের পরিচয় দিয়ে মাইনে নিতে এল ওয়াটসনের কাছে। এই অপরাধের জন্যে তাকে বেশ কয়েক ঘা বেত মেরে কলকাতা থেকে মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত ঢোল

শোহরত সহকারে ঘোরানো হল তার জাতি-পরিচয় দিয়ে।

বক্তারাম বলে এক দোকানদার। এক মেথরানী তাকে কতকগুলি চুরি করা পিতলের বাসন বিক্রি করে। সেটা ধরা পড়ার পর দুজনেরই শাস্তি হল। বক্তারামের ভাগে ২০ ঘা বেত। আর মেথরানীর ভাগে ১০ ঘা। সেই সঙ্গে ঢোল শোহরতে তাদের ঘুরিয়ে শহরের সমস্ত চাকরদের সাবধান করে দেওয়া হল। টুলুক কোম্পানীর দোকান থেকে এক ফিরিঙ্গী ঘড়ি চুরি করেছিল বলে তার হাত পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অ্যাণ্ডারসনের ক্রীতদাসী পিসী মনিবের বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে চৌকিদারের হাতে ধরা পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাণ্ডারসনের কাছ থেকে কোন কথা না শুনেই আসামীর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন—১০ ঘা বেত। কাপ্তেন স্কট বেণীবাবুকে গাড়ি মেরামত করতে দিয়েছে। বেণীবাবুর দিন যায়। কিন্তু গাড়ি আর সারানো হয় না। আদালতে নালিশ হল। শাস্তি কি? না—দশ ঘা জুতো।

বিষ্ণুদাস শ্রীমানী জাল করার অপরাধে ধরা পড়ল। লালবাজারে নিয়ে গিয়ে তাকে তুড়ুম ঠুকে দেওয়া হল প্রথমে। তারপর দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। তুড়ুম ঠোকাটা কি জিনিস? তুড়ুম হচ্ছে বড় কাঠের গায়ে ছিদ্র করা একরকম যন্ত্র। এর মধ্যে অপরাধীর পা দুটোকে আটকে ফেলে রাখা হত। এবং পা আটকানো হত কম বেশী অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী।

শাস্তি দানের এইসব আইন বা রীতি ১৮১৬ সালের পর আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে মুসলমানদের কোন সময়েই ফাঁসী দেওয়া হত না। রামসুন্দর সরকার নামে এক ভদ্রলোক একবার মিথ্যে সাক্ষী দেন। ফলে তার শাস্তি হল সাত বছরের দ্বীপান্তর।

ছোটখাট চুরি-জুয়াচুরির কথা বলা হল। কিন্তু ডাকাতি—যে ডাকাতি কলকাতার একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা—সেই ডাকাতির কথা একদম বলা হয়নি। ডাকাতির কথা বাদ দিলে কলকাতার ইতিহাস লেখা সম্পূর্ণ হবে না কোনদিন। রাজপথে আর রাজদরবারে যে দিকে চোখ ফেরাবে সেই দিকেই তাকিয়ে দেখ ওত পেতে আছে লুণ্ঠনকারীর মুখোশ-আঁটা মুখ। আজকে মদির কটাক্ষের টানে মায়াবিনী চৌরঙ্গীর দিকে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে যখন ছুটে চলি আমরা বুকের মধ্যে রোমাঞ্চের স্পন্দন শুনতে শুনতে —তখন যেন কিছুতে না ভুলে যাই এই চৌরঙ্গীর অতীত ইতিহাসকে— ডাকাতের জঙ্গল থেকে যার আবির্ভাব। যেখানে এলে রক্তের প্রবাহ, বুকের

স্পন্দন চিরকালের জন্যে থেমে যেত পথচারীর।

ডাকাতি রাহাজানি সেকালের কলকাতার পথে ঘাটে অলিতে গলিতে দিনে দু-বেলা। ফ্রান্সিস রোজা ও তার সম্প্রদায় ডাকাতি ব্যবসার একচেটে মালিক। আর হরি পাল, প্রসাদ পাল, রামজয় ও চৈতন এরা রাহাজানি চালাতো রাজপথে।* ব্যাপারটা জানাজানি হতেই চোর এবং ডাকাত দুই দল ধরা পড়লো। সকলেরই শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। ফাঁসী। জোসেফ লোপেজ খুন-খারাবী ডাকাতি করতো। কিন্তু স্থলে নয়, জলে। নৌকোয় চড়ে নৌকো ডাকাতি। ধরা পড়বার পর তারও ফাঁসী হল। কিন্তু ফাঁসীতেই সব শেষ নয়। ফাঁসীর পর লোহার শেকলে বেঁধে সাধারণ রাস্তার ধারে একটা গাছের ডালে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হল; লুণ্ঠনকারীদের মনে যাতে একটা আতঙ্ক ছড়ায়—সেজন্যে।

হেস্টিংসের আমল থেকে ডাকাত ধরবার জন্যে পুলিসী ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত শুরু হল ধীরে ধীরে। দেখতে দেখতে এমন হল যে যত ডাকাত যত চোর তার চেয়ে পুলিস দারোগা বেশী। তবু কেন চুরি হয়? সে এক রহস্য কাহিনী। সমাচার দর্পণের পাতা থেকে সেই রহস্যমোচনের চাবিকাঠিটি চেয়ে নেওয়া যাক্।—

"দস্যু রাত্রে ডাকাতি করে যাহা উপস্থিত পায় তাহা লইয়া যায় থানার আমলারা দিবসে ডাকাতি করে প্রজার ঘরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হরণ করে অধিকন্তু স্থাবরাদি বন্ধক দিয়া থানার আমলাকে প্রচুর না দিলে সপরিবারে নিস্তার পায় না এবং গ্রামের প্রজার স্থানে মাথট করিয়া লয়। তাহাতে জমিদারদের আমলা আপত্তি করিলে জমিদারের আমলার বদনামি কল্পনা করিয়া রিপোর্ট করা করে তাহাতে হুজুরে শত পঞ্চাশৎ টাকা জমিদারের আমলার জরিমানা হয়। দারোগা অতি দাগাবাজ প্রকৃত ডাকাইত চোরকে গ্রেফতার না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিয়া তালিমী সাক্ষিসমেত হুজুর চালান করিয়া আপন জাঁকে আনি জাহের করিয়া সর্ফরাজ হয়। চুরি ডাকাইতি তদারকের কারণ দারোগা গ্রামে গেলে ছলে বলে প্রজার সর্বস্ব হরণ করে। দারোগার লোক প্রজার বাটীতে কোন জিনিস ফেলিয়া সেই প্রজার খানাতল্লাশি করিয়া তাহাকে বমালে গ্রেফ্তার করিয়া আপন মতলব হাঁসিল করিয়া খালাস দেয় যে প্রজা অধিক টাকা দিয়া দারোগাকে রাজী না করিতে পারে তাহাকে হুজুর চালান করিয়া প্রাণান্ত করে থানার আমলার নানা মত উৎপাতে

জমিদারের আমলা ও প্রজার সর্বনাশ হইতেছে ॥ ”

সংবাদের পালা এইখানেই শেষ নয়।

“যে অবধি পোলীসের নূতন বন্দোবস্ত মত কর্ম হইতেছে তদবধি কলিকাতায় হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে চুরি না হয় এমত দিন নাই যে সকল গৃহস্থের বাটীতে পিপীলিকাদি কীট পতঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে নাই—সে সকল বাটীতে অনায়াসে সিঁধ দিয়া চুরি করিয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে কলিকাতার সিঁধেল চোরের ভয় কোনকালে ছিল না।”

চোর ডাকাত কেউই ধরা পড়ে না। অথচ শাস্তির বিধি বিধানে কোথায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। পরিপাটি করে সাজানো। একটি শাস্তির বিবরণ এখানে সংবাদপত্রের পাতা থেকে উদ্‌ধৃত করছি।

“প্রথমতঃ অপরাধিরদের মস্তক ও দাড়ি গোঁপ ইত্যাদি মুণ্ডন করিয়া চটের কৌপীন পরিধান করান গেল। পরে তাহাদের মস্তকাবরণ পাগের পরিবর্তে নানা ছবিতে চিত্রিত কাগজের টুপি ধারণ করাইযা কণ্ঠদেশে মাল্যস্বরূপ জুতার মালা এবং মুখের একদিকে কালী অপরদিকে চুন দেওযা গেল। তদনন্তর অশ্বারোহণের বিনিময়ে গর্দভে চড়াইয়া তাহাদের মুখ গর্দভের লাঙ্গুলের দিকে রাখিয়া সহিসের ন্যায় দুইজন মেহতর মস্তকোপরি চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস করিতে লাগিল। পরে ঢেডরাওযালা। একজন তাদেব সম্মুখে ২ জযবাদ্যের ন্যায ঢেডরা পিটিতে লাগিল এবং যে ভুরি ২ লোক ঐ তামাশা দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারদের নিকটে ঐ দস্যুরদের কুকর্ম বিবরণ বর্ণন করিতে থাকিল।”

ডাকাত বৃত্তান্ত এখানেই শেষ হল। ইংরেজদের তৈরি পুলিসী ব্যবস্থাকে আমরা এখন জিন্দাবাদ দেব কি নিন্দাবাদ দেব—সেটা একটা ভাববার কথা। কিন্তু ইংরেজ আমলের চোর-ডাকাতদেব সাধুবাদ না জানিযে উপায় নেই। কেননা আইন আদালত দারোগা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস-চৌকিদার—এসব বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তক যে তারাই।

অপরাধী নয়—এমন সব লোকদের নামও দু-চারটে মেলে।

যেমন দীপচাঁদ বেরা (বেলা ?)। কোম্পানীর দালাল। জনার্দন শেঠ-এর আগে। দেশী ব্যবসাযীদের কাছে কোম্পানীর যত টাকার মাল সে বিক্রি করতে পারবে তার ওপর প্রতি টাকায় আধ পয়সা পাবে সে।

গোবিন্দ শুঁড়ী আর মিঙ্গো আশকে দেওয়া হল মদের দোকান (আরক-হাউস)

আর হোটেল করার লাইসেন্স। আরক একরকম তীব্র মদ। এদেশের তৈরি। বিলেত থেকে তখন ভালো মদ আমদানী হত খুবই কম।

কি একজন ঘোষকে দেওয়া হল গাঁজার দোকানের লাইসেন্স। বাৎসরিক জমা ছিল তার জন্যে ১৮০৲। আর সরফালী সারঙ্গকে লাইসেন্স দেওয়া হল জাহাজের খালাসী যোগাড় করার জন্যে।

মিঃ আইসাক্ বার্কলী একজন ইংরেজ ভদ্রলোক। আর কাপ্তেন পেট্রল্ একজন কাপ্তেন। একদিন কাপ্তেন সাহেব বার্কলী সাহেবের এক ক্রীতদাসীকে নিজের ঘরে আটকে রাখলে। কোর্টে বিচার উঠল। তলব পড়ল কাপ্তেনের। কাপ্তেন সাহেব এই ঘটনার পক্ষে যুক্তি দিলে যে বেশ কিছুদিন আগে বার্কলী সাহেবও তাঁর একজন ক্রীতদাসীকে আটকে রেখেছিল। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। ক্রীতদাসী দুটির নাম যথাক্রমে বারবারা আর লুক্রেসিয়া।

নবাব মুর্শিকুলি খাঁ-র কাছ থেকে একবার আকস্মিক ভাবে একটা চিঠি এসে হাজির কাশিমবাজারের কুঠিতে। কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ ফক্। নবাবের চিঠি খুলে দেখলেন যে হরিরাম গোঁসাই নামে একজন নিঃসন্তান হিন্দু-পুরোহিত কলকাতায় মারা গেছে। তার টাকাকড়ি বিস্তর। নিঃসন্তান ও উত্তরাধিকারীহীন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সব সম্পত্তিই আইনতঃ নবাবের প্রাপ্য। সুতরাং আপনারা মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে নবাবের দরবারে পাঠান।

বারানসী সে সময়ে কলকাতার খ্যাতি-প্রতিপত্তি আর মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁরই গুরুপত্নী এই বিধবা। তিনি নবাবকে লিখলেন—মৃত পুরোহিতের প্রচুর সম্পত্তি আছে একথা আদৌ সত্য নয়। নবাব যদি একথা বিশ্বাস না করেন তাহলে আমি নিজে জামিন হচ্ছি আমার গুরু পত্নীর।

এতক্ষণ ধরে যাদের কথা বলা হল এরা সবাই কলকাতার বাসিন্দে। কিন্তু কলকাতার ইতিহাসে এদের স্মারকচিহ্ন বলতে কিছুই নেই। এবার শুধু তাদেরই কথা বলছি—যাদের স্মৃতি-পথ বেয়ে আমাদের প্রতিদিন হাঁটতে হয়। ইংরেজদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খানসামাদের কদর অনেক। মাইনেটাও পায় বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী। হুঁকোবরদারকে বরবাদ করেও ইংরেজ প্রভুদের চলে, এমন কি শেষ পর্যন্ত চললও। কিন্তু খানসামাকে বাদ দিলে সব বেসামাল। সেকালে নিমু খানসামা, ছকু খানসামা, করিমবক্স খানসামা, পাঁচু খানসামা—এঁরা সব প্রভুভক্তির জোরে খানসামাগিরি করে সমাজে এক সময় খ্যাতনামা হয়ে উঠেছিল। কলকাতার বহু লেন-বাইলেনের আলো-ছায়া

জড়ানো বুকে তাদের অনেক অতীত-কাহিনী আজও জেগে আছে হয়তো। আমাদের কাছে সে রহস্যের সবটাই অজানা থেকে গেছে। কোন এক শীতের সন্ধ্যেবেলা কি গ্রীষ্মের দুপুরে ছকু খানসামা লেন খুঁজতে বেরিয়ে যখন হয়রান হয়ে পড়বো— তখনই একবার কি তখনও একবার আমরা ভাববো কি ভাববো না যে, ছকু খানসামা যদি খানসামা—তো তার নামে রাস্তা হল কেমন করে?

রাস্তা হওয়ার ইতিহাসটা কঠিন বা দুরূহ কিছু নয়। নামের প্রসিদ্ধি ঘটলেই ঘটা করে রাস্তার নামকরণ করা হয় তাদের নামে। কঠিন যেটা সেটা হল প্রসিদ্ধ হওয়া। অক্রুর দত্তের গলিকে বুঝতে পারি। কেননা ইংরেজ কোম্পানীর কমিসেরিয়েটে কাজ করে তিনি বহু টাকা পয়সা উপার্জন করেছিলেন জীবনে। সেকালের এক ছড়াতেও তাঁর নাম পাওয়া যায়।—

"দুলোল হল সরকার, ওক্রুর হল দত্ত।
আমি কিনা থাকবো যে কৈবর্ত্ত সেই কৈবর্ত্ত॥"

অক্রুর দত্ত যে জাতি পাল্‌টাবার মত পয়সা করেছিলেন সেটা বেশ বোঝা যায় এই ছড়া থেকে। সুতরাং ওয়েলিংটন স্ট্রীটের কোন এক গলিতে তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার কারণটা বোঝা শক্ত নয়; কিন্তু অখিল মিস্ত্রী একজন মিস্ত্রীই। বুদ্ধু ওস্তাগর, গুলু ওস্তাগর, লাল ওস্তাগর, নয়াবদি ওস্তাগর—এরা সবাই দরজি। রানী মুদী একজন মুদী। এর বেশী কেউ কিছু নয়। অথচ এদের নামের খ্যাতি কলকাতায় পথে পথে অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ল কি করে সে রহস্য চির অজানা।

কলকাতার সাধারণ মানুষের কোন ইতিহাস নেই—একথা সত্যি। কিন্তু সাধারণ মানুষের লেখা কলকাতার ইতিহাসে আছে অনেক। ইংরেজি আমলের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-আচার, প্রতিদিনের জীবনধারণ—এ সব কিছু সম্পর্কেই সাধারণ মানুষের মনে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাব, যে ব্যর্থতার ছবি—ছড়ায়-কবিতায়, সে-সবের অজস্র দৃষ্টান্ত আছে।

এখন ধরা যাক বিচার সম্পর্কীয় মনোভাবের কথা। নন্দকুমারের মৃত্যু, কান্তবাবুর দেওয়ানী লাভ—এসব সম্পর্কে ইংরেজ শাসনের প্রতি যে তীব্র বিদ্রূপ-বাণী সাধারণ লোকের বোবা মুখকে ফাটিয়ে আপনিই গর্জে উঠেছে, তার কিছু দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে। এই সব ঘটনাই প্রমাণ করছে যে, ইংরেজ-শাসক বা সওদাগর সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কোন আস্থা রাখতে

পারেনি। ইংরেজ বিচারকদের ঈশ্বর অবতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে সেকালের ব্যঙ্গ-কবিতায়। এমনি একটা কবিতার নাম—'দ্বার সায়রের কবিতা'। দায়রা সেসনের বিচার-ব্যবস্থার ছবি কবিতার বিষয়বস্তু।—

'অপূর্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেব রূপী।
ছাড়িয়া আহ্নিকপূজা পরিধান কুর্তি মোজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপি॥
বাঙ্গালার অভিলাষে আইল সদাগর বেশে
কৈলকাত্তা পুরানা কুঠি আদি।
গতামল সুভেদারী শুভ সন বাহাত্তরী
আংরেজ আমল তদবধি॥"

আবার কোথাও দায়রা সেসনের নীরস ঘটনাবলীকে প্রতিমা পুজোর উপমায় টেনে আনা হয়েছে।—

"দিনেক দুই গতে হুকুম জারি ফৌজদারীতে
যেমত প্রতিমা পূজা হয়।
তবে শুন তার মজা যেমত হইল পূজা
প্রতিমা হইলা সাহেব আসি।
কাদিবা আসন করি সমুখেতে মেজ ধরি
পূজা লন পূর্বমুখে বসি॥
খড়্গ হইল কোড়া বানাতে বান্ধ্যাছে গোড়া
খাঁড়াইত তার জাফর খালাসী॥
চন্দন হইল কালি পুষ্প হইল কাগজগুলি
মেজের উপরে রাখে আনি।
নাহি কোন টাট ছিপ শঙ্খ ঘণ্টা ধুপ দীপ
সবে বাদ্য বেড়ির ঝনঝনি॥"

বিচার চিত্রের সঙ্গে বিচারকের চিত্রও বাদ পড়েনি।—

"বুঝিলাম হক বটে জজ সাহেব ধর্ম বটে
চিত্রগুপ্ত সঙ্গেতে দেওয়ান।
গুণবান আমলা যত সাহেবের মনোমত
সাক্ষিরূপে পণ্ডিত প্রধান॥

কাজের কিছু নাই ছল,   দুধের দুগ্ধ জলের জল
জজের আমলার ধর্ম বটে।
প্রজাক ভরতের সাঁপ   কলিতে প্রধান তাপ
তাহে ভালো মন্দ ঘটে॥"

শিল্পবিকাশের ফলেই মজুর শ্রেণীর জন্ম। কলকাতার শিল্পোন্নয়নের জন্যে বিদেশ থেকে অর্থাৎ বাংলার বাইরে থেকে মজুর আসে। প্রাসাদনগরী কলকাতা তাদের চোখে স্বর্গের মত লাগে। কিন্তু দু-দিন যেতে না যেতেই কি যে হয় মন বসে না। মনের বিরাগ ছড়ায় ফুটে ওঠে। কলকাতার অতুল ভোগৈশ্বর্যের টানে পশ্চিম থেকে যে সব লোক ছুটে আসতো তাদের সাবধান করার জন্যেই ছড়া কাটতো হিন্দুস্থানী মজুররা।—

"গাড়ি ঘোড়া লোনা পানি, আউর রণ্ডিকা ধাক্কা হায়।
এস্‌মে যো বঁচে মোসাফির, মৌজ করে কলকাত্তা হায়॥"

কলকাতার আরেক দিক তার শিক্ষার দিক। শিক্ষা মানে ইংরেজি শিক্ষা। যার ফলে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে বুদ্ধিজীবীর বিকাশ। সেটা গড়ার দিক। এবং আগের অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আমি আঁকছি তার উল্টো দিকের চেহারা। সেকালে অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার একেবারে শৈশবে নামতার মত ডেকে ইংরেজি শেখানো হত। ডিক্‌সনারী মুখস্ত করতো লোকে। এক একজন লোক এক একটি Walking Dictionary. এই ডাকাকে বলা হত ঘোষাণো। হয়তো কোন পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন। স্কুল মাস্টার জিজ্ঞেস করেন, কি ঘোষাবো। গার্ডেন না স্পাইস। হয়তো বলা হল, গার্ডেন। অমনি শুরু হল পয়ারে গাঁথা কবিতার চিৎকার।

"পম্‌কিন্ লাউ কুমড়ো, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন চাষা॥"

আরও আছে—

"ডে মানে দিন আর নাইট মানে রাত,
উইককে সপ্তাহ বলে রাইস্ মানে ভাত।"

কিংবা—

"গাড ঈশ্বর, লাড ঈশ্বর, কম্ মানে এস,
ফাদার বাপ্, মাদার মা, সিট্ মানে বস।" ইত্যাদি।

আর সাধারণ বাঙালী সন্তানের কাছে অথবা অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাঙালীর কাছে এই ইংরেজি ভাষা হয়ে দাঁড়াল হাতের দড়ি, গলার ফাঁস। জানেও না, অথচ না বললেও চলে না। কেননা ইংরেজি খানা খাওয়া, ইংরেজি নাচ দেখা, ইংরেজি কেতায় জীবন যাপন, ইংরেজের চাটুকারিতা করাই যাদের আভিজাত্যের লক্ষণ সেই সব আলালের ঘরের দুলালরা ইংরেজি ভাষাকে বাদ দিয়ে বাঁচবে কেমন করে।

উইলসনের হোটেলে স-সাকরেদ বাঙালী বাবু খেতে গেছেন।

গোমাংস ভক্ষন তখন প্রগতিশীলতার লক্ষণ। সুতরাং একজন অর্ডার দিতে খানসামাকে ডাকলেন।

বীল হ্যায় ? (অর্থাৎ veal হ্যায় ? বাছুরের মাংস আছে ?)

খানসামা জবাব দিলে—নহি হ্যায় খোদাবন্দ।

বাবু। বীফ্‌স্টিক হ্যায়। (গোমাংসের বড় বড় কুচি আছে ?)

খান। ওভি নহি হ্যায় খোদাবন্দ।

বাবু। অক্‌স্‌টং হ্যায় ? (গোরুর জিব আছে ?)

খান। ওভি নহি হ্যায় খোদাবন্দ।

বাবু। কাফ্‌স্‌ফুট জেলি হ্যায় ? (বাছুরের খুরের জেলি আছে ?)

খান। ওভি নেই হ্যায় খোদাবন্দ।

বাবু। গোরুকা কুচ্‌ হ্যায় নহি ?

খানসামা চুপ। বাবুর জনৈক সঙ্গী খানসামাকে অর্ডার দিলেন—

ওরে, বাবুর জন্যে গোরুর আর কিছু না থাকে তো একটু গোবর নিয়ে আয়।

বেশী উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কথায় কথা বাড়ে। তবু একটি কথা বলেই শিক্ষাপ্রসঙ্গ শেষ করছি।

কথা হচ্ছে মনিবে আর তার কর্মচারীতে। মনিব ইংরেজ। কর্মচারী বাঙালী। এবং বলাবাহুল্য যে, ইংরেজি কেতাদুরস্ত। কর্মচারীটি কোন অপরাধ করে ক্ষমা প্রার্থনা করছে মনিবের কাছে। তাই বলছে, 'মাস্টার ক্যান লিব, মাস্টার ক্যান ডাই।'

সাহেব শুনে ক্ষেপে আগুন। 'হোয়াট, মাস্টার ক্যান ডাই!'

কর্মচারী বুঝলে- কোথায় ভুল হয়েছে। তাই বলতে গেল, সাহেব রেগো না।

•—'স্টাপ দেয়ার। ডাই মি। ইফ্‌ মাস্টার ডাই, দেন আই ডাই, মাই কাউ ডাই, মাই ব্ল্যাকস্টোন ডাই, মাই ফোরটিন জেনারেসন ডাই।'

কখনও কখনও মনে হয় উনবিংশ শতকের শহর কলকাতার ইতিহাস দুটো। যেটা বিকাশের সেটা বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস। যেটা বিনাশের দিক সেটা উঠতি বাবুদের। হুতোমের ভাষায় 'হঠাৎ-অবতার'-দের ইতিহাস। প্রভু-ভৃত্য সুসমাচারে এইসব বাবুদের অনেক গুণকীর্তন করা হয়েছে। নিজের কথা শেষ করে আমি এখন একটি কবিতা শোনাতে চাই। ১৮৩৬ সালের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক—'কস্যচিৎ শহর হুগলীর প্রতাপপুর নিবাসী অত্যাচারদর্শিনঃ'।—

"গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা,
হা বিধাতা, এই হল শেষে।
ভদ্রলোকের ছেলে যত, কদাচারে সদা রত, সুরাপান অবিরত
কত মত কুচ্ছ দেশে ২।
কাঙালী বাঙালী ছেলে, ভুলেও না বাঙ্গালা বলে, ম্লেচ্ছ কহে
অনর্গলে, তেরিয়াঁ হয়ে পথ চলে, কাছ দিয়া গেলে বলে
গো টো হেল।
পেন্ট্‌লুন জাকিট পরে, ধুতি চাদর তুচ্ছ করে, সদাই চাবুক করে
মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল।
এবে করি নিবেদন, গিয়াছিনু যেইক্ষণ, কবিলাম নিরীক্ষণ, কোন্‌
ধামে নব্যভব্য বাবু কত জন॥
ইংরাজ ফিরিঙ্গী সনে, বসি সবে একাসনে টিপিন করে হৃষ্ট মনে,
জনে ২ কথোপকথন॥
একজন বলে হিয়ের, ডোন লেফ্‌ ও মাইডিয়ের, হুইচ আই সে
হিয়ের ২ ফিয়ের গাড ২।
বেড সোয়ের নো ওয়েল, দেট ইজ রোড টো হেল, আল ওবে
বাইবেল, দেন উইল গো নিয়ের লাড ২।
পরে বলে একদুষ্ট, অশিষ্ট ও অবিমৃষ্ট, লেটকরকালী কৃষ্ণ,
না ভজিও দুষ্ট ইষ্ট, তুষ্ট হবেন প্রভু যীশুখ্রীষ্ট।
আমি যাহা কহি নিষ্ট, ভজ খ্রীষ্ট হবে বেষ্ট, শেষেতে জানিবা
স্পষ্ট, যদি হন খ্রীষ্ট রুষ্ট, যত হিন্দু ব্যাড কেষ্ট, পাইয়া
যথেষ্ট কষ্ট, হবে নষ্ট সহিত শ্রীকৃষ্ণ।
পুনঃ কহে এক যণ্ড, কেবল পাষণ্ড ভণ্ড, হিয়ের মাই কাইণ্ড ফ্রেণ্ড,

ইংলণ্ডে যাইব চল সবে।
ব্রহ্মাণ্ডের গ্রামখণ্ড, সেই হয় উক্ত খণ্ড, ইহা ভিন্ন নেদরলেণ্ড
আইলণ্ড, ও এর্লণ্ড, হোলেণ্ড পোলেণ্ড গিয়া খণ্ডবুদ্ধি
খোয়াইব তবে ॥
প্রথমে লণ্ডনে যাব, রিফরমার কহাইব, টেবিলেতে খানা খাব
সিটি টৌন আদি বেড়াইব।
মনার্ক নিকটে রব, আদর টঙ্গে কথা কব, বাঙ্গলার নাম পাব,
বিধবার বিয়া দেওয়াইব।
এইরূপে কহে কথা, হেনকালে আইল তথা, সঙ্গে দরবান ছাতা,
পদদ্বয়ে বুটযুতা, ভদ্রলোকের পুত্র একজন।
একখানি গ্রন্থ করে, অতি পুলকান্তরে, উপনীত সেই ঘরে,
দেখি সবে সমাদরে, আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া তখন ॥
গুড মার্নিং শব্দান্তরে : সকলে শেকেহেন করে, সমাদরে পুরঃসরে,
যত্ন করে বসিবারে, চৌকি আনি দিল।
বাবুগণ যত্ন দেখি, বসিলেন হয়ে সুখী, কিছুমাত্র নহেন দুঃখী, সকলের
মুখোমুখি, পরে নানা প্রসঙ্গ হইল।
কত বা লিখিব তার, উক্ত ব্যক্তি সভাকার, পরে শুন চমৎকার,
যে ব্যাপার কৈল সকলেতে।
আর বা লিখিব কত, মদ্য মাংস আদি যত, আহারিয়া কতমত,
সবে হয়ে সুখান্বিত, নানামত লাগিল খাইতে ॥
ইংরাজ ফিরিঙ্গী সনে, বসি সবে একাসনে, টেবিলেতে হৃষ্টমনে,
খাইল দেখি জনে ২, ইথে মম হয় মনে, ঘোর কলির আগমনে,
কলিকাতা এত দিনে গেল ৩।
তল্লখন দেখা যায়, সকলে কুকর্মে ধায়, ধর্ম পানে নাহি চায়,
দিব্য বুট দিয়া পায়, ইংরাজ সহিত খায়, এ কথা কহিব কায়,
হায় ২ একাকার হল ৩।"

'কস্যচিৎ অত্যাচার দর্শিনঃ'র কবিতা এইখানেই শেষ হলেও কলকাতার শেষ এইখানে নয়। আরও দূরে। বহুদূরে।

হাণ্টার সাহেবের মত আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় ১০০ বছর আগে সুতানটির জলাভূমিতে যে সব জেলে, জোলা, চাষীর ঘর-গিরস্তি ছিল — তাদের কেউ

একজন যদি হঠাৎ আবার কলকাতায় জন্মানোর অধিকার ফিরে পায় তবে কি দেখবে সে। বিস্ময়ে কি তার চোখ ফেটে ছড়িয়ে পড়বে না?

সে ইটালী জানে না। ইটালীর ফ্লোরেন্স-এর নামও শোনেনি। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র—কতটা ফারাক কিছুই বোঝে না। রেনেসাঁর অর্থ তার কাছে অর্থহীন। তার কাছে এ যেন এক আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের খেলা। নইলে কোথায় গেল সেই পচা পুকুর। সেই কাঁটাবন, ঘন জঙ্গল। বাঘের ডাক, সাপের শিস্। ডাকাতের হানা। ম্যালেরিয়ার মড়ক। তার বদলে এ কোন্ নতুন রাজ্য, দেখে দেখে অবাক হবার দেশ। লোহার যন্ত্র আপনি কথা বলে, আপনি ছোট ছোট পুঁথির অক্ষর যন্ত্র এসে ছেপে দিয়ে যায় সাদা কাগজে। যন্ত্র এসে ঝনাৎ ঝনাৎ টাকা তৈরি করছে। সাত ঘণ্টায় তিন লক্ষ টাকা। নদীর ওপর সেতু। সেতুর নীচে কলের জাহাজ। কল টিপলেই ভাগিরথীর জলে বালতী উপ্‌ছোয়। কল টিপলেই কালো অন্ধকার জানলার সিক পেরিয়ে লাফিয়ে পালায়। আকাশের সাদা জ্যোৎস্না এসে মুখ টিপে টিপে হাসে ঘর জুড়ে। রাজপ্রাসাদ, আপিস, আদালত, পার্ক, সভা, সমিতি—দেখে দেখেও ফুরোয় না। যেন মাটির নীচে মাটি হয়ে লুকিয়ে ছিল কোন স্বর্গপুরী। এত সুন্দর, এত অবাক করা দেশ বুঝি স্বর্গও নয়, 'স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর'।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

ফিরিঙ্গী বণিক—অক্ষয়কুমার মৈত্র

সিরাজউদ্দৌলা— „

মীরকাসিম— „

মধ্যযুগের বাংলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলার ইতিহাস—(নবাবী আমল) „

„ (১ম)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

„ (২য়)— „

বৃহৎ বঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড)—দীনেশ সেন

কলিকাতার ইতিহাস—সুবল মিত্র

কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—হরিহর শেঠ

কলিকাতার কথা (আদি)—প্রমথনাথ মল্লিক

কলিকাতার কথা (মধ্য) „

ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা—সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পলাশীর যুদ্ধ—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

সেকাল আর একাল—রাজনারায়ণ বসু

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত—রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত—

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়

গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা—রাজেন্দ্রকুমার মিত্র

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—(১ম)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রে সেকালের কথা—(২য়) „

বাংলা সাময়িক পত্র— „

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস— „

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম)—সজনীকান্ত দাস

মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ—ডাঃ অরবিন্দ পোদ্দার

সাহিত্য সাধক চরিতমালা

বাঙলার নবজাগৃতি—বিনয় ঘোষ

কলকাতা কালচার—বিনয় ঘোষ

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডাঃ সুকুমার সেন

সাহিত্য-পরিষদ, ইতিহাস, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিশ্বভারতী প্রভৃতি পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা

Riyazu-S-Salatin.

Kalighat & Calcutta—G D. Bysack.

Clive of India—R. J. Minney.

The Good Old Days of Honorable. John Com.

Vol (1)—W. H. Carey

Vol II ,,

England's work in India —Hunter.

A Brief History of the Indian People— .

Warren Hastings—L. J. Trotter. (R. I.)

The Carey Exhibition of Early Printing & Fine Printing.

History of Bengal—Stewart.

A Brief History of Ancient & Modern Bengal—Romesh Ch. Dutt.